কান্তকবি রজনীকান্ত

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ : কলিকাতা ২৯

প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৩৭৫, ডিসেম্বর ১৯৬৮

প্রচ্ছদপট : শ্রীসুধীনকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম
পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা।

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
১ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

সমর্পণ

যে দুইজন সহৃদয় মহোদয়
কান্তকবি রজনীকান্তকে
তাঁহার দারুণ দুঃসময়ে
অপরিমেয় সাহায্য দান করিয়া
বাঙ্গালী জাতির মুখরক্ষা করিয়াছেন,
বাঙ্গালার সেই দুই মহাপ্রাণ—
শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
ও
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের
যুগল করে
তাঁহাদেরই সাধের কবির
এই জীবনগাথা সমর্পণ করিয়া
কান্তের আত্মার কথঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধন করিলাম।

বিনীত
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

"জ্বলুক যতই জ্বলে,
পর জ্বালা-মালা গলে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি ,
হিমাদ্রিই বক্ষ'পরে
সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায ,
অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি !
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি !"

—বিহারীলাল

ভূমিকা

রজনীকান্ত সেনের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় অতি সামান্যই ছিল। আমি কয়েকবার মাত্র তাঁহার গান তাঁহার মুখে শুনিয়াছি এবং রোগশয্যায় যখন ক্ষতকণ্ঠে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই স্বল্প পরিচয়ে তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে সে আমি তৎকালে তাঁহাকে পত্রদ্বারাই জানাইয়াছিলাম। সেই পত্র এই বর্তমান গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকা লিখিবার উপলক্ষ্যে রীতিরক্ষার উপরোধে সেই পত্রলিখিত ভাবকে যদি পল্লবিত করিয়া বলিবার চেষ্টা করি তবে তাহাতে রসভঙ্গ হইবে, অতএব তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। কেবল শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এই কবি-চরিত রচনাকল্পে যে সাধু অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন, সে জন্য এই অবকাশে তাঁহাকে আমার হৃদয়ের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
৩১ আশ্বিন
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে কান্তকবি রজনীকান্ত পরলোকগমন করেন; তাঁহার পরলোকগমনের প্রায় বার বৎসর পরে তাঁহার এই জীবন-চরিত প্রকাশিত হইল।

এই জীবন-চরিত প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় অনেকে অনেক অনুযোগ ও অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সে অনুযোগ ও অভিযোগ যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা বলি না, তবে এই সম্বন্ধে আমারও কিছু বলিবার আছে।

রোগশয্যাশায়ী রজনীকান্ত তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অনুরোধ, আদেশ বলিয়া শিরোধার্য করিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে, এই অনুরোধ বা আদেশ রক্ষা করা কত কঠিন, কত গুরুতর, কত দায়িত্বপূর্ণ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমি বাস্তবিকই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ি। এ যে অকূল পাথার, অগাধ সমুদ্র! এই বার বৎসরকাল ধরিয়া আমি পরলোকগত কবিকে বুঝিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ সাধক-কবির জীবন-চরিত বুঝিয়া আয়ত্ত করা আমার পক্ষে খুব কঠিন। তাই এই জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে এরূপ বিলম্ব ঘটিয়া গেল। এখনও যে রজনীকান্তকে যথাযথভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিয়াছি, তাহাও ত' বলিতে পারি না।

সাধ্যমত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও রজনীকান্তের জীবন-চরিতকে সুন্দর করিতে পারিলাম না, পরন্তু ইহাতে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। যদি কখন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখন সে সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিব।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য আমার বন্ধুবান্ধব অনেকে এবং বহু রজনী-ভক্ত আমাকে উপকরণ প্রভৃতির দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের সকলের কাছে আমি সে জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের সকলের নাম প্রকাশ করিয়া এ নিবেদনের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। তবে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মাত্র একজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি—তিনি স্বর্গীয় কবির সাধ্বী সহধর্মিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী মহাশয়া, তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ ও কবি-লিখিত হাসপাতালের খাতাগুলি এই জীবন-চরিত রচনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

সৎসাহিত্য-প্রচারে ব্রতী হইয়া যিনি ইতিমধ্যেই অনেকের শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন হইয়াছেন, আমার সেই পরম কল্যাণভাজন বন্ধু কুমার শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে সাহায্য না করিলে আমার পক্ষে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য সম্পন্ন করা দুরূহ হইত।

বরেণ্য কবি পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে কয়টি কথা লিখিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার সেই আশীর্বচন ভূমিকারূপে প্রকাশ করিলাম।

মহাবিষুব সংক্রান্তি
১৩২৮

বিনীত
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

বর্তমান সংস্করণ-প্রসঙ্গে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লেখেন ৩১শে আশ্বিন ১৩২৮। তারপর দীর্ঘকাল হ'ল সে সংস্করণের গ্রন্থ নিঃশেষিত হয়েছে। গ্রন্থকারের মৃত্যু হয় ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রীঃ) বঙ্গাব্দে। তিনিও কান্তকবির মত সরস্বতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রে লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত ছিলেন। তাই এই অমূল্য গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি আর সম্পাদনা করে যেতে পারেন নি ; ফলে বিগত ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কান্তকবির শতাব্দীর স্মরণোৎসবে যখন গ্রন্থখানির খোঁজ পড়ল তখনও এটাকে আগ্রহ ক'রে প্রকাশ করার মত কোনও প্রকাশক উদ্যোগী হলেন না। গ্রন্থকর্তার পুত্রকন্যাগণ অশেষ চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য হতে পারলেন না কোন প্রকাশকের অন্তরে সাড়া জাগাতে বা আগ্রহ সৃষ্টি করতে।

এমন সময় সাহিত্যনিষ্ঠ তরুণ অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় এই মূল্যবান গ্রন্থখানির খোঁজ করেন এবং পুনঃপ্রকাশের জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সেই আগ্রহে আমরাও সে সময়ে আগ্রহান্বিত হই, কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কান্তকবিকে তাঁর হাসপাতালে রোগশয্যায় দেখে আসার পর কান্তকবি তাঁকে তাঁর আতুরাবস্থায় ভক্তহৃদয়ে আত্মনিবেদনের যে অবিস্মরণীয় গানটী পাঠিয়ে দেন সেটী প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, শান্তিনিকেতন থেকে যে ঐতিহাসিক পত্র দেন সেটী কবিজীবনীর লেখক সাহিত্যবন্ধু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বীয় গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশ

করেন। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমার প্রণীত রবীন্দ্র-বৈজয়ন্তী গ্রন্থে (১৯৬১ খ্রীঃ) সেটীকে আমি কাব্যরূপ দিয়ে প্রকাশ করেছি, তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, উল্লেখমাত্র-ই প্রয়োজন মনে করি। কারণ তাতে কান্তকবি এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই উদ্ভাসিত আত্মার বিকীর্ণ কিরণকণা— কণামাত্র হ'লেও— তাকে কাব্যাবয়ব দিতে চেষ্টা করেছি।

প্রকাশকদের উদাসীনতায় যখন গ্রন্থপ্রণেতার পক্ষ হতাশ হয়ে একের পর অন্যের দরজায় ফিরছেন, তখনই অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, তিনি শুধু যে উৎসাহ দিলেন তাই নয়, নিজে দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনীকে এই গ্রন্থপ্রকাশের জন্য অনুরোধ করলেন। 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনীও এই কর্তব্যভার আনন্দের সহিত গ্রহণ করলেন। কিন্তু হায়—মহাকবি ভবভূতির ভাষায়—

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত আমাদের শ্রদ্ধা ও স্নেহভাজন বন্ধুবর রথীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ কালকবলিত হলেন। অগত্যা 'মধুর' অভাবে 'গুড' প্রয়োগের অনুকল্প বিধির মত এই দায়িত্ব এসে পড়ল আমার উপর। তিনি অল্প কিছু যা লিখে-ছিলেন তাও এই দুর্ঘটনার পর পাওয়া গেল না। কিন্তু তিনি সে সময় কান্তকবির এই পুণ্যজীবনী প্রকাশে অগ্রণী না হ'লে এবং উৎসাহ-উপদেশ না দিলে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সুদূরপরাহত হ'ত। তার জন্য সেই পুণ্যাত্মাকে— শুধু গ্রন্থকার বা প্রকাশকের পক্ষ থেকে নয়— বাংলা সাহিত্যের পক্ষ থেকে বঙ্গসাহিত্যের একজন দীন সেবক হিসাবে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শতবর্ষে কান্তকবির প্রতি আমাদের যা কর্তব্য, আমাদের সারস্বত ঋণ পরিশোধের জন্য— তার যোগ্যতা আমার নাই। কান্তকবির মত নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, একান্ত আত্মনিবেদিত-প্রাণ, ভক্তসাধক তা আশাও করেন না। এ বিষয়ে কবিগুরু আদর্শ উদারতা প্রদর্শন করেছেন, বলেছেন—"গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছো আমায়"। তাঁর ঋণের স্বীকৃতিই আমাদের কৃতজ্ঞতা। কবিগুরুর যে অপরূপ পত্রখানি গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে তাই তাঁর পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:—"*তাঁর কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে*

নাই * * সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে কিন্তু তুমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরো বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়·· তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য। * * ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবনসঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

এর পর কান্তকবি সম্বন্ধে মন্তব্য কবা—প্রদীপ জ্বেলে সূর্য দেখানোর মতই হাস্যকর হবে। তাঁর শতবার্ষিক স্মরণোৎসবে কান্তকবির গ্রন্থাবলী এবং তাঁর সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লেখা হযেছে তার একটী সূচী আমি উদ্ধৃত করেছি আমাদের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের শতবার্ষিক স্মারক-গ্রন্থ থেকে। তাঁর জীবনের ঘটনাগুলিরও একটী তারিখসহ সূচী তা থেকেই সমাহৃত ক'রে দিয়েছি।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার প্রমুখ বাংলার গায়কগণ তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে বাংলাদেশের নরনারীদের অন্তরে কান্তকবির পদাবলী দ্বারা নূতন ক'রে ভক্তি-বিশ্বাস সঞ্চার ক'রে আমাদের জীবন সার্থক করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সকলকে স্মরণ করতে বলি, পাঠকগণ, মানসনেত্রে দর্শন করুন যে কান্তকবির পবিত্র দেহ যখন তাঁব ভক্ত দেশবাসিগণ বহন ক'রে নিয়ে যান তখন তাঁরই গানটী সকলে বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে গেয়েছিলেন—

'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে'। এই পরম প্রত্যাশা, প্রত্যেক মুমূর্ষুর জন্য তিনি শেষ আশার বাণী রূপে, সঙ্গীত রূপে দান ক'রে গেছেন।

'কান্তকবি' গ্রন্থখানি, কবির কবিতা-গান বা সাহিত্য-সমালোচনার জন্য কোনো বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবে ব্যাসাসনে ব'সে বক্তৃতা দেবার ভানে বা অভিমানে সাহিত্যবন্ধু পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন প্রণয়ন করেন নি। কান্তকবির রচনা যেমন নির্ঝরের স্বতঃ উৎসারিত প্রবাহের মত, তাঁর এই জীবনীগ্রন্থটীও তাঁর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতিরূপে রোজনামচার প্রতিলিপি। এতে এমন ঘটনা অনেক উল্লিখিত আছে যাতে কান্তকবির প্রকৃত স্বভাব এবং স্বরূপটী স্বচ্ছভাবে ধরা

পড়ে। সভায় সমারোহে উৎসবের দিনে সকলেরই মন ও ব্যবহার একটু কৃত্রিমতার দ্বারা, প্রস্তুতির দ্বারা প্রসারিত বা প্রভাবিত হয়, কিন্তু তুচ্ছ ঘটনায় সকল মানুষই অসাবধান, অপ্রস্তুত, স্বাভাবিক, সরল, অকৃত্রিম এবং অকপট থাকে। কান্তকবির এই শিশুর মত সরল অকৃত্রিম রূপটী, জীবনীর প্রতি অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

গ্রন্থকর্তা সাহিত্যবন্ধু নলিনীরঞ্জন সম্বন্ধে এই গ্রন্থের কথামুখেই আমি আমার সশ্রদ্ধ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছি। ইতি

বিনীত
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পি ৭০৩ লেক টাউন
কলিকাতা ৫৫
৩১শে ভাদ্র, ১৩৭৫
১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

প্রথম অধ্যায়

সংসারের কর্মক্ষেত্রে

প্রাণের মধুর জ্যোৎস্না ফুটেছে অধরে,
সদাই আনন্দে রয়,
সংসারে সংসারী হয়,
ভুলেও কখনো কারো মন্দ নাহি করে।

—বিহারীলাল

১

জন্ম ও জন্মস্থান

১২৭২ সালের ১২ শ্রাবণ, (২৬ জুলাই ১৮৬৫) বুধবার প্রত্যুষে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে বৈদ্যবংশে কান্তকবি রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। কর্কটলগ্নে, সিংহরাশিতে কান্তকবির জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকালীন নক্ষত্র ছিল পূর্বফল্গুনী। তাঁহার রাশিচক্রের প্রতিলিপি স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

ভাঙাবাড়ির সেন-পরিবার সে সময়ে সমাজমধ্যে সম্মানিত ও বর্ধিষ্ণু ছিলেন। ধনধান্যে গৃহ যখন পরিপূর্ণ, আত্মীয়কুটুম্বের আনন্দকলরবে গৃহাঙ্গন যখন মুখরিত, সেন-পরিবার মধ্যে প্রীতির ধারা যখন পূর্ণবেগে বহমান, রজনীকান্ত সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় বর্ধন করেন।

ভাঙাবাড়ি একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। ইহা উল্লাপাড়া থানার অধীন। পূর্বে এই স্থানে অসংখ্য নলবন ও পানের বরজ ছিল। বৈদ্যবংশীয় রাজারাম সেন ও রাজেন্দ্ররাম সেন, দুই সহোদর, ময়মনসিংহের সহদেবপুর গ্রাম হইতে এই স্থানে আসিয়া প্রথম বাস করেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্বে ভাঙাবাড়িতে বৈদ্যের বাস ছিল না, তাঁহারাই ভাঙাবাড়ির প্রথম বৈদ্যবংশ। তখন ইহার চতুর্দিকে এক প্রকাণ্ড বিল ছিল। কালক্রমে সেই বিল শুকাইয়া যায় এবং উহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠে। ভাঙাবাড়ি উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে দেলুয়াকান্দি, দক্ষিণে চন্দনগাঁতি এবং পূর্বে কোনাবাড়ি গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নিকট দিয়া হুড়াসাগর নামক একটি নদী (যমুনার শাখা) প্রবাহিত হইত। তা ছাড়া গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গের সমবেত চেষ্টা ও যত্নে তিন-চারিটি পুষ্করিণী খনন করানো হইয়াছিল। গ্রামের উত্তরে টিঠা নামে একটি ক্ষুদ্র বিল আছে। এই বিল, গ্রাম ও গ্রামস্থ পণ্ডিতগণকে লক্ষ্য করিয়া কবির কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের খুল্লমাতামহ ৺যাদবেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একটি রহস্যপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। রজনীকান্ত অনেক সময় সেইটি আবৃত্তি করিতেন। শ্লোকটি এই—

ভগ্নবাটী ভবেৎ কাশী টিঠা চ মণিকর্ণিকা।
বিশারদঃ সদাশিবঃ ব্রজনাথঃ কালভৈরবঃ ॥[১]

---

১ কবির বাল্যবন্ধু সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্তী কবিশিরোমণি মহাশয়ের পিতা ৺ভুবনেশ্বর বিশারদ এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তীর পিতা ৺ব্রজনাথ চক্রবর্তীকে লক্ষ্য

টিঠা নামক মণিকর্ণিকায় স্নানদান ফল—

স্নানদানে ফলং নাস্তি কেবলং ঘ্যাগবর্দ্ধিকা।[২]

সেন-মহাশয়দিগের অভ্যুদয়ের সহিত গ্রামখানিরও উন্নতি হয়, এবং নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহু জাতি এখানে আসিয়া বসবাস করেন।

কবির জন্মকালে গ্রামখানির অবস্থা বেশ উন্নত ছিল এবং গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি বাস করিত। ইহা ব্যতীত সে সময়ে গ্রামে প্রায় চল্লিশ ঘর মুসলমানও ছিল।

কবির জন্মসময়ে ভাঙাবাড়িতে ডাকঘর ছিল না, কিন্তু পরে রজনীকান্ত ও দুই-চারিজন স্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় কবির বহির্বাটীর একটি কক্ষে ডাকঘর স্থাপিত হয়।

সে সময় গ্রামে ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী বিশারদ মহাশয়ের দেশপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ও গভর্নমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত একটি বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। তদ্ভিন্ন আনন্দমোহন ভট্টাচার্য বাচস্পতি ও রাজনাথ চক্রবর্ত্তী তর্করত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত তখন ক্ষুদ্র পল্লীখানিকে অলংকৃত করিতেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত লোক ভাঙাবাড়ির অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কবির জ্যেষ্ঠতাত রাজশাহির বিখ্যাত উকিল গোবিন্দনাথ সেন, পিতা সব-জজ গুরুপ্রসাদ সেন, রাজশাহির কমিশনারের সেরেস্তাদার প্যারীমোহন সেন, রাজ-দেওয়ান রাজীবলোচন সেন ও গোবিন্দপুর লালকুঠির দেওয়ান পুলিনবিহারী সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র পল্লী তখন সুখসমৃদ্ধি, উৎসব-আনন্দ ও স্বাস্থ্যসম্পদে পরিপূর্ণ। হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে এগারোটি পরিবারে দুর্গোৎসব হইত, ভাঙাবাড়ির ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র পল্লীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। চৈত্র মাসে চড়কের সময় প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব চলিত।

এখন গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। পূর্ব্বের সে শ্রী আর নাই। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন, লোকের যত্ন ও ছাত্রাভাব-বশত বঙ্গবিদ্যালয়টি উঠিয়া গিয়াছে। চড়কের সেই দুইসপ্তাহব্যাপী উৎসব আর

করিয়া এই শ্লোক রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত ব্রজনাথ অতিশয় কৃষ্ণকায়, হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘচ্ছন্দ ব্যক্তি ছিলেন, যখন সেই কৃষ্ণাঙ্গ রক্তচন্দনচর্চিত করিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া তিনি বাহির হইতেন, তখন প্রকৃতই তাঁহাকে ভৈরব বলিয়া বোধ হইত।

২ ঘ্যাগ— গণ্ডমালা।

হয় না। সংস্কারের অভাবে পুষ্করিণীগুলি মজিয়া গিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া আসিয়া দেখা দিয়াছে।

কবির ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রেরিত গ্রামের বিবরণ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে গ্রামের কতদূর দুর্দশা হইয়াছে। কালমহিমায়, পল্লীবাসীর অবহেলায় ও অযত্নে এবং ম্যালেরিয়ার মাহাত্ম্যে এখন ভাঙাবাড়ি প্রকৃতই 'ভাঙাবাড়ি'তে পরিণত হইয়াছে।—

'গুরুপ্রসাদ ও গোবিন্দনাথের রাজপ্রাসাদ-সদৃশ বৃহৎ অট্টালিকাতে এখন গুটিকতক বিধবা বাস করিতেছেন। ··

'ব্রাহ্মণ অধিবাসীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রামে যাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহারা প্রায় সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুরা পূর্ব হইতেই অর্থহীন ছিলেন, ভদ্রলোকগণ তবু শহরে গিয়া অর্থোপার্জন করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীগণের কোনও উপায় নাই বলিয়া তাঁহারা বাধ্য হইয়া গ্রামে বাস করিতেছেন এবং ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া জর্জরিত হইতেছেন।'

পল্লীবাস-সম্বন্ধে কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি—

'দেশটা মধ্যমশ্রেণীর লোকের পক্ষে বাসের অযোগ্য হয়েছে। মুসলমান প্রধান। হিন্দুদের মধ্যেও দলাদলি, মনোমালিন্য। তবে honest villager কেমন করে সেখানে বাস করবে? আমি তো পথ এক রকম দেখিয়েছি। দেখছ না? বাড়িঘরে কই যাওয়াই হয় না। আমার একটু সম্পত্তি ছিল, তার অধিকার নাই, আমি পত্তনি দিয়েছি, কতক বিক্রি করেছি। I smelt from the beginning that the quarter would not be fit for our living.'[৩]

৩ হাসপাতালের রোজনামচা, ৬ ফাল্গুন ১৩১৭ সাল।

২

বংশপরিচয় : পিতৃকুল ও মাতৃকুল

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সহদেবপুর গ্রামে রজনীকান্তের পূর্বপুরুষদিগের আদি বাস ছিল। তাঁহারা বঙ্গজ বৈদ্য। সহদেবপুর যমুনা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। তাঁহার প্রপিতামহ যোগিরাম সেন ভাঙাবাড়ির জমিদার যুগলকিশোর সেনগুপ্তের কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করেন। এই যুগলকিশোর পূর্বোক্ত রাজেন্দ্ররাম সেন মহাশয়ের পৌত্র। যোগিরামের মৃত্যুর সময়ে করুণাময়ী গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে তিনি বাপের বাড়িতে— তাঁহার ভাই শ্যামকিশোর সেনের আশ্রয়ে ভাঙাবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানেই তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। ইনিই রজনীকান্তের পিতামহ গোলোকনাথ সেন।

পিতৃহীন বালক গোলোকনাথ মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। সহদেবপুরে আর ফিরিয়া গেলেন না। তাঁহার মাতুল শ্যামকিশোর সেন মহাশয় গোলোকনাথকে একটি বাড়ি ও কিছু জমি দান করেন। তাহাতেই অতি কষ্টে গোলোকনাথের সংসার চলিত। তাঁহারা মাটির পাত্রই ব্যবহার করিতেন; কারণ তাঁহাদের তৈজসপত্র ছিল না। অনেক সময় তাঁহাকে কলাপাতে ভাত খাইতে হইয়াছিল। অত্যন্ত গরিব বলিয়া তিনি ভালোরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সহদেবপুর গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম অন্নপূর্ণা দেবী। গোলোকনাথের দুই পুত্র— গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ। যদিও গোলোকনাথ নিজে ভালোরূপ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই, তথাপি শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি ছেলেদের রীতিমতো লেখাপড়া শিখাইতে ত্রুটি করেন নাই। গোবিন্দনাথ বড়ো ও গুরুপ্রসাদ ছোটো। এই গুরুপ্রসাদই কবি রজনীকান্তের পিতা।

ছেলেবেলায় মামাতো ভাই রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের রাজশাহির বাসায় থাকিয়া দুই ভাইকে অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সময়ে সময়ে বালিশ অভাবে ইটে চাদর জড়াইয়া তাহাতেই মাথা রাখিয়া তাঁহাদিগকে ঘুমাইতে হইয়াছে। তখনকার মতো শস্তাগণ্ডার দিনেও তাঁহাদের ভাগ্যে সপ্তাহে একদিনের বেশি ঘি জুটিত না। বড়ো ভাই গোবিন্দনাথ, রঙপুর কালেক্টরির সেরেস্তাদার কাশীনাথ তালুকদার মহাশয়ের নিকট বাংলা ভাষা

শিখিবার পরে একজন মৌলবির নিকট ফারসি পড়েন। তারপর তিনি রাজশাহিতে সাত টাকা মাহিনায় চৈতন্যকৃষ্ণ সিংহ নামক একজন উকিলের মুহুরি নিযুক্ত হন। ক্রমে নিজের একান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি উকিল হইয়াছিলেন। সে-সময়ে লোকে জজসাহেবের অনুগ্রহে উকিল হইতে পারিত। তাঁহার নিকট আইন-সংক্রান্ত সামান্য রকমের একটি পরীক্ষা দিলেই লোকে ওকালতি করিবার সনন্দ পাইত। বস্তুত, সে সময়ে বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে উকিল হওয়া কঠিন ছিল না।

গোবিন্দনাথ খুব পরিশ্রম করিতেন, তাঁহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি অনেক জটিল মকদ্দমা খুব সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এজন্য অল্পদিন-মধ্যেই ওকালতিতে তাঁহার বিলক্ষণ উন্নতি হয়। সে সময়ে রাজশাহির আদালতে তাহার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিল বড়ো ছিল না। তিনি ইংরাজি জানিতেন না, কিন্তু ফারসি ও সংস্কৃতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তখন উর্দু ভাষায় আদালতের কাজ চলিত। মকদ্দমা গুছাইয়া বলিবার ভঙ্গি এবং তাঁহার যুক্তি ও তর্কের এমনই প্রভাব ছিল যে, অনেক সময়ে হাকিমকে তাঁহার মতে মত দিতে হইত। প্রায় প্রতি মকদ্দমাতেই তিনি জয়লাভ করিতেন। ফলে তাঁহার ব্যবসায়ে এতদূর পসার-প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, দেশের ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত ও সম্মানের চক্ষে দেখিত। এ সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যখন তিনি মহাসমারোহে দানসাগরের অনুষ্ঠান করেন, তখন নাটোর ছোটো-তরফের প্রসিদ্ধ রাজা ৺চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ভাঙা-বাড়ি গ্রামে শুভাগমন করেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করান। এমনকি, শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি নাকি নিজ হাতে কাঙালি-বিদায় পর্যন্ত করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত গোবিন্দনাথ ওকালতি করেন এবং এই আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করিয়াছিলেন , কিন্তু সে-অর্থ তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই— পরের উপকারে ও ধর্মেকর্মে তাহা ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। দারিদ্র্য কী, তাহা তিনি ছেলেবেলায় বেশ হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি অন্নদানে কাতর ছিলেন না। তাঁহার রাজশাহির বাসায় দু-বেলা পঁচিশ-ত্রিশ জন ছাত্রের ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির পাত পড়িত।

ভাঙাবাড়িতে যেখানে গোলোকনাথের ভাঙা কুঁড়ে ছিল, সেই পৈতৃক ভিটার উপর গোবিন্দনাথ রাজবাড়ির মতো জমকালো বাড়ি করেন। বাড়িটি দুই-মহলা।

বাহিরের মহলে সুন্দর ও সুবৃহৎ ঠাকুরদালান, সেই ঠাকুরদালানে বারো মাসে তেরো পার্বণ হইত।

গোবিন্দনাথের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ভুবনময়ী, দুর্গাসুন্দরী ও নিস্তারিণী—এই তিন মেয়ে এবং বরদাকান্ত, কালীকুমার ও উমাশংকর— এই তিন ছেলে। বড়ো মেয়ে ভুবনময়ী নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন, ইনি আজও জীবিত আছেন এবং ভাঙাবাড়িতে বাস করিতেছেন। ভাঙাবাড়ি গ্রামে এখন কেবল কবির বাড়িতেই যে দুর্গাপূজা হয়, সে শুধু দেবী ভুবনময়ীর আন্তরিক চেষ্টা ও আগ্রহে। একবার কবির সংসারে টাকাকড়ির অভাব হইলে, ছেলেরা পূজা বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন ভুবনময়ী আকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আগে তোরা আমার গলায় ছুরি দে, তারপর যা-হয় করিস। আমার তো মরণ নেই। বাবার এই প্রকাণ্ড পূজার দালান কেমন করে খালি দেখব?' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারকানাথ রায়ের সহিত গোবিন্দনাথের মেজো মেয়ে দুর্গাসুন্দরীর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পরেই তিনি স্বামীর সহিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি এখন জীবিত নাই। ইহার চারি পুত্র— বড়ো কাকিনা রাজস্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়, মেজো শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, সেজো সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (জে এন. রায়), ছোটো শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়। গোবিন্দনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী রাধারমণী দেবী গত ১৩২১ সালে মারা গিয়াছেন। সু-লেখিকা শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী ইঁহার একমাত্র কন্যা। ইনি বেশ ভালো বাংলা লিখিতে পারেন। তাঁহার যে বাংলা লেখায় এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছে—সে কেবল তাঁহার ভাই রজনীকান্তের গুণে। ইঁহার রচিত 'প্রীতি ও পূজা', 'খোকা', 'গল্প', 'ভাব ও ভক্তি', 'দুটি কথা' এবং আর-আর বই বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আদর পাইয়াছে। ইনি প্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৈলাসগোবিন্দ দাশগুপ্ত এম-এ, মহাশয়ের স্ত্রী।

গোবিন্দনাথের ছোটো ভাই গুরুপ্রসাদ বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন। দাদার মতো তাঁহারও ফারসি ও সংস্কৃতে বিশেষ দখল ছিল। তা ছাড়া তিনি ইংরাজিও বেশ জানিতেন। দাদার সাহায্যে ঢাকা হইতে ওকালতি পাশ করিয়া তিনি সদরআলার (মুনসেফ) পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কালনা, কাটোয়া, রঙপুর, দিনাজপুর, ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে মুনসেফি করেন। পরে বরিশালে তিনি সব-জজ হন এবং কৃষ্ণনগরে বদলি হইয়া পেনশন পান।

কালনা ও কাটোয়া বৈষ্ণবপ্রধান জায়গা। ঐ দুই জায়গায় তিনি যখন মুনসেফ

ছিলেন, তখন সেখানকার বৈষ্ণবগণের সঙ্গে থাকিয়া তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনদিগের মনোহর পদাবলী বিশেষভাবে পাঠ ও আলোচনা করিতেন এবং এই আলোচনায় বৈষ্ণবধর্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগের ফল সাধনা, আর সেই সাধনার ফল 'পদচিন্তামণিমালা'— ব্রজবুলির প্রায় সাড়ে-চারি শত হীরামোতিতে এই পদচিন্তামণিমালা গাঁথা। কালনার প্রসিদ্ধ সিদ্ধবৈষ্ণব ভগবানদাস বাবাজি মহাশয় গ্রন্থের এই নাম দেন এবং শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ভাগবত প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় ইহার ভূমিকা লেখেন।

ভাঙাবাড়ির সেন-মহাশয়েরা শাক্ত। তাহাদের বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময়ে পাঠাবলি হইত। গুরুপ্রসাদের দাদা গোবিন্দনাথ শাক্ত ছিলেন। তাঁহার ভিতরও যেমন, বাহিরও তেমন ছিল— তাহার প্রাণে যেমন ভক্তি ছিল, বাহিরে তেমনি অনুষ্ঠানও ছিল। এদিকে গুরুপ্রসাদ দাদাকে খুব ভক্তি করিতেন, এমন অবস্থায় দাদার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহার মনের বৈষ্ণবভাব তিনি বাহিরে বড়ো একটা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তিনি দাদার চোখের বাহিরে বৈষ্ণবধর্মের সাধনা করিতেন। দাদার প্রতি এরূপ অচলা ভক্তি আজিকার দিনে বিরল হইলেও, সে সময়ে দুর্লভ ছিল না।

গুরুপ্রসাদ গান বড়ো ভালোবাসিতেন। নিজে কাহারো নিকট গীতবাদ্য শেখেন নাই, কিন্তু গান শুনিতে ও গাহিতে বড়োই ভালোবাসিতেন। রাজশাহির ধর্মসভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রসিদ্ধ গায়ক রাজনারায়ণের চণ্ডীযাত্রা ও কীর্তন-গান হইত। চণ্ডীর গান শুনিয়া তাঁহার 'ভাব' লাগিত এবং তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বার-বার রাজনারায়ণের সহিত কোলাকুলি করিতেন। কীর্তনে হরিনাম শুনিয়াও তাহার সেইরূপ 'ভাব' লাগিত।

১২৮৩ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার 'পদচিন্তামণিমালা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের পদাবলীও তিনি সুর করিয়া গান করিতেন। কোনও কোনও সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িত। বালক রজনীকান্ত পিতার এইরূপ ভাবাবেশ দেখিতেন এবং তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুহৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। তাই পিতার গানের ও ভাবের প্রভাবে তিনি সুগায়ক ও সুকবি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পদাবলী প্রকাশের কিছুদিন পরে বড়ো আনন্দে গুরুপ্রসাদ দাদাকে বই দেখাইতে গেলেন। কিন্তু বই দেখিয়া গোবিন্দনাথ বলিলেন, 'বই ভালো হয়েছে, কিন্তু এতে মায়ের নাম কই?' দাদার অনুযোগ ছোটো ভাইয়ের প্রাণে বেশ

লাগিল। ভ্রাতৃভক্ত গুরুপ্রসাদ শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ব্রজবুলিতে 'অভয়া-বিহার' নামক আর-একখানি কাব্য লিখিলেন। ইহা গুরুপ্রসাদের শেষবয়সের লেখা ; ইহাতে দক্ষপ্রজাপতি-গৃহে সতীব জন্ম হইতে দক্ষযজ্ঞে তাঁহার দেহত্যাগ পর্যন্ত লেখা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বইখানি তিনি বা রজনীকান্ত কেহই প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।[১]

গুরুপ্রসাদ অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কোনও উৎসবের সময়ে তাঁহার বাড়িতে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। তিনি তাঁহাদেব পা ধোয়াইবার জন্য আসিলে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বলিলেন— 'বাড়িতে এত দাসদাসী থাকিতে আপনি কেন?' তাহাতে গুরুপ্রসাদ বলেন, 'আমি সদবালা বটে, কিন্তু এখানে আপনাদের দাস।'

গোবিন্দনাথেব মেজাজ একটু কড়া ছিল। বাজশাহিতে একজন নূতন মুনসেফ বদলি হইয়া আসিলে, গোবিন্দনাথ একদিন তাঁহাব এজলাসে হাজিব হন। কী কথায় হাকিম ও উকিলেব মধ্যে একটু বচসা হয়। গোবিন্দনাথ হঠাৎ চটিয়া বলিলেন, 'দেখুন মহাশয়, আপনাব সহিত মিছে তর্ক কবতে চাই নে। আপনার মতো কত মুনসেফ আমাব তামাক সেজে দেয়!' তিনি এই কথা বলিয়াই এজলাস হইতে বাহির হইয়া যান। পরে গুরুপ্রসাদ ছুটিব সময়ে রাজশাহিতে আসিলে, গোবিন্দনাথ ঐ মুনসেফ বাবুকে সাদবে আপনাব বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। উক্ত মুনসেফ বাবু নিমন্ত্রণরক্ষার্থ গোবিন্দনাথেব বাড়িতে আসিলে, তাঁহার সমক্ষে গোবিন্দনাথ গুরুপ্রসাদকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে বলিলেন। মুনসেফ বাবু গুরুপ্রসাদকে চিনিতেন ; সুতবাং তাঁহাকে দেখিয়াই গোবিন্দনাথের সেদিনকার কথার ভাব বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে গোবিন্দনাথের কথার রস ততটা না ফুটিলেও, গুরুপ্রসাদের ভ্রাতৃভক্তির পরিচয় অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মাহিনার টাকা পাইবামাত্র গুরুপ্রসাদ সমস্ত টাকা দাদার নিকট পাঠাইয়া দিতেন, পরে তাঁহার নিকট হইতে দরকারমতো বাসাখরচ চাহিয়া লইতেন। দুই ভাইয়ের যিনি যাহা রোজগার করিতেন, তাহাতে উভয়েরই সমান অধিকার ছিল। যাহা-কিছু জমিজমা গোবিন্দনাথ করিয়াছিলেন, তাহা উভয়েই ভোগ করিতেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে পাছে পুত্রপৌত্রের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি লইয়া কোন-

১ এই গ্রন্থের দুইখানি কাপি ছিল : ইহার একখানি রাজশাহির প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়ের নিকট ছিল, কিন্তু ভূমিকম্পের সময়ে সেখানি নষ্ট হইয়া যায়। অপরখানি অদ্যাপি নাটোরের উকিল শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর রায় মহাশয়ের নিকট আছে।

রূপ বিবাদ-বিসংবাদ হয়, এই ভয়ে গোবিন্দনাথ সমস্ত বিষয় দুই সমান ভাগে ভাগ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন গোবিন্দনাথের তিন ছেলে ও গুরুপ্রসাদের দুই ছেলে। তাই গুরুপ্রসাদ এই প্রকার বিভাগে আপত্তি করিয়া পাঁচজনের জন্য সম্পত্তি সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে দাদাকে অনুরোধ করেন। তাঁহারই কথামতো সমস্ত সম্পত্তির সেইমতো উইল করা হইয়াছিল।

রজনীকান্তের জ্যাঠা ও বাপ দুইজনেই ভালো লোক ছিলেন এবং এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কীরূপ সম্প্রীতি ছিল, এই সকল ঘটনা হইতেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। রজনীকান্ত ও স্বলিখিত অসম্পূর্ণ আত্মজীবনচরিতে পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের যে চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

'আমার পিতা কিছু স্থির, ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, কোনও প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, বলিতেন, "বোস, বিবেচনা করিয়া দেখি।" পিতৃজ্যেষ্ঠের প্রকৃতিতে তেজস্বিতা, অহংকার, হঠকারিতা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইত। একজন কোমল, নম্র, "মাটির মানুষ", একজন উদ্ধত, মানোন্নত, গর্বী। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতি "আজন্ম-পরিবর্ধিত সখ্যে" মিলিয়া-মিশিয়া কোমল ও কঠোর, বিনয় ও গর্ব, গম্ভীরতা ও ঔদ্ধত্য— কেমন করিয়া নির্বিরোধে ও স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতে পারে তাহার উজ্জ্বল ও মনোহর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে।

'উভয়েই অন্নবিতরণে ও বিপন্নের সাহায্যে অর্থদান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। ধর্মপ্রবণতা, ঈশ্বরনিষ্ঠা, দুঃস্থের প্রতি করুণা ও দান, ইহার উপর অসামান্য প্রতিভা— এই সমস্ত দুর্লভ গুণে উভয় ভ্রাতাকে ভগবান্ ভূষিত করিয়াছিলেন, এবং অল্প দিনেই তাঁহারা এমন যশস্বী হইয়াছিলেন যে রাজশাহি ও পাবনা "গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ-ময়" হইয়াছিল। এখনও লোকে বলে "গোবিন্দ সেনের ভাঙাবাড়ি[১]"।' ('প্রতিভা', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা পৃ ৬৬-৬৭)।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাঙাবাড়ির সেন-গৃহে নানা পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান হইত। ৺দুর্গাপূজার সময়ে যখন আরতির বাজনা বাজিত, তখন দুই বৃদ্ধ অঙ্গনে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন ও দশপ্রহরণধারিণী দশভুজার মহিমমণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে দুই ভ্রাতার আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগবাটী নামক গ্রামে রজনীকান্তের মাতুলালয়। তাঁহার

১ এখানে 'ভাঙাবাড়ি' ভগ্ন অট্টালিকা নহে, ভাঙাবাড়ি গ্রাম।

মাতুল-বংশেরও নামডাক বড়ো কম ছিল না। তাঁহার মাতামহ হরিমোহন সেন মহাশয় রঙপুরে চাকুরি করিতেন। তাঁহার মাতুল পঞ্চানন সেন মহাশয়ের (ইনি হরলাল নামেও অভিহিত হইতেন) বাংলায় বেশ দখল ছিল। তিনি রাজশাহির অন্তর্গত পুটিয়ার চার-আনির রানী মনোমোহিনী দেবীর বিপুল সম্পত্তি পরিদর্শনের ভার পান। তিনি ছোটো ছোটো কবিতা রচনা করিতেন।

রজনীকান্তের জননী মনোমোহিনী দেবী গুণবতী, তেজস্বিনী ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন, অত বড়ো পরিবারের গৃহস্থালির কাজ তিনি সুন্দররূপে ও পরিপাটিভাবে করিতেন। ভাসুরের ছেলেমেয়েদের তিনি এতই আদরযত্ন করিতেন যে, তাহাদের মাতার অভাব তাহারা বুঝিতেই পারিত না।

রন্ধনকার্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্বামী রন্ধন-নৈপুণ্যের জন্য তাঁহাকে 'রান্নার জজ' বলিতেন। তাহার মতো পুলিপিঠা তৈয়ার করিতে প্রায় কেহ পারিত না। পাথরের উপর ছাচ কাটিতে ও ছবি আঁকিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি নারিকেলের ঝাড়, রথ, পদ্ম, চাঁপা ইত্যাদিও তৈয়ার করিতে পারিতেন। কবিজননী রন্ধনে সিদ্ধহস্ত ও শিল্পকলায় দক্ষ ছিলেন— এই সকল কথার অবতারণা একটু অপ্রাসঙ্গিক ঠেকিতেছে কি? রন্ধনকার্য উড়েবামুনের হাতে, শিশু ও গৃহস্থালি ঝিয়ের হাতে, আর বাড়ির নিত্যসেবা বেতনভোগী পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করিয়া আমরা আজকাল ভোগবিলাসে বিভোর। ফলে, গৃহের লক্ষ্মীরা রান্না ভুলিয়া গিয়াছেন, রন্ধনশালায় যাওয়াই এখন বিড়ম্বনায় দাঁড়াইয়াছে। ঝিয়ের উপর, দাইয়ের উপর শিশুর লালনপালন ভার পড়িয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়া ও ইন্ফ্যান্টাইল লিভারে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন ঘরে ঘরে প্রত্যেক মহিলাই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবারবর্গকে আহার করাইতেন। পল্লীতে কোনও গৃহে ক্রিয়াকাণ্ড হইলে, আনন্দ-উৎসব হইলে, পাড়ার পাঁচজন প্রাচীনা আসিয়া রন্ধনকার্যে যোগ দিতেন। রন্ধনে দ্রৌপদীরূপে হাসিমুখে হাজার লোকের রন্ধন করাতে তাঁহাদের শ্রান্তি হইত না, ক্লান্তি হইত না, বিরাগ থাকিত না, বিশ্রাম থাকিত না। সে কী আনন্দ, কী উৎসাহ! আবার অনেক প্রবীণা বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জন রন্ধনে পারদর্শিনী বলিয়া গ্রামে বিখ্যাত ছিলেন। রায়েদের বড়ো গিন্নী মধুর শুক্তানি রাঁধিতে পারিতেন, মুখুজ্জেদের মেজো বউ ইঁচড়ের ডালনা এমন চমৎকার পাক করিতেন যে লোকে বলিত, তিনি 'গাছপাঁঠা' রাঁধিয়াছেন। এমন প্রশংসাপ্রাপ্ত রন্ধননিপুণা রমণী তখন দুই-দশজন প্রতি গ্রামেই দেখিতে

পাওয়া যাইত। পাড়ায় নূতন জামাই আসিলে, গ্রামের শিল্পকলানিপুণা মহিলাগণ একত্র হইয়া নানা আয়োজনে জামাইকে ঠকাইবার ব্যবস্থা করিতেন। শোলার অন্ন, বাঁশের গেঁড়োর মাছের মুড়া প্রভৃতি সামগ্রী এখন ইতিহাসের শামিল হইয়াছে। তেমন সুন্দর চিত্রবিচিত্র আলপনা, লতাপাতা-শোভিত কাঁথা, মনোরম স্ত্রী-আচারের ছিরি, নানাবিধ খয়েরের খেলনা, মোমের বকমারি ফুলফল আর বড়ো-একটা দেখিতে পাই না। এই কুরুশ-কার্পেটের যুগে, সুতা ফিতা পশমের প্লাবনে পল্লীর সেই সুকুমার নারীশিল্প কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

মনোমোহিনী দেবী বাংলা লেখাপড়া জানিতেন এবং তাহার হাতের লেখাও সুন্দর ছিল। তিনি কাব্য পড়িতে ভালোবাসিতেন। কবিবর হেমচন্দ্রের তিনি একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশী দাসের মহাভারত, কালীকৈবল্যদায়িনী, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, কোকিলদূত, সীতার বনবাস, সতী নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার ভালোরূপ পড়া ছিল। অনেক সময়ে তিনি পুত্র রজনীকান্তের নানা গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিতেন। বাল্যকালেই তিনি পুত্রের হৃদয়ে বঙ্গসাহিত্যপ্রীতির বীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙালির নিজস্ব সনাতন ভাবধারাকে বালকের হৃদয়ের খাতে প্রবাহিত করিয়া দিবার চেষ্টাও তিনিই করিয়াছিলেন। তাই উত্তরকালে আমরা খাঁটি স্বদেশী কবি রজনীকান্তকে পাইয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি— তাহার পরমার্থসংগীত শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এগুলি মহাজনদিগের চিরাচরিত ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মনোমোহিনী দেবীর বৈধব্যজীবনও আদর্শস্বরূপ। শিবপূজা ও ত্রিসন্ধ্যার উপর ভক্তিময়ী মনোমোহিনী দেবীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি প্রতিদিন বিধিমতে শিবপূজা করিতেন, কোনও অনিবার্য কারণ বা কোনও প্রতিবন্ধকতা-বশত তাঁহাকে কোনও দিন সংক্ষেপে পূজা শেষ করিতে দেখা যাইত না। যখন তিনি জ্বর ও হাঁপানিতে শয্যাগত থাকিতেন, তখনও শিবপূজা, ইষ্টদেবপূজা ও গুরুপূজা যথারীতি করিতেন। সমস্ত দিন জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিলেও সন্ধ্যার পূর্বে তিনি স্নান করিয়া পূজায় বসিতেন। পূজায় বসিয়া জপ আরম্ভ করিলে তিনি আহারনিদ্রা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতেন, বাহ্য জগতের কর্ম-কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না।

তাঁহার দুই কন্যা ও তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীপ্রসাদ দুই বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর তাঁহার এক কন্যা জন্মে; তাঁহার নাম

ত্রিনয়নী, অল্প বয়সেই ইনি এক কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকারোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যে মাতৃহারা শিশুও বৃন্তচ্যুত কোরকের মতো অকালে শুকাইয়া যায়। রজনীকান্ত তাঁহার তৃতীয় সন্তান। রজনীকান্তের পরে ক্ষীরোদবাসিনী নামে তাঁহাব আর-একটি কন্যা হয। সিবাজগঞ্জ মহকুমার ঘোড়াচবা গ্রামনিবাসী বোহিণীকান্ত দাশগুপ্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয।

মনোমোহিনীব সর্বকনিষ্ঠ সন্তান জানকীকান্ত। এই জানকীকান্ত ও গোবিন্দনাথেব কন্যা অম্বুজাসুন্দবী, উভযে সমবযস্ক ছিলেন।

রজনীকান্ত এই নিষ্ঠাবান আদর্শ হিন্দু-পবিবারে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহাব জ্যেষ্ঠতাত হৃদযবান, পিতা ভক্তিমান এবং মাতা ধর্মপবাযণা ছিলেন। এই পাবিবাবিক ধর্মনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতাব সহৃদযতা ও ভক্তি এবং মাতার ধর্মশীলতা বজনীকান্তের চরিত্রে যে-অসামান্য প্রভাব বিস্তাব কবিযাছিল, তাহাতে তিনি যে উত্তবকালে কেবল বংশের মুখই উজ্জ্বল কবিযাছিলেন, তাহা নহে—তিনি দেশ ও জাতিব গৌববস্বরূপও হইযাছিলেন।

৩

শৈশব ও বাল্যজীবন

শৈশব হইতেই রজনীকান্তেব আকৃতিতে এমন একটি লাবণ্য পরিলক্ষিত হইত, যাহার প্রভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিও প্রথম দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। বযোবৃদ্ধির সহিত রজনীকান্তেব এই লোকচিত্তাকর্ষণী শক্তি উত্তরোত্তর পবিবর্ধিত হইয়াছিল।

রজনীকান্ত যখন ভাঙাবাড়িতে জন্মগ্রহণ কবেন, তখন তাঁহার পিতা কাটোয়ার মুনসেফ এবং জ্যেষ্ঠতাত রাজশাহির উকিল। তাঁহার জন্মের কিছু পরেই তাঁহার পিতা কাটোয়া হইতে কালনায় বদলি হন এবং রজনীকান্তও তাঁহার জননীর সহিত কালনায় গমন করেন। তিনি শৈশবের অধিকাংশ সময়ই জননীর সহিত পিতার বিভিন্ন কর্মস্থানে অতিবাহিত করেন।

বাক্‌স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ অঞ্চলের ভাষা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। শৈশবের অর্ধোচ্চারিত শব্দে রজনীকান্ত মাত্র যখন আত্মীয়স্বজনের আনন্দবর্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময়ে পূজার ছুটিতে একবার তাঁহার পিতা

ভাঙাবাড়িতে আগমন করেন। মহাপূজা উপলক্ষে তাঁহাদের বাড়িতে মহা ধুমধাম ও বহু লোকের সমাগম হইত। প্রতি পূজাতেই তাঁহাদের গৃহ পাঁচালি কীর্তন যাত্রা কথকতা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে সজীব হইয়া উঠিত। রজনীকান্তের মুখে অর্ধোচ্চারিত নবদ্বীপের ভাষা শুনিবার জন্য বহু নবনারী ব্যাকুল হইত। 'অমৃতং বালভাষিতম্' এই বাক্যের সার্থকতা রজনীকান্ত কর্তৃক শৈশবেই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রিয়দর্শন শিশু যত দিন গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন, তত দিন তাহাদের পল্লী নানা শ্রেণীর নবনারীসমাগমে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইত।

তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উদারতার পরিচয় শৈশবেই সূচিত হইয়াছিল। কেহ কোলে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পরিচিত-অপরিচিত-নির্বিশেষে সকলের কোলেই রজনীকান্ত হাসিমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন।

তাঁহার উত্তর-জীবনের সংগীতপ্রিয়তা, আবৃত্তিপটুতা ও রহস্যাভিনয়-দক্ষতার অঙ্কুর অতি শৈশব হইতেই দেখা দিয়াছিল। চারি বৎসরের নয়নাভিরাম শিশু যখন জ্যেষ্ঠতাতের ক্রোড়ে বসিয়া হাততালি দিতে দিতে মধুর বালকণ্ঠে গাহিতেন—

মা, আমায় ঘুরাবি কত
চোখ-ঢাকা বলদের মতো

তখন সকলে মুগ্ধনেত্রে শিশুর স্বভাবসরল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আর তাঁহার সংগীত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি গান শুনিতে বড়ো ভালবাসিতেন, একাগ্রচিত্তে গানের সুর ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। সংগীতের প্রতি তাহার এরূপ অনন্যসাধারণ আসক্তি ছিল যে, গান শুনিতে শুনিতে তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। এই আসক্তিই ক্রমে অনুকরণ, অভ্যাস ও অনুশীলন সাহায্যে শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আর তাহারই ফলে রজনীকান্ত একদিন অক্লান্ত ও সুকণ্ঠ গায়করূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন।

যখন সবেমাত্র তাঁহার অক্ষরপরিচয় হইয়াছে, তখনই তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের নানা অংশ লোকমুখে শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শিশুর মুখে আবৃত্তি শুনিবার জন্য ভাঙাবাড়ির সেন-গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগম হইত। জ্যেষ্ঠতাত বা পিতার কোলে বসিয়া শিশু অসংকোচে রামায়ণ-মহাভারতের নানা অংশ আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। শিশুর স্মরণশক্তি এত

তীক্ষ্ণ ছিল যে, তাঁহার কণ্ঠস্থ অংশের প্রথম চরণ ধরাইয়া দিলেই তিনি অনায়াসে অবশিষ্ট অংশ আবৃত্তি করিতেন।

এই সময়ে রজনীকান্ত হস্তপদাদি অবয়বের ইংরাজি প্রতিশব্দ কণ্ঠস্থ করেন। শারদীয় পূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপে দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমা দেখিয়া ইংরাজি ও বাংলা ভাষার অপূর্ব সম্মিলনে অপূর্ব ভঙ্গিতে তিনি দেবদেবীগণের রূপাদির যে ব্যাখ্যা করিতেন তাহা অপূর্ব। তৎকালে যাঁহারা সেই ব্যাখ্যা শুনিবার সুবিধা পাইতেন, তাঁহারাই বিস্মিত হইয়া উহা উপভোগ করিতেন।

পুত্রের এই আবৃত্তিশক্তি লক্ষ্য করিয়া গুরুপ্রসাদ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও স্বরচিত পদাবলী তাঁহাকে ধীরে ধীরে অভ্যাস করাইতেন এবং আবৃত্তি করিবার প্রথা ও প্রণালী শিক্ষা দিতেন।

অনুশীলন-ফলে তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠে। ৩১ আষাঢ় (১৩১৭) তারিখে তাঁহার হাসপাতালের সেবাপরায়ণ সহচর ও সখা, মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বক্সিকে রজনীকান্ত বলিয়াছিলেন : 'বই একবার পড়লে প্রায় মুখস্থ হ'ত, আমি তোমাকে একটা পরখ এখনও দিতে পারি। যে-কোনও একটা চারি লাইনের সংস্কৃত শ্লোক— যা আমি জানি না— তুমি একবার বললে, আমি immediately reproduce করব। একটুও দেরি হবে না।'

৪

সাংসারিক অবস্থা ও পারিবারিক দুর্ঘটনা

বাল্যকালে রজনীকান্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েন নাই। তিনি রাজশাহিতে আসিয়া একেবারে বোয়ালিয়া জেলা স্কুলে (পরে রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুল) ভর্তি হন।

বাল্যে তাঁহার স্বভাব উদ্ধত ও প্রকৃতি অস্থির ছিল, কাহাকেও তিনি ভয় করিতেন না। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন— 'আমি বাল্যকালে বড়ো অশান্ত ছিলাম'। ঘুড়ি-লাটাই, মার্বেল ও ছিপ-বড়শি লইয়া তিনি প্রায় সমস্ত দিনই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার ছোটো ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী যদি কোনও দিন তাঁহাকে বলিতেন, 'দাদা, পড়ছ না কেন ? বাবা যে মারবেন।' নির্ভীক রজনী-

কান্ত হাসিয়া উত্তর করিতেন, 'তার বেশি আর তো কিছু করবেন না!' যাহা হউক, এই উদ্দাম চপলতা ও অবাধ ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যেও পিতা ও জ্যাঠতুতো ভ্রাতা কালীকুমারের বিশেষ চেষ্টায় তিনি লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত প্রতিবেশীর গাছ হইতে ফুল-ফল চুরি করিয়া সহযোগীদিগকে বিলাইয়া দিতে আনন্দ লাভ করিতেন, পাখির বাসা ভাঙিয়া তাহাদের শাবক লইয়া খেলা করিতে বড়ো ভালবাসিতেন। তরলমতি শিশুর এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া, ভাগবতপ্রধান গুরুপ্রসাদ মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করিতেন। তিনি পুত্রকে কত বুঝাইতেন, কত শাসন ও তিরস্কাব করিতেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিতেন না— জীবে দয়া যে মানবের সারধর্ম, এই সরল সত্য বালকের হৃদয়ে তখনও রেখাপাত করিতে পারে নাই।

খেলিতে খেলিতে রজনীকান্ত বহুবার গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। গাছ হইতে পড়িয়া কয়েকবার তাঁহার হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসমসাহসী বালক কিছুতেই ঐ-সকল কার্য হইতে নিরস্ত হন নাই। পুত্রের এই চঞ্চল স্বভাব লক্ষ্য করিয়া পিতা শাসন ও তিরস্কারে তাহা সংশোধন করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোনক্রমেই তিনি রজনীকান্তকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না।

তিনি কখনো বেশি পড়িতেন না, যাহা পড়িতেন, তাহাই অল্প সময়ে আয়ত্ত করিয়া লইতেন। সারা বৎসর একরকম না পড়িয়া এবং পরীক্ষার সময়েও অতি অল্পদিন মাত্র পড়িয়া তিনি সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া গুরুপ্রসাদ স্নেহার্দ্রস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, 'দেখ, তুই না পড়ে এত পারিস, পড়লে না-জানি কত পারবি!' ১৩১৭ সালের ৩১ আষাঢ় তারিখে রোজনামচায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, 'তারপর দাবা, হারমোনিয়ম, তাস, ফুটবল — এই নিয়ে কাটিয়েছি। যেবার বি-এ পাশ হলাম, সেবার বাটীতে বসে কেবল হিন্দু হোস্টেলেরই ৮০।৮২ খানা পোস্ট-কার্ড পাই— যে এমন আশ্চর্য পাশ! ... আমি সব নষ্ট করে ফেলেছি হেমেন্দ্র! আমি যদি পড়তাম, তবে আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি যে কেউ আমার সঙ্গে compete কত্তে পারত না। আমি গান গেয়ে হেসে নেচে পাশ হয়েছি। I was never a book-worm, for I was blessed with very brilliant parts'।

রজনীকান্তের জ্যাঠতুতো ভ্রাতৃদ্বয়— বরদাগোবিন্দ সেন বি-এল, ও কালীকুমার সেন এম-এ, বি-এল, রাজশাহিতে ওকালতি করিতেন, কালীকুমারের নিকট

রজনীকান্ত পাঠাভ্যাস করিতেন। তিনি বাংলা ভাষায় অনেক ছোটো ছোটো কবিতা এবং 'মনের প্রতি উপদেশ' নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এই পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে আমার স্বর্গীয় বন্ধু পণ্ডিত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কাছ হইতে কালীকুমারের রচিত একটি কবিতার চারি চরণ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

পলিত হইলে কেশ
ধরিয়ে ররের বেশ
শ্বশুরের বাড়ি যাব হইয়ে জামাতা—
এই কি অদৃষ্টে মোর লিখেছে বিধাতা ?

অন্য লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রজনীকান্ত কালীকুমারের নিকট কবিতা রচনা করিতে শিখিযাছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কালীকুমারই রজনীকান্তের কাব্যগুরু, তিনিই কবির প্রাণে কাব্যের বীজ বপন করিযাছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও সহাযতায বাল্যকাল হইতে রজনীকান্ত কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

ইংরাজ কবি আলেকজাণ্ডার পোপ অতি শৈশবে আধো-আধো বাণীতে ছড়া কাটিতেন—

As yet a child, nor yet a fool to fame,
I lisp'd in numbers, for the numbers came.

এ কথা আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, কেননা তিনি ইংরাজ কবি। কিন্তু আমাদের বাঙালি কবি রজনীকান্তও অতি শিশুকাল হইতে মুখে মুখে পদ্য রচনা করিতেন, ইহা কি সকলের বিশ্বাস হইবে ?

বালক ঈশ্বর গুপ্ত যেমন বলিযাছিলেন—

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্যে কল্‌কাতায় আছি।

সেইরূপ বাল্যকালে রজনীকান্ত, তাঁহার জনৈক পূজনীয়া মহিলাকে লিখিয়াছিলেন—

শ্রীশ্রীশ্রীযুতা,
আমার জন্য এনো একজোড়া জুতা।

এই সময় বরদাগোবিন্দের ওকালতিতে খুব পসার, প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন। কালীকুমারের আয়ও মন্দ ছিল না। তাই বৃদ্ধ গোবিন্দনাথ

বিষয়কর্মের ভার বরদাগোবিন্দের হস্তে ন্যস্ত করিয়া রাজশাহি ছাড়িয়া ভাঙা-বাড়িতে চলিয়া গেলেন। গুরুপ্রসাদ তখন বরিশালের সব-জজ। কিছুদিন পরে তিনি কৃষ্ণনগরে বদলি হইলেন এবং উৎকট উদরাময় ও বাতরোগে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। তিনি ছুটি লইয়া রাজশাহি গমন করিলে, বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমার উভয়েই তাঁহাকে কহিলেন, 'ঠাকুর-কাকা, আমরা দু-ভাই ভগবানের ইচ্ছায় দু-পয়সা আনিতেছি, আর চিন্তা কী? এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া চাকরি করিলে আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে, আপনি অবসর গ্রহণ করুন।' তদনুসারে ১২৮১ সালে গুরুপ্রসাদ পেন্‌শন লইলেন। তখন রজনীকান্তের বয়স প্রায় দশ বৎসর।

আশ্চর্যের বিষয়, সেই সময়েই এই সুখী ও উন্নতিশীল পরিবারের উপর কালের কুটিল দৃষ্টি নিপতিত হইল। ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া কৃতী পুরুষগণের অবনতির পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। ১২৮৪ সালে (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ) অকস্মাৎ কলেরা রোগে বরদাগোবিন্দের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে কনিষ্ঠ কালীকুমার এতদূর মর্মাহত হইয়া পড়েন যে, সেই রাত্রিতে হৃদ্‌যন্ত্রের গতি বন্ধ হইয়া তিনিও অকালে মারা যান। বরদাগোবিন্দের স্ত্রী দুই বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, কালীকুমারের পত্নী আজিও জীবিত আছেন।

রাজশাহিতে গুরুপ্রসাদের বুকে মাথা রাখিয়া দুই ভ্রাতা ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই দুই উন্নতিশীল সচ্চরিত্র যুবকের জন্য চোখের জল ফেলিল। আর্তকণ্ঠে গুরুপ্রসাদ বলিয়া উঠিলেন, 'এই জন্যই কি তোরা আমাকে পেন্‌শন লওয়াইলি!' সমস্ত পরিজনবর্গ শোকে আকুল হইল, কেবল এই প্রাণান্তকর নিদারুণ সংবাদ পাইয়া চোখের জল ফেলেন নাই—গোবিন্দনাথ। তিনি তখন ভাঙাবাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া দুর্গানাম উচ্চারণপূর্বক চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় চণ্ডীর বেদিতে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'এই বৃদ্ধবয়সে আবার আমাকে ওকালতি করিতে হইবে!' জানি না, আদ্যাশক্তি মহামায়ার কোন্ অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির বলে অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ এই নিদারুণ পুত্রশোক জয় করিলেন; অথবা এই দুঃসহ অরুন্তুদ যাতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের নিম্নস্থলে প্রবাহিত হইতেছিল কিনা, কে বলিতে পারে? কিন্তু এ কথা সত্য যে, কেহ কোনও দিন তাঁহাকে শোকে মুহ্যমান হইতে দেখেন নাই।

বিপদ কখনো একাকী আসে না। বরদাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র কালীপদ

যকৃৎ-প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরে দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া এগারো বৎসর বয়সে সকল জ্বালা জুড়াইল। বৃদ্ধ গোবিন্দনাথ পৌত্রের মুখ চাহিয়া হয়তো পুত্রের বিয়োগকষ্ট ভুলিয়াছিলেন, বোধহয় ভাবিয়াছিলেন, 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' —পৌত্র তো তাঁহার পুত্রেরই নিদর্শন, পৌত্রই তাঁহার বংশধারাকে অক্ষুন্ন রাখিবে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসের অর্থ তো আমরা সকল সময়ে হৃদয়ংগম করিতে পারি না।

এই সময়ে আবার একদিন গুরুপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীকান্তকে এক ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিল। জানকীকান্তের সঙ্গে তাঁহার জ্যাঠতুতো ভগিনী অম্বুজাসুন্দরী ছিলেন, অম্বুজা ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজেও দষ্ট হইলেন। তাঁহার আঘাত তত গুরুতর হয় নাই, তাই ভগবানের কৃপায় অম্বুজা সে-যাত্রা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু জানকীকান্ত সেই কালরূপী কুকুরের দংশনে দশম বর্ষ বয়সে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

এই বালকের কমনীয় মূর্তি দেখিয়া এবং তাহার মধুর বাক্য শুনিয়া সকলে মোহিত হইত। সে অল্প বয়সে এরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে তাহার কথা বলিতে বলিতে এখনো অনেকে শোকে আত্মহারা হইয়া উঠেন। ৮।৯ বৎসর বয়সে সে ছোটো ছোটো ছড়া রচনা ও কঠিন সমস্যার পাদপূরণ করিত। তাহার কণ্ঠস্বর বেশ মধুর ছিল।

বৃদ্ধ বয়সের আশা-ভরসা, বিপুল সংসারের ভারগ্রহণকারী কৃতী পুত্রদ্বয় এবং নয়নানন্দদায়ক উদীয়মান দুইটি স্নেহের দুলালের অকালমৃত্যুতেও সেন-পরিবারের দুর্ভাগ্যের শেষ হইল না। এই সময় হইতে তাঁহাদের আর্থিক অবনতিরও সূত্রপাত হইল।

সেন-পরিবারের বহু অর্থ রাজশাহির ইন্দ্রচাঁদ কাঁইয়ার কুঠিতে গচ্ছিত ছিল। কান্তকবি তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতের প্রথম অধ্যায়ের খণ্ডিতাংশে লিখিয়াছেন,

'কুঠি দেউলিয়া পড়িয়া গেল। জ্যেষ্ঠতাত পুটিয়ার চারি-আনির রাজা পরেশ-নারায়ণ রায়ের বেতনভোগী উকিল ছিলেন এবং রাজার একটি বাসায় থাকিয়াই ওকালতি করিতেন। রাজার মৃত্যুর পর যাঁহারা সুসময়ে গোবিন্দনাথের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ও প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগেরই চক্রান্তে ও কুপরামর্শে বাসাটি গোবিন্দনাথের হস্তচ্যুত হইল। তখন রহিল কেবল একটি ভাড়াটিয়া বাসা, পিতৃদেবের পেন্‌শনের কয়েকটি টাকা ও ক্ষুদ্র সম্পত্তির সামান্য আয়। যাঁহারা উপার্জন ও ব্যয়ের হিসাব জীবনে করেন নাই,

দারিদ্র্য এবং অর্থহীনতা যাঁহাদের বাল্যজীবনে একবার মাত্র চকিত দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, যাঁহারা পরের দুঃখদুর্দশা দেখিয়া অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার জরাগ্রস্ত হইয়া অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের মুখ দর্শন করিলেন।...'

ভাগ্যবিপর্যয়ের এই করুণ চিত্র আমরা এইখানেই শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।



শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ

শৈশব হইতেই রজনীকান্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন। কাহারো সুমধুর সংগীত শ্রবণ করিলে তিনি আত্মহারা হইতেন এবং ঘরে ফিরিয়া সকলকেই সেই গান গাহিয়া শুনাইতেন। গানের যে অংশ তাঁহার স্মরণ হইত না, সেই অংশ তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া জোড়া দিয়া লইতেন। এই প্রক্ষিপ্ত অংশ এত সুন্দর হইত এবং মূলের সহিত তাহার এরূপ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত যে, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সহজে ধরা যাইত না। সংগীতচর্চার প্রারম্ভে তিনি একটি 'ফ্লুট্' বাঁশি ক্রয় করেন এবং উহারই সাহায্যে সংগীতাভ্যাস করিতে থাকেন। সংগীত তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ ছুটাইয়া দিত। মৃদঙ্গের মৃদু-গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া গান করা তাঁহার বাল্যের নিত্যক্রিয়া বা ক্রীড়া ছিল।

রজনীকান্তের অনুষ্ঠিত সকল কাজই অলৌকিক বলিয়া বোধ হইত। বাল্যকালে তিনি খুব ভালো জিমনাষ্টিক (gymnastic) করিতে পারিতেন। তিনি একবার জিমনাষ্টিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া রাজশাহি কলেজে পুরস্কার পান। তিনি এমন সুন্দর ground exercise (জমির উপর কসরৎ) করিতেন যে, বোধ হইত তাঁহার গলায় ও কোমরে হাড় নাই। তাঁহার সঙ্গে হা-ডু-ডু খেলায় কেহই জিতিতে পারিত না। পাবনা জেলায় প্রচলিত 'ট্যাম্‌বাড়ি' ও 'টুন্‌কিবাড়ি' প্রভৃতি খেলাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। একবার কয়েকজন বন্ধুর সহিত সুবিশাল পদ্মানদীতে সাঁতার দিতে দিতে তিনি নদীমধ্যে বহুদূরে গিয়া পড়েন। বন্ধুরা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তবুও তিনি ফিরিলেন না, তিনি তখন একটি

কুমিরের পিঠকে চর ভ্রম করিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিতেছিলেন। পরে নিকটে গিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি সাঁতার দিয়া তীরে ফিরিয়া আসেন।

রজনীকান্ত নানা প্রকার ব্যায়ামচর্চায় প্রবৃত্ত হন। একই প্রকার ব্যায়াম অভ্যাসের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ, তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে নূতনের দিকে আকৃষ্ট হওয়া মানবের স্বাভাবিক ধর্ম। এইজন্য যখনই কোনও ব্যায়ামের অভিনবত্বের লোপ হইত, উহাতে বন্ধুদিগের উৎসাহ কমিয়া যাইত, তখনই তিনি নূতন ব্যায়ামের অনুষ্ঠান করিতেন।

তিনি সর্বনিম্ন শ্রেণী হইতে এনট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিতেন। *Moral Class Book* পড়িবার সময়ে তিনি উহার অনেকগুলি গল্প বাংলা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১২।১৩ বৎসর। বোধ-হয়, সেইগুলিই রজনীকান্তের প্রথম রচনা। চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত ইংরাজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার জন্য যে প্রশ্ন থাকিত, তাহা তিনি প্রায়ই পদ্যে লিখিয়া দিতেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িবার সময় হইতে যখন তিনি পূজা ও গ্রীষ্মের ছুটিতে ভাঙাবাড়ি যাইতেন, তখন তাঁহাদের প্রতিবেশী ৺রাজনাথ তর্করত্নের নিকট সংস্কৃত শিখিতেন। এই সংস্কৃত অধ্যয়নকার্যে তাঁহার অভিন্নহৃদয় বাল্যসহচর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্তী কবিশিরোমণি তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। এই সময় হইতেই রজনীকান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার কয়েক বৎসর পূর্বে পাবনা ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ও স্বত্বাধিকারী এবং পাবনা কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামধন্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষার্থী হইয়া রাজশাহিতে আসেন। গুরুপ্রসাদ তাঁহাকে নিজ বাসায় রাখিয়া বালক রজনীকান্তের শিক্ষাভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন। লাহিড়ী-মহাশয়ের শিক্ষা-কৌশলে মেধাবী ছাত্র উত্তরোত্তর বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন করিয়া অচিরকাল-মধ্যেই যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাল্যকাল হইতেই বাংলার ন্যায় সংস্কৃতেও তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার ছন্দোজ্ঞানও ভালো ছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। রোজনামচার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন— 'আমি কটকে উদ্ভটসাগরকে [শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি-এ]

যে সংস্কৃত কবিতা দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলাম, তিনি তা পড়ে সে কবিতা কটি মাথায় করে হাজার লোকের মধ্যে পাগলের মতো রীতিমতো নাচতে আরম্ভ করলেন।'

পত্রাদি রচনায় কোনও বর্ণবিন্যাসে ভুল দেখিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন এবং বলিতেন, 'সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লোকের এত অশ্রদ্ধা যে আমি একখানিও নির্ভুল পত্র দেখি নাই'। তিনি আরও বলিতেন যে, মূর্খ তিন প্রকার : ১. যে লেখাপড়া জানে না, ২ যে সামান্য পত্রাদি লিখিতেও বানান ভুল করে, ৩ যে পুস্তকাদিতে কোনও ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে সংশোধন করিতে সাহসী হয় না।'

এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ববৎসর কিশোর কবি সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

ততঃ শ্রুত্বা পিতুর্বাক্যং পতিমুদ্দিশ্য দারুণম্।
রুরোদ শোকসন্তপ্তা সতী ত্রিভুবনেশ্বরী ॥
হা পিতঃ! কুত্র তত্তেজঃ প্রাজাপত্যং স্থমানিতম্।
ত্রৈলোক্যং বিদিতং যেন কুত্র তত্তপসো বলম ॥

তাহার পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচিত একটি সংগীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

নবমী দুঃখের নিশি দুঃখ দিতে আইল।
হায় রানী কাঙ্গালিনী পাগলিনী হইল ॥
উমার ধরিয়া কর, কহে, উমা আয় রে।
এমন করিয়া দুঃখ দিয়া গেলি মায়ে রে ॥
সারাটি বরষ তোর মুখ পানে চাহিয়ে।
আসিবি রে আশা করি থাকি প্রাণ ধরিয়ে ॥
কত আশা করে থাকি পারি না তা বলিতে।
তিন দিনে চলে যাস পারি না তা পুরাতে ॥
তোর মত দয়াহীনা মেয়ে আমি দেখি নি।
ওমা, উমা ছেড়ে যাস— দেখে দীন-দুঃখিনী ॥

অপরের রচিত গান গাহিয়া রজনীকান্তের তৃপ্তি হইত না। তাই তিনি কিশোর বয়স হইতে নিজে গান বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। প্রতিমার সম্মুখে

দাঁড়াইয়া ভাববিভোর বালক স্বরচিত ভক্তিরসাত্মক গান গাহিতেছেন— সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তাহার বাল্যের রচনা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যে দুই-একটি গান এখনো পাওয়া যায়, তাহারই মধ্য হইতে একটি গানের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

(মায়ের) চরণ-যুগল, প্রফুল্ল কমল
মহেশ স্ফটিক জলে,
ভ্রমর নূপুর ঝংকারে মধুর
ও পদকমল-দলে।

এই চারি পঙ্‌ক্তির মধ্যে কী সুন্দর ভাব ও অলংকার। এইসব গান যখন তিনি রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

রজনীকান্তের একজন বাল্যসুহৃদ ও সহাধ্যায়ী ছিলেন গোপালচরণ সরকার। ইনিও একজন কবি। এন্‌ট্রান্স ক্লাসে একত্র পড়িবার সময়ে উভয়ের মধ্যে কবিতা লেখা লইয়া প্রতিযোগিতা চলিত।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে (১২৮৮ সালে) আঠারো বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পাশ করিয়া ১০ টাকার গভর্নমেণ্ট-বৃত্তি লাভ করেন এবং রাজশাহি বিভাগের যাবতীয় স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট ইংরাজি প্রবন্ধ রচনার জন্য 'প্রমথনাথ বৃত্তি' (মাসিক ৫ টাকার) পাইয়া রাজশাহি কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এনট্রান্স পাশের পরে ১২৯০ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার বেউথাগ্রাম নিবাসী স্কুলবিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর তারকনাথ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। রজনীকান্তের স্ত্রী কবিত্বশক্তির অধিকারিণী না হইলেও চিরদিন সাহিত্যানুরাগিণী। তিনি স্বামীর কবিতা পাঠ করিয়া অনেক সময়ে কবির সহিত কাব্যালোচনা করিতেন এবং কখনো কখনো তাঁহার কবিতার বিষয় নির্বাচন করিয়া দিতেন। তিনি উচ্চ-প্রাইমারি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি পরিষ্কার। তাঁহার প্রকৃতি সরল এবং লোকের সহিত ব্যবহারে তিনি মূর্তিমতী অমায়িকতা।

৬

প্রতিভার বিকাশ

বয়োবৃদ্ধির সহিত রজনীকান্ত যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার মধুর চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত প্রতিভাও তেমনি সুপবিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিল। বয়ঃকনিষ্ঠ রজনীকান্তের মুখে নৈতিক উন্নতিবিষয়ে সৎপরামর্শ পাইয়া, গ্রামের অনেক প্রবীণ ব্যক্তিও চিরদিনের জন্য স্ব-স্ব কদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে রজনীকান্তকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। যৌবনে রজনীকান্তের নৈতিক চরিত্র ভাঙাবাড়ি গ্রামের তৎকালীন বালক- ও যুবক-সমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। রজনীকান্তের আদর্শচরিত্রের প্রভাব কেবল বহির্বাটীতে পুরুষসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্তঃপুর পর্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পল্লীর বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা— সকলে রজনীকান্তকে ভয় ও ভক্তি করিতেন এবং পাছে তাঁহাদের কোনও সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি রজনীকান্তের কর্ণগোচর হয়, এই ভাবিয়া তাঁহারা সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। তাই পূজা ও গ্রীষ্মের অবকাশে যখনই তিনি ভাঙা-বাড়িতে আসিতেন, তখনই সেই কিশোর বালকের আগমনে পল্লীমধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত।

ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার প্রতিভার কিরণ অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি এই সময় হইতে গল্প বলিবার অসাধারণ শক্তি লাভ করেন। বাড়িতে আসিলেই পল্লীর যুবতী ও বালিকাগণ, এমনকি বৃদ্ধার দলও, গল্প শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন— বন্ধুবান্ধব ও পল্লীবৃদ্ধদের তো কথাই ছিল না। নানা দেশের কাহিনী, ইতিহাস ও ডিটেক্‌টিভ গল্পসমূহ তিনি এমন মনোরম ভঙ্গিতে, এমন চিত্তাকর্ষকভাবে বলিতে পারিতেন যে লোকে তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়া আহারনিদ্রা ভুলিয়া যাইত। বহুবারশ্রুত ডিটেক্‌টিভ গল্প রজনীকান্তের বলিবার গুণে লোকে অভিনব-বোধে পুনরায় শুনিতে চাহিত। তাঁহার ভ্রাতৃপ্রতিম স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'তাঁহার গল্প শুনিবার জন্য শৈশবে আমাদের বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে।'

সমবয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে তিনি ছিলেন 'চাঁই'— তা কি ফুটবল খেলায়, কি জিমনাষ্টিকে, কি দেশের উন্নতিসাধনে। ছুটির সময়ে ভাঙাবাড়ি গিয়া রজনীকান্ত আহার ও পাঠের সময় ব্যতীত বাকি সময় পল্লীর উন্নতিকল্পে এবং প্রতিবাসীগণকে আমোদ-আহ্লাদ দিবার জন্য অতিবাহিত করিতেন। কখনো বা বৃদ্ধমহলে, কোন-

দিন বা প্রৌঢ়দিগের মজলিশে, কোনও সময়ে বা বৃদ্ধা কিংবা যুবতী কুলবধূগণের পাকশালার পার্শ্বে বা যুবক ও বালকগণের ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে অথবা বালিকাগণের খেলাঘরের সন্নিকটে তাঁহাকে কোনও না কোনও অভিনব তত্ত্বব্যাখ্যায় বা কোনও কৌতুকজনক বস্তুপ্রদর্শনে অথবা কোনও সরস ও সদ্ভাবপূর্ণ উপাখ্যানবর্ণনে নিযুক্ত দেখা যাইত। এই সময়ে রজনীকান্তের উপস্থিতিতে সমস্ত পল্লী যেন আনন্দের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিত।

রজনীকান্তের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তাঁহার একটি সহচর লাভ হয়। তিনি ভাঙাবাড়ি-নিবাসী তারকেশ্বর চক্রবর্তী, তখন তাঁহার বয়স আঠারো বৎসর। তিনি সেই বয়সেই সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সংস্কৃত কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিত এবং তিনি সংস্কৃতে ও বাংলায় কবিতা লিখিতেন। ছুটি উপলক্ষে গৃহে গমন করিয়া রজনীকান্ত তারকেশ্বরের সঙ্গলাভে আনন্দিত হইতেন। তাঁহারা দুইজনে একত্র হইয়া সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত ও বাংলা— মিশ্র-ভাষায় কবিতা লিখিতেন এবং কাব্য, ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এই সময়ে রজনীকান্ত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্যখানি দ্বিতীয় বার পাঠ করেন। তদ্ভিন্ন, কালিদাস, মাঘ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মনীষীগণের কাব্যাদি তিনি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। তারকেশ্বরের একটি অনন্যসাধারণ গুণ ছিল, তিনি কবিওয়ালাদের মতো ছড়া ও পাঁচালি মুখে মুখে তৈয়ার করিয়া দুই-তিন ঘণ্টা অনর্গল বলিতে পারিতেন। তাঁহার দেখাদেখি রজনীকান্তও ঐরূপ 'ছড়া ও পাঁচালি' রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তারকেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন— 'ঐ সময়ে সে আমার অনুকরণ করিতে এত তীব্রভাবে চেষ্টা করিত যে কেবল শারীরিক বল ভিন্ন আর সকল বিষয়েই সে আমার সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল। বরং কোনও কোনও বিষয়ে সে আমা অপেক্ষা কিছু কিছু উন্নতি লাভও করিয়াছিল।'

এই তারকেশ্বরই রজনীকান্তের সংগীতগুরু। বাল্যকালে তারকেশ্বরের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। তাঁহার নিকটে থাকিয়া এবং তাঁহার সুমধুর গান শুনিয়া রজনীকান্তের সংগীতলিপ্সা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তিনি বাল্যকালে যে সকল গান গাহিতেন, রজনীকান্ত সেগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা করিতেন। কান্তকবির সংগীতচর্চা সম্বন্ধে তারকেশ্বর লিখিয়াছেন—

'তখন সে অল্প অল্প ছোটো স্বরে গান করিতে পারিত, ঐ গান আমার নিকট বড়োই মিষ্ট লাগিত। আমিও তখন সংগীত বিষয়ে কোনও শিক্ষা লাভ

করি নাই, শুনিয়া শুনিয়া যাহা শিখিতাম তাহাই গাহিতাম। বৎসরের মধ্যে যে নূতন স্বর বা গান শিখিতাম, রজনীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহা তাহাকে শুনাইতাম, সেও তাহা শিখিত। পরে যখন একটু সংগীত শিখিতে লাগিলাম, তখনও বড়ো বড়ো তাল, যথা— চৌতাল স্বরফাঁক প্রভৃতি, একবার করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিতাম, তাহাতেই সে তাহা আয়ত্ত করিত এবং ঐ সকল তালের মধ্যে আমাকে সে এমন কূট প্রশ্ন করিত যে আমার অল্পবিদ্যায় কিছু কুলাইত না।

'একবার রাজশাহি হইতে একজন পাচক-ব্রাহ্মণ ভাঙাবাড়ি আসিয়াছিল। তাহার নাম কুমারীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কি বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে। সে সর্বদাই গান করিত। তাহার একটি গানের প্রথম ছত্র —

গেঁথেছি মালা সুচিকন, ধর লো রাজবালা।

এই গানের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া রজনীকান্তও একখানি গান রচনা করিয়াছিল, তাহার কতক অংশ এই—

কে রে বামা বণ মাঝে মনোমোহিনী।
ভূপ হে, এ কী রূপ ধরা মাঝে সৌদামিনী,
কালো কি আলো করে, এ কালো আলো করে
মুনির মনোহরা এ কামিনী।

এরূপ আরও অনেক গান সে সেই বয়সেই রচনা করিয়াছিল, সে-সব আমার স্মরণ নাই।'

রজনীকান্তের সময়ে পদার্থবিজ্ঞান এফ এ পরীক্ষার্থীর অন্যতর অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। এখনকার মতো তখন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় এত যন্ত্রাদির আবির্ভাব হয় নাই। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য রজনীকান্তকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইয়াছিল। বাড়ি আসিলেই তিনি সেগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন এবং পল্লীস্থ ছাত্রবৃত্তি স্কুলের ছাত্রদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানের স্থূল, নীরস তত্ত্বগুলি সরস ও সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন।

এই সময়ে উদ্ভিদবিদ্যার প্রতিও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মে। অবসরমতো তিনি নানাজাতীয় গাছগাছড়া, ফলফুল, শাকসবজি লইয়া পরীক্ষা করিতেন এবং আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদিতে তাহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিতেন। তৎকালে ভাঙাবাড়ির গ্রাম্য স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বালকগণকে

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কৃত 'কৃষি-পরিচয়' ও 'কৃষি-সোপান' পড়িতে হইত। রজনীকান্ত নিয়মিতভাবে একদিন অন্তর স্কুলে উপস্থিত হইয়া ছাত্রবৃন্দকে কৃষি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। যাহাতে ছাত্রগণ বাল্যকাল হইতে বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতে অভ্যাস করে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিতে পাবে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি ভাঙাবাড়ি স্কুলের ছাত্রগণমধ্যে বহুতব পুরস্কার প্রদান করিতেন।

ভাঙাবাড়িতে তিনিই প্রথমে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাব প্রচলন করেন। তাঁহাব প্রবর্তিত এই নূতন খেলাব স্রোত গ্রামে বহুকাল সমভাবে বহিয়াছিল। এই সমস্ত ক্রীড়াব খরচপত্র তিনি নিজেই বহন করিতেন। শুধু তাহাই নহে— লোকজন সংগ্রহ, খেলা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান, প্রভৃতি কার্য তিনি স্বেচ্ছায় নিজের হাতে গ্রহণ কবিতেন।

এই সময়ে তিনি নিয়মিত ও ধাবাবাহিকরূপে বাংলা সাহিত্যের চচায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ হইতে আবম্ভ কবিয়া তিনি আধুনিক কালের প্রায় সমস্ত কবির কাব্যগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিতে আবম্ভ কবেন। ভাঙাবাড়ি বঙ্গ-বিদ্যালয়ের তৎকালীন হেডপণ্ডিত মহম্মদ নজিবর রহমান সাহেব অনেক সময়ে তাহার এই সাহিত্যালোচনায় যোগদান কবিতেন। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বাংলা মাসিকপত্রসমূহ সংগ্রহ করা এই সময়ে তাঁহার জীবনের অন্যতব কার্য ছিল। তিনি ঐ সকল সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, অবসরমতো সেগুলি পাঠ করিয়া রীতিমতো আলোচনা করিতেন।

কবিতা রচনা ব্যতীত আব একটি সুকুমার কলার প্রতি রজনীকান্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নাট্যকলা ও অভিনয়ক্রিয়া এই সময় হইতেই অল্পে অল্পে রজনীকান্তের উপব প্রভাব বিস্তাব কবিতে থাকে। ফলে উত্তরকালে তিনি ভাঙাবাড়িতে শখের থিয়েটারের প্রচলন করেন। প্রথমে প্রথিতযশা লেখক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাটকাকারে লিখিত অংশ 'সরলা' অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়, কিন্তু কোনও কারণে ইহার পরিবর্তে 'বঙ্গের গ্যারিক' স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রণীত 'বিল্বমঙ্গল' অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে রজনীকান্তের বাল্যবন্ধু তারকেশ্বর কবিশিরোমণি মহাশয় 'বিল্বমঙ্গল' এবং রজনীকান্ত স্বয়ং 'পাগলিনী'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'পাগলিনী'র ভূমিকা একপ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল এবং গানগুলি এমন মধুরকণ্ঠে

ও একপ প্রাণস্পর্শীভাবে গীত হইয়াছিল যে, ভাঙাবাড়ির অনেকে আজিও তাহার উল্লেখ করেন। রজনীকান্তের সাধনা কত কঠোব ছিল, তাহা তাঁহার এই অভিনয়েব সাফল্য হইতেই স্থচিত হইবে। বজনীকান্ত অন্য বিষযেও যেরূপ উদ্দেশ্যেব দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিযা, উপায উদ্ভাবন হইতে আরম্ভ কবিযা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি পর্যস্ত কথনো কর্মকর্তারূপে, কথনো বা কার্যকারকরূপে কার্য করিতেন, এ ক্ষেত্রেও তাহাব অন্যথা হয নাই। নাট্যাভিনযেব কল্পনা হইতে আবম্ভ কবিযা বিষয নির্বাচন, বিভিন্ন চবিত্রের বক্তব্য লিখন, ভূমিকাব অভিনেতা নির্বাচন, অভিনযে শিক্ষাদান, রঙ্গমঞ্চ গঠন প্রভৃতি সমুদয কার্যেই বজনীকান্তেব অদম্য উৎসাহ এবং অসাধাবণ অধ্যবসায সমভাবে পরিলক্ষিত হইত। যে সময়ে এই নাট্যাভিনযের প্রথম অনুষ্ঠান হয, তখন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় নিয়ত নিযুক্ত। প্রত্যহ সন্ধ্যাব পব তিনি দুই ঘণ্টা সংস্কৃত পাঠ কবিতেন এবং আহারান্তে অভিনযশিক্ষাগৃহে উপস্থিত হইযা সমবেত বন্ধুবর্গকে অভিনয শিক্ষা দিতেন। এই গুরুগিবিতে একদিনও তাঁহাব কামাই ছিল না— কথনো গান শিখাইতেছেন, কথনো উচ্চাবণ বলিযা দিতেছেন, কথনো বা অঙ্গভঙ্গি দেখাইযা দিতেছেন— তখন তাঁহার উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে!

৭

ছাত্রজীবনে রসরচনা

রজনীকান্ত যখন রাজশাহি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ এডওয়ার্ড সাহেব বাজশাহি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে মালদহের পবলোকগত ঐতিহাসিক বাধেশচন্দ্র শেঠ, মালদহের সুপ্রসিদ্ধ উকিল স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ এবং কুষ্টিয়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রময সান্যাল এম-এ, বি-এল, রজনীকান্তের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

অধ্যাপকের আসিতে বিলম্ব হইলে বা ক্লাস বসিতে দেরি থাকিলে তিনি ক্লাসে বসিয়া বহু রহস্য-আলোচনায় সহপাঠীগণকে আনন্দ দিতেন। এই সময়ে তিনি বেশির ভাগ সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত যে-কয়টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া গিয়াছে, রচনার বিবরণ সমেত সে-কয়টি প্রদান করিতেছি। এইগুলি শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সান্যাল বি-এ, মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি।

রজনীকান্ত একদিন কলেজে বসিয়া বোর্ডের উপর লিখিলেন—

রমতে রমতে রমতে রমতে।

এবং তাঁহার সহপাঠীগণকে ইহার পাদপূরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যখন কেহই তাঁহার অনুরোধে পাদপূরণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন তিনি নিজেই এইভাবে কবিতাটির পাদপূরণ করিলেন—

গহনে গহনে বনিতা-বদনে,
জনচেতসি চম্পকচূত-বনে।
দ্বিরদো দ্বিপদো মদনো মধুপো
রমতে রমতে রমতে রমতে॥

[দ্বিরদঃ (হস্তী) গহনে (বিজনে) গহনে (বনে) রমতে। দ্বিপদঃ (মানবঃ) বনিতা-বদনে রমতে। মদনঃ (কামভাবঃ) জনচেতসি (লোকচিত্তে) রমতে। মধুপঃ (ভ্রমরঃ) চম্পকচূত-বনে রমতে।]

অর্থাৎ : 'বিজন বনে হাতি, বনিতা-বদনে মানুষ, লোকের চিত্তে কাম এবং চম্পক ও আম্রকাননে মধুকর রমণ করিয়া থাকে।'

তিনি শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করিয়া সংস্কৃতে নানা প্রকার ব্যঙ্গকবিতা রচনা করিতেন। চিরপ্রথামতো রচনার প্রারম্ভেই সরস্বতীকে স্মরণ করিতেছেন—

এতেষাং শিক্ষকানান্তু বর্ণ্যতে প্রকৃতির্ময়া।
বাগ্‌দেবি দেহি মে বিদ্যামস্মিন্ দুঃসাধ্যকর্মণি॥

অর্থাৎ : 'আমি এই সকল শিক্ষকের স্বভাব বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই দুঃসাধ্য কার্যে, দেবি সরস্বতি, আমাকে বিদ্যাদান করুন।'

সে সময়ে কালীকুমার দাস মহাশয় রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু সভাসমিতিতে তিনি ভালোরূপ বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন—

ব্যাকরণে মহাবিদ্যা 'ব্যা-ব্যা'-করণতৎপরঃ।
কস্মিংশ্চিদ্ যদি বা কালে ক্রিয়তেঽসৌ সভাপতিঃ।
সমারোহং সমালোক্য 'চরকিমাতং' প্রজায়তে॥

অর্থাৎ : 'ইহার ব্যাকরণশাস্ত্রে মহাবিদ্যা কেবল ব্যা-ব্যা-করণতৎপর (অর্থাৎ "ব্যা-ব্যা" করা স্বভাব) ; কিন্তু যদি কোনও সময়ে ইহাকে সভার সভাপতি করা হয়, তবে লোকসমাগম দেখিয়া তাঁহার "চরকিমাত" (ত্রাস) উৎপন্ন হইবে।'

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এডওয়ার্ড সাহেব তখন রাজশাহি কলেজের অধ্যক্ষ। কেরানি বিনোদবিহারী সেন তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি শুদ্ধ করিয়া ইংরাজি বলিতে পারিতেন না। একদিন কলেজের খিলানের উপর একটি পাখি বসিয়াছে দেখিয়া এডওয়ার্ড সাহেব বন্দুক লইয়া তাহা শিকার করিতে উদ্যত হইলে, বিনোদবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'Sir, Sir, it will won't die!' এই বিনোদবাবুকে উপলক্ষ করিয়া রজনীকান্ত বলিয়াছিলেন—

এডওয়ার্ড-কৃপেরন্তা বিনোদ ইতি নামতঃ।
বিদ্যাবন্তা বুদ্ধিরন্তা ইংলিশঃ সবদা মুখে॥

হরগোবিন্দ সেন মহাশয় তখন রাজশাহির একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা অতুলনীয় এবং শিক্ষকতাকার্যে তাহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার স্ফীত উদর লক্ষ্য করিয়া কবি নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখেন—

অজরোঽমরঃ প্রাজ্ঞঃ হরগোবিন্দশিক্ষকঃ।
বেতনেনোদরস্ফীতঃ বাগ্‌দেবী উদরস্থিতা॥

অর্থাৎ: 'শিক্ষক হরগোবিন্দ বাবু প্রবীণ, অজর ও অমর (জরামৃত্যুহীন)। বেতনের কল্যাণে পেট মোটা হইয়াছে— বিদ্যা সমস্তই পেটে, মুখে আসে না।'

পঠদ্দশায় তিনি এইরূপ বহু সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেইগুলি এখন আর পাওয়া যায় না।

৮

শিক্ষা-সমাপ্তি

রজনীকান্ত রাজশাহি কলেজ হইতে ১২৯১ সালে (১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে) দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পাশ করেন। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সকল ডিসেম্বর মাসে গৃহীত হইত, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে মার্চ মাসে পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্তিত হয়। সেই জন্য রজনীকান্তের ন্যায় যাঁহারা ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে এনট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষা দিতে হয়। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেই বৎসরে ৺শারদীয় পূজার বন্ধে বাড়ি গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ জ্বর ও উদরাময় রোগে মরণাপন্ন হইয়াছেন।

সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে জ্যেষ্ঠতাত আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। রজনীবাবুর পিতা পূর্বাবধিই নানা রোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠতাত আরোগ্য লাভ করিবার অল্পদিন পরেই গুরুপ্রসাদের জ্বর হইল এবং সেই জ্বরেই ১২৯২ সালে (১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে) তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রজনীকান্ত তখন সিটি কলেজে বি-এ পড়িতেছিলেন। যখন সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে গুরুপ্রসাদকে বাহিরে লইয়া গেল, তখন গোবিন্দনাথ বলিয়া উঠিলেন—'কি! গুরু গেল? আমার বাল্যসখা গেল? আমার চিরজীবনের সাথি গেল? আমার অমন ভাই গেল? তবে আর আমি বাঁচিব না।'

তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। গোবিন্দনাথ সেই বাড়িতেই শয্যা গ্রহণ করিলেন, সে শয্যা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। গুরুপ্রসাদের স্বর্গারোহণের কয়েকদিন পরেই তিনিও পরলোকগমন করিলেন।

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে রজনীকান্তের এই দুই মহাগুরু-নিপাত হইয়াছিল। যে দুই জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সেন-পরিবার আলোকিত হইতেছিল, তাহা চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল। তখন সেন-পরিবারের মধ্যে রহিলেন গোবিন্দনাথের কনিষ্ঠ পুত্র উমাশংকর আর গুরুপ্রসাদের একুশ বৎসর বয়স্ক পুত্র রজনীকান্ত।

রজনীকান্ত তখনও ছাত্র, তাই সংসারের সমস্ত গুরুভার উমাশংকরের উপর পড়িল। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের তুলনায় বিষয়-সম্পত্তির আয় অতি সামান্যই ছিল। সেই সামান্য আয়ে তিনি সংসারের সমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া রজনীকান্তকে কলেজে পড়াইতে লাগিলেন।

বি-এ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে রজনীকান্ত হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। উমাশংকর ভ্রাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার যত্নে ও সুচিকিৎসায় কবি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত উত্থানশক্তিহীন হইয়া রহিলেন। তবুও পরীক্ষার সময়ে সবল ও সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন, এই আশায় তিনি পরীক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

তিনি বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যে, সংস্কৃতে ও দর্শনে অনার্স লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে অনার্স ছাড়িয়া দিতে হয়। এই সময়ে তিনি উমাশংকরকে একদিন বলিলেন—'অনার্সের প্রয়োজন নাই।

ইংরাজি যে-রকম তৈয়ারি আছে, তাহাতেই চলিবে, কিন্তু দর্শনের এখনো যথেষ্ট বাকি আছে, তাহার কী করি? আমার তো উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই।' উমাশংকর বলিলেন, 'এক কাজ করো— আমি বই পড়িয়া যাই, তুমি শোনো।' এ স্থলে বলা আবশ্যক যে উমাশংকর এফ-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

নিজ স্মৃতিশক্তির উপর রজনীকান্তের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনমাস ধরিয়া এই ভাবে সমস্ত পাঠ্যবিষয় উমাশংকরের মুখে শুনিয়া গেলেন। পরীক্ষা আসিল, তখনও তিনি সম্পূর্ণ সবল হন নাই, কোনও রকমে পরীক্ষা দিয়া বাড়ি ফিরিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল— তিনি অকৃতকার্য হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নম্বর আনাইয়া দেখা গেল,— তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃতে পাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিন নম্বরের জন্য দর্শনশাস্ত্রে ফেল হইয়াছেন। যাহা হউক, আর এক বৎসর পড়িয়া ১২৯৫ সালে (১৮৮৯ খ্রী) তিনি সিটি কলেজ হইতেই বি-এ পাশ করেন।

সংসারের অবস্থা বুঝিয়া রজনীকান্ত অর্থকরী বিদ্যায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার আয় যৎসামান্য। তিনি বি-এল পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। যখনই কলেজের ছুটিতে ভাঙাবাড়ি আসিতেন, তখনই তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী প্রাচীনগণের সহিত এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেন। সুপ্রাচীন পুরাণ, মহা-নির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া, এবং রুসো প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের মত তুলিয়া নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তিনি স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তীক্ষ্ণধী রজনীকান্তের যুক্তিতে প্রতিবাদীগণের কূট তর্ক ভাসিয়া যাইত এবং তাঁহার যুক্তির সারবত্তাই বিরোধীদিগকে স্বীকার করিতে হইত। শেষে তিনি তাঁহাদিগেরই সহায়তায় গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রথমত রজনীকান্ত গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে সকলের অমত দেখিয়া, পাবনা অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-সম্মিলনীর সভ্য হইয়া তিনি গ্রামের গৃহে গৃহে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য যত্ন করেন। এই গৃহশিক্ষা-প্রথা হইতে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রচলনকার্যে তাঁহাকে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমত গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর মত সংগ্রহ করিতে

তাঁহাকে বহু যুক্তি ও প্রমাণ প্রযোগ এবং তর্কবিতর্ক করিতে হইয়াছে। তাহার পর বহু পরিশ্রমে যদি-বা তাঁহাদের অনুমতি পাইলেন, তখন ছাত্রীদের লইয়া বিপদে পড়িলেন—তাঁহারা সহজে পাঠের আবশ্যকতা বুঝিতে চাহেন না। তখন তাঁহাদের নিকট আবার নূতন করিয়া যুক্তি, তর্ক ও নূতন নূতন প্রলোভন দেখাইবার প্রযোজন হইয়া পড়িল। যখন অভিভাবক ও ছাত্রীদের মত হইল, তখন আবার দুইটি নূতন সমস্যা উপস্থিত—পুস্তক কোথায় পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষাই বা কে দিবেন? অধিকাংশ স্থলে এই উভয় সমস্যার সমাধান রজনীকান্তকেই করিতে হইত। তিনিই পুথি জোগাইতেন এবং শিক্ষকতাও করিতেন। কচিৎ কোনও পরিবারের কর্তা বা গৃহিণী এই বিষয়ে রজনীকান্তকে সাহায্য করিতেন। বৎসরাধিক কাল পরিশ্রমের পর যখন ছাত্রীগণের পরীক্ষা গৃহীত হইল, উত্তীর্ণা বালিকা ও বধূগণের নাম কার্যবিবরণে প্রকাশিত হইল এবং তাঁহারা গুণানুসারে পুরস্কৃত হইলেন, তখন হইতে আর রজনীকান্তকে ছাত্রী-সংগ্রহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। রজনীকান্তের পত্নী উপর্যুপরি তিন বৎসর এই সকল পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আর রজনীকান্ত-প্রবর্তিত স্ত্রীশিক্ষার সর্বোত্তম ফল—তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত। ইনি সাহিত্যজগতে সুপরিচিত, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রজনীকান্ত বি-এল পরীক্ষা দিবার কিছু পূর্বে—১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসে—পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ হইতে কুঞ্জবিহারী দে, বি-এল, মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'আশালতা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে রজনীকান্তের 'আশা' নামে একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। ইহাই কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা। তাই সমগ্র কবিতাটি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

আশা

১

এখনো বল গো একবার।
নরকের ইতিহাস,
দুষ্কৃতির চিরদাস,
মলিন পঙ্কিল এই জীবন আমার—
আমারও কি আশা আছে বল একবার।

২

এই শেষ, আর নয়,—
বাঁধিয়াছি এ হৃদয়,
প্রতিজ্ঞা, পাপের পানে চাহিব না আর,
করিব না বলে, পাপ করেছি আবার।

৩

বুকের ভিতর সদা,
কে যেন কহিত কথা,
বলেছিল বহুদিন, বলে নাকো আর,
বলে বলে থেমে গেছে, ছিঁড়ে গেছে তার।

৪

নিত্য 'আজ' 'কাল' বলি,
বসন্ত গিয়াছে চলি,
কালো মেঘ ঘিরিয়াছে করেছে আঁধার,[১]

৫

সম্বল-বিহীন পান্থ,
পাপ-পথে পরিশ্রান্ত,—
পড়ে আছি পথপ্রান্তে, অবশ, অসাড়,
মুছাইতে নাহি কেহ অশ্রুবারি-ধার।

৬

পথ বয়ে যায় যারা,
উপহাস করে তারা,
সবাই আমায় কেন করে গো ধিক্কার,
নির্দয় কঠিন মরু হয়েছে সংসার।

৭

পশ্চাতে অতীতের স্মৃতি,
সম্মুখে কেবল ভীতি,
চারিদিক হতে যেন উঠে হাহাকার।
আমারও কি আশা আছে? বল একবার।

[১] ইহার পরের ছত্রটি পাওয়া যায় নাই। 'আশা'র প্রথম সংখ্যাতেও এই ছত্রটি মুদ্রিত হয় নাই।

৯

কর্মজীবন

১২৯৭ সালে (১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে) বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রজনীকান্ত রাজশাহিতে ওকালতি আরম্ভ করেন। যেখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত এক সময়ে সর্বপ্রধান উকিল ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠতাতপুত্রেরাও ওকালতিতে এককালে পসার-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেইখানে তিনিও অল্পদিনের মধ্যে কতকটা পসার করিয়া লইলেন।

ওকালতি আরম্ভ করিয়া তিনি যেন জীবনে স্ফূর্তি পাইলেন। রাজশাহির বাসায় তাহার দিনগুলি আমোদপ্রমোদে কাটিয়া যাইতে লাগিল। সংগীতের স্রোতে বাড়ির ভাবনা পর্যন্তও ভাসিয়া গেল। তখন ভাঙাবাড়ির সমস্ত ভার উমাশংকরের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি রজনীকান্তের নিকট কিছু সাহায্যও চাহিতেন না। রজনীকান্ত যাহা কিছু উপার্জন করিতেন, বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদপ্রমোদে এবং লোক লৌকিকতায় ব্যয় করিতেন।

এই সময় রাজশাহিতে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ডাক্তার অক্ষয়চন্দ্র ভাদুড়ী প্রভৃতির চেষ্টায় নাট্যামোদের তরঙ্গ বহিতে থাকে। মহাকবি কালিদাস-প্রণীত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটক অভিনয়ের জন্য স্থির হয়। নাটকোক্ত নটীর গানটি কিরূপ সুরে গীত হইলে শ্রুতিমধুর হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য মৈত্রেয় মহাশয় রাজশাহির তৎকালীন সুগায়কগণকে আহ্বান করেন। সকলেই নিজ নিজ সুরে নটীর গানটি গাহিলেন, কিন্তু কাহারো সুর মৈত্রেয় মহাশয়ের মনের মতো হইল না। অবশেষে রজনীবাবুর কণ্ঠে গানটি শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'কালিদাস জীবিত থাকিয়া যদি এই সভায় উপস্থিত হইতেন এবং রজনীকান্তের কণ্ঠে এই গানটি শুনিতেন, তবে তিনিও আমার সহিত এই সুরই পছন্দ করিতেন।'

রজনীকান্তের অভিনয়ক্ষমতার কথা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে। 'রাজশাহি-থিয়েটারে'ও তিনি অভিনয় করিতেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে তিনি 'রাজা'র ভূমিকা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এই অভিনয়ের কথা তিনি হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজশাহিতে এতদিন তাঁহারা ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বা পিতা কেহই বাটী নির্মাণ করিয়া যান নাই। রজনীকান্ত

নিজে একটি বাড়ি তৈয়ার করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং উমাশংকরের মত লইয়া বড়ো কুঠির (মেসার্স ওয়াটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানির রেশমের কারখানা) খানিকটা জমি পত্তনি লইলেন। প্রথমত এই জমির উপরে কয়েকখানি টিনের ঘর তৈয়ার হইয়াছিল ; পরে টিনের ঘর ভাঙিয়া পাকা কোঠা তৈয়ার হয়। তখন তাঁহার পসার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আনুমানিক ২০০ টাকা মাসিক উপার্জন করেন।

কিন্তু ভগবান তাঁহার উন্নতির পথে কাঁটা দিলেন। হঠাৎ বাড়ি হইতে সংবাদ আসিল যে উমাশংকরের গলায় ঘা হইয়াছে। ইহার কয়েক দিন পরেই উমাশংকর টেলিগ্রাম করিলেন : '**No improvement, starting Rajsahi for treatment**'। উমাশংকর রাজশাহি আসিলেন ; কিন্তু স্থানীয় চিকিৎসকগণ কিছুই করিতে পারিলেন না। কাজেই রজনীকান্ত তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পটলডাঙায় বাসা লওয়া হইল। উমাশংকরের বাল্যবন্ধু রাজশাহির অন্তর্গত পুটিয়া নিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচি মহাশয় রোগীকে পরীক্ষা করিয়া রজনীকান্তকে বলিলেন, 'ভাই, তোমার দাদার ক্যান্সার হইয়াছে, আর নিস্তার নাই।'

ফলেও তাহাই হইল। মাসখানেক পরে একদিন হঠাৎ উমাশংকরের গলা দিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল। সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কলিকাতাতেই ১৩০৪ সালের পৌষ মাসে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার এক পুত্র, দুই কন্যা ও বিধবা পত্নী বর্তমান। রজনীবাবুর রোজনামচা হইতে জানা যায় যে উমাশংকরের চিকিৎসার জন্য পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। রজনীকান্ত ১৩১৬ সালের ১৭ ফাল্গুন তারিখে লিখিয়াছেন : 'কলিকাতায় এসে ওকেন্‌লি সাহেব ডাক্তারকে দেখানো মাত্রই সে বললে, "ডবল ক্যান্সার"। আর আমার প্রাণ চম্‌কে উঠল, সর্বনাশ! দাদার জন্য পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে তাঁকে বাঁচাতে পারি নাই।'

ভ্রাতার মৃত্যুর পর বাড়ি ও ওকালতি দুই রক্ষার ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি উমাশংকরের নাবালক পুত্র গিরিজানাথকে পড়াইবার জন্য রাজশাহিতে আনিলেন।

১০

সংগীতচর্চা ও সাহিত্যসেবা

প্রথম প্রথম রজনীকান্ত কবিতা লিখিয়া প্রকাশ করিতেন না এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে কেহ অনুরোধ করিলে বলিতেন : 'Love is blind'। বন্ধুবর্গের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে তাঁহার 'আশা' নামক কবিতা 'আশালতা' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের উৎসাহে রাজশাহি হইতে 'উৎসাহ' নামক মাসিকপত্র বাহির হইল। প্রথম বৎসরের 'উৎসাহে' রজনীকান্তের নিম্নলিখিত কবিতা কয়টি প্রকাশিত হয়।

'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়' – বৈশাখ
'তিনটি কথা' – জ্যৈষ্ঠ
'রাজা ও প্রজা' (গাথা) - আষাঢ়
'তোমরা ও আমরা' – আশ্বিন
'যমুনা-বক্ষে' - অগ্রহায়ণ

পৌষ মাসের 'উৎসাহে' 'জুনিয়ার উকিল' নামক একটি কবিতা আছে। কবিতার শেষে নাম আছে 'জনৈক জুনিয়ার উকিল'। লেখাটি পড়িয়া মনে হয় উহা রজনীকান্তের রচনা।

ঠিক কোন সময় হইতে রজনীকান্ত কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা বলা যায় না। ছেলেবেলায় তিনি প্রায়ই পয়ার লিখিতেন, আর মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিতেন। কলেজে পড়িবার সময় বিবাহের প্রীতি-উপহার প্রভৃতি লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। আর সভা-সমিতির অধিবেশনে উদ্বোধন-সংগীত এবং বিদায়-সংগীত লেখাটাও তাঁহার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর রাজশাহিতে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় তাঁহার রচিত যে উদ্বোধন-সংগীতটি গীত হইয়াছিল, তাহা হইতে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল :

নিষ্প্রভ কেন চন্দ্র তপন,
স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন,
ধীর তটিনী মন্দগমন,
স্তব্ধ সকল পাখি।

এমন গান তিনি অনেক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেগুলি প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার একখানি চিরপরিচিত আবেগপূর্ণ গান রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়-প্রদত্ত মনোজ্ঞ বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি :

'এক রবিবারে রাজশাহির লাইব্রেরিতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, "রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে? একটা গান বাঁধিয়া লও না।" রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, "এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?" অক্ষয় বলিল, "রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে"। রজনী অক্ষয়কে বড়ো ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্বজনপরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা,
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।

'এমন সুন্দর গান রজনীর কলম দিয়া খুব কমই বাহির হইয়াছে। যেমন ভাব, তেমনই ভাষা।'

একবার রাজশাহি অ্যাকাডেমির ছাত্রগণ-মধ্যে পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে, রাজশাহি বিভাগের তৎকালীন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর প্রথেরো সাহেবের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, সেই সভার প্রারম্ভে আমাদের কবি-রচিত যে সংগীতটি গীত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার কয়েক ছত্রে নিম্নে তুলিয়া দিলাম :

নীল নভতলে চন্দ্র তারা জ্বলে,
হাসিছে ফুলরানী ফুলবনে;
হরষ-চঞ্চল, সমীর সুশীতল,
কহিছে শুভকথা জনে জনে।

'উৎসাহ' পত্রের প্রবর্তক ও সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সাহা ১৩০৭ সালের ২৯ ফাল্গুন বসন্তরোগে অকালে কালকবলে পতিত হইলে, রজনীকান্ত তাঁহার শোকে ১৩০৭

সালের চৈত্র মাসের 'উৎসাহে' 'অশ্রু' নামক কবিতায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। এই অশ্রু দেখিয়া আমাদেরও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

অশ্রু

ফুল যে ঝরিয়া পড়ে— কথা নাহি মুখে।
তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ বিনাশ,
তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস,
রয়ে গেল কিনা এই মর মর্ত্য বুকে,
সে কি তা দেখিতে আসে? হেসে ঝরে যায়।
বনদেবী তার তরে নীরব সন্ধ্যায়,
প্রশান্ত প্রভাতে বসি একান্তে নির্জনে
নির্মল স্মৃতির উৎস— নয়নের নীর
ফেলে যায় প্রতিদিন পবিত্র শিশির।
অতি জীর্ণ পত্রাবৃত সমাধি শিয়রে,
ভ্রমর ফিরিয়া যায় নিরাশ হইয়া,
শেষ মধুগন্ধটুকু কুড়ায়ে যতনে,
ব্যথিত সমীর ফিরে আকুল ক্রন্দনে।
লুপ্তপ্রায় জনশ্রুতি সমাধির পাশে।
কভু যদি কোনো পান্থ পথ ভুলে আসে,
কহে তার কানে কানে বিষাদ স্পন্দনে,—
'তোমরা এলে না আগে দেখিলে না তারে,
ছোট ফুল— ঝরে গেল সৌরভের ভরে।'

সুরেশচন্দ্রের শোকসভায় গীত হইবার জন্য তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অপূর্ব—

অফুটন্ত মন্দার মুকুল—
সে কেন ফুটিবে হেথা?— বিধাতার ভুল।
কোন্ অভিশাপভরে, ধরায় পড়িল ঝ'রে।
শচীর কুন্তলরূপী বিলাসের ফুল। —ইত্যাদি

কবি প্রথমে যাহা কিছু লিখিতেন, তাহাই গম্ভীর ভাবের হইত। রাজশাহিতে ওকালতি আরম্ভ করিবার পর, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয়

হয়। আবগারি বিভাগের পরিদর্শকরূপে ১৩০১ কি ১৩০২ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজশাহি গমন করেন এবং তথায় এক সভায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত মুগ্ধ হন। তাহার পর হইতেই তিনি হাসির গান লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩০২ সালের কার্তিক মাসের 'সাধনা'য় দ্বিজেন্দ্রবাবুর 'আমরা ও তোমবা' নামক একটি হাস্যরসাত্মক কবিতা বাহির হয়। বজনীবাবু ১৩০৪ সালেব আশ্বিন মাসেব 'উৎসাহ' পত্রিকায় 'তোমরা ও আমরা' নামক একটি কবিতা লিখিয়া উহার পালটা জবাব দিয়াছিলেন। নিম্নে উভয় কবিতাব কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

'আমবা ও তোমরা' : দ্বিজেন্দ্রলাল

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই গো,
    আর, তোমবা বসিয়া খাও,
আমরা দু'পরে আপিসে লিখিয়া মরি গো,
    আব, তোমবা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই পড়ে লড়ি গো,
তোমরা গহনাপত্র ও টাকাকড়ি গো
অমায়িক ভাবে গুছায়ে, পালকি চড়ি গো,
    ধীরে চম্পট দাও।
... ...
আমবা বেচারি— ব্যবসা ও চাকবি কবি গো—
    আর, তোমবা কর গো আয়েস ;
আমরা সাহেবমুনিব-বকুনি খাই গো,
    আর তোমরা খাও গো— পায়েস,
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত গো
    কার্য করিয়া না পুরাই মনোবথ গো,
অবহেলে চলি যাও নাড়ি দিয়া নথ গো,
    অথবা মারিতে ধাও।।
আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে গো—
    রোজ জ্বালাতন হয়ে মরি ;
তোমরা— সে ভোগ ভুগিতে হয় না— থাক গো
    খাসা, বেশবিন্যাস করি ;

আমরা দু-টাকা জোড়ার কাপড় পরি গো—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি গো—
'বোম্বাই' 'বারাণসী' বছর-বছরই গো—
তবু মন উঠে না'ও।

'তোমরা ও আমরা' রজনীকান্ত

আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও,
আমরা দু-বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও,
আজ এ বিপদ, কাল ও বিপদ করি গো,
হাতের দুখানা গহনা ও টাকাকড়ি গো
'না দিলে পরম প্রমাদে প্রেয়সি, পড়ি গো'
বলি, লয়ে চম্পট দাও।
আমরা মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো,
আর তোমাদের চাই গদি,
আমাদের শাকপাতাটা হলেই চলে গো,
আর তোমরা বোলাও দধি!
তথাপি যদি বা কোনো কাজে পাও ত্রুটি গো,
স্বাস্থ্যে হালুয়া-লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো,
না হলে আ মরি! কর কি স্রূভ্রূকুটি গো,
কিংবা চড়চাপড়টা দাও।
আমরা একটি চুলের বোঝার ভরে গো,
সদা জ্বালাতন হয়ে মরি,
তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হয় না, থাক গো
সদা অ্যালবার্ট টেরি করি।
আমরা দুখানা শাঁখা ও লোহার খাড়ু গো
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয় না কারু গো,

তোমাদের চটি, চুরুট ও চেন চারু গো,
তবু খুঁতখুঁতি মেটে নাও।

এই স্থলে বলা ভালো যে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা ও তোমরা' প্রকাশিত হইবার পূর্বে ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের 'সাধনা'য় কবীন্দ্র রবীন্দ্রের 'তোমরা এবং আমরা' নামে একটি অপূর্ব গীতিকবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেটি সম্পূর্ণ করুণরসাত্মক। তাহাতে ঠাট্টা বা বিদ্রূপের লেশমাত্র নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই 'সাধনা'তেই হাস্য-রসে করুণরসের উদ্ভব দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতেও কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ তিনটি কবিতার উদ্ধৃত অংশসমূহ পাঠ করিয়া এবং তুলনায় সমালোচনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করুন।—

'তোমরা ও আমরা' রবীন্দ্রনাথ

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণীমাঝে,
কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

. .

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে।
মোহন মধুর মন্ত্র জানি নে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি—
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে।

এই হাসির গান লেখা আরম্ভ করা অবধি তিনি ক্রমাগতই উহা লিখিতে থাকেন, ক্রমে গভীরভাবাত্মক গান লিখিবার শক্তি তাঁহার নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

উত্তরকালে তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দুই দিক বজায় রাখিয়া মাতৃবাণীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

ওকালতিতে রজনীকান্তের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। যাহা-কিছু উপায় করিতেন, তাহাতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ হইত বটে, কিন্তু প্রাণের টানে তিনি কোনোদিনও কাছারি যাইতেন না। কাশীধাম হইতে তিনি ১৩১৭ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ তারিখে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়কে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ওকালতি ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা জানাইতেছি :

'কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লজ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালোবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম, আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদরান্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য অর্থ দেয় নাই '

না গেলে উপায় নাই, তাই রজনীকান্তকে কাছারি যাইতে হইত। যখনই অবসর পাইতেন, তখনই তিনি বন্ধুবান্ধব-পরিবেষ্টিত হইয়া সংগীতের নির্মল আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। রাজশাহিতে তাঁহার গৃহখানি সংগীতে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়া থাকিত। কবিতা বা গান রচনায় তিনি অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। কখনো ভাবিয়া লিখিতে তাহাকে দেখি নাই। কাগজ-পেন্সিল লইয়া অনবরত দ্রুতগতিতে লিখিয়া যাইতেন। বিষয় নির্বাচন করিয়া দিলে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই নির্বাচিত বিষয়ে কবিতা লিখিয়া শেষ করিতেন। মনে মনে কবিতা রচনা করিয়া অনর্গল বলিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

যখন ওকালতিতে তাঁহার পসার একরকম জমিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। রাজশাহির প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ সমবেত চেষ্টা করিয়াও বালককে বাঁচাইতে পারিলেন না। Capillary bronchitis-এ তাহার মৃত্যু হইল। কবি হৃদয়ে কঠিন আঘাত পাইলেন। বুক দমিল, তবু মুখ ফুটিল না। ভগবদ্‌বিশ্বাসী কবি নীরবে এই নিদারুণ শোক কেবল যে জয় করিলেন, তাহা নহে; পুত্রশোকদগ্ধ-হৃদয়ে তিনি কি অপূর্ব সান্ত্বনা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহার তৎকাল-রচিত নিম্নলিখিত গানখানি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়,—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু-নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা-হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া,
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি তো,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত,
আমারি ব'লে কেন ভ্রান্তি হল হেন,
ভাঙো এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

পুত্রের মৃত্যুর একদিন পরে এই গান রচিত হইয়াছিল। ইহা গাহিতে গাহিতে অনেকবার রজনীকান্তকে কাঁদিতে দেখিয়াছি।

সাধারণ দশজনের মতো নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার না দিয়া, তিনি পুত্রশোক ভুলিবার জন্য আবার সংসারে মন দিলেন। ইহার কিছু পরে তিনি নাটোর ও নওগাঁওতে কিছু দিনের জন্য অস্থায়ী মুনসেফ নিযুক্ত হন।

রজনীকান্তের গান গাহিবারও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ক্রমাগত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা এক সঙ্গে গান গাহিয়াও কখনো তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তন্ময় হইয়া যখন তিনি স্বরচিত গান গাহিতেন, তখন তিনি আহারনিদ্রা জগৎসংসার সবই ভুলিয়া যাইতেন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন।

পরিচিত বা অপরিচিত যিনিই তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতেন। সংসারে তাঁহার সাহায্য করিবার কেহ ছিল না। তাহার উপর ওকালতিতে ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকায় তিনি সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমন-কি, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের পরিত্যক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জমিদারির বন্দোবস্ত করিতে মহলে গিয়াও তিনি কেবল গানবাজনায় সময় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিতেন— এমনই তাঁহার গানের নেশা ছিল।

মক্কেলরা তাঁহার দ্বারা সময় সময় কাজ পাইত না। প্রত্যেক প্রীতিভোজে, পারিবারিক বৈঠকে ও সাধারণ সম্মিলনে রজনীবাবুকে গান রচনা করিতে ও

গাহিতে হইত। ব্রজে যেমন কানু ছাড়া গীত নাই, তেমনি রজনীকান্ত ছাড়া রাজশাহির আনন্দোৎসব পূর্ণ হইত না। তিনি কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন না। প্রথমে নিজের পুস্তক ছাপাইতে রাজি হন নাই, কিন্তু শেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নির্বন্ধাতিশয়ে উহা ছাপাইতে বাধ্য হন। কান্তকবির প্রথম গ্রন্থ 'বাণী'র প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৩১৯ সালের কার্তিক মাসের 'মানসী'তে যে মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে তুলিয়া দিবাব লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :

'কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বজনীকান্ত রচনা-প্রতিভাবিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সংগীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে, অন্যকে শুনাইবার পূর্বে আমাকে শুনানো হইয়াছে ; মজলিশে সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে। তথাপি সংগীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সবলতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনাপ্রতিভা ছিল, কিন্তু আত্মপ্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্যজীবনেব একটি জ্ঞাতব্য কথা।

'সেবার বড়োদিনেব ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্য একখানি ডিঙি-নৌকায় উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে তীর হইতে রজনী ডাকিলেন— "দাদা! ঠাঁই আছে?"

'তাঁহার স্বভাব এইরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্পকাল পূর্বে "সোনার তরী" বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; হয়তো আশা ছিল, আমি বলিয়া উঠিব—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই— ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

'আমি বলিলাম, "ভয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে পারো, আমি ধানের ব্যবসায় করি না।" এইরূপে দুইজনে কলিকাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বোলপুরে যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকটে উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের ইতস্তত দূর হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্ত বলিলেন, "সমাজপতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না।"

'মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালোচনার ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল, তাহার এইরূপ অভ্রান্ত পরিচয় পাইয়া প্রিয়বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া, নূতন কবির পরিচয় না দিয়া গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সংগীতসুধা-পানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না, সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ইহার পর অ্যালবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের পরে রজনীর সংগীত যখন দশজনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্তত কাটিয়া গিয়া আমার ইতস্ততের আরম্ভ হইল।

'আমার ইতস্ততের যথেষ্ট কারণ ছিল। আমাকে পুস্তকের ও পুস্তকে মুদ্রিতব্য প্রত্যেক সংগীতের নামকরণ করিতে হইবে, গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করিযা, কোন্ পর্যায়ে কোন্ শ্রেণী স্থান পাইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতে হইবে এবং গ্রন্থের ভূমিকাও লিখিতে হইবে—এইসকল শর্তে রজনীকান্ত গ্রন্থপ্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাকে বিপন্ন করিযা তুলিয়াছিলেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সংগত হইযাছে কি না, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। তবে আমার পক্ষে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাম হইল "বাণী"। সংগীতগুলিরও একরূপ নামকরণ হইযা গেল। শ্রেণীবিভাগও হইল, তাহারও নামকরণ হইল—"আলাপে, বিলাপে, প্রলাপে"। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে রজনীকান্তের ত্রিধাবিভক্ত "বাণী" প্রকাশিত হইল।'

ইহার পরবৎসরে কবি আবার এক শোক পাইলেন। তখন তিনি সস্ত্রীক ভাঙাবাড়িতে কোনো কার্যোপলক্ষে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রথমা কন্যা শতদলবাসিনী ও দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র পীড়িত হইয়া পড়ে। জ্ঞানেন্দ্র রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু শতদলবাসিনী বাপমায়ের বুকে শেল হানিয়া অকালে চলিয়া গেল। শতদলের মৃত্যুর সময় কবির বাল্যসুহৃদ্ ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কবির গৃহে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রজনীকান্ত তাঁহাকে লইয়া বাহির-বাটীতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যাঁহার দান তিনিই লইয়াছেন'। তাহার পর হার্মোনিয়াম লইয়া সেই গান—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।

যে-গান তাঁহার তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া বাহিব হইয়াছিল— সেই গানটি করুণ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বাড়ির ভিতর যাইবাব জন্য অনেকে অনুবোধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত কবিলেন না। আনমনে বিভোর হইযা গানটি গাহিযা যাইতে লাগিলেন। শেষে অন্তঃপুরে কান্নাব বোল বর্ধিত হইলে, বজনীকান্তেব চৈতন্য হইল। তখন তিনি তাঁহার কোনও আত্মীযকে বলিযাছিলেন, 'শতদলেব বিযেব জন্য যে-সমস্ত গহনা ও কাপডচোপড কেনা হইযাছে, সব ওব সঙ্গে দাও।'

তখনও জ্ঞানেন্দ্র মৃত্যুশয্যায শাযিত। বজনীকান্ত সতীশবাবুকে বলিলেন, 'চল সতীশ, ভিতবে যাই। একটিকে ভগবান গ্রহণ কবিযাছেন, এটিকে কি কবেন দেখা যাক।' তাঁহাবা বোগীব শয্যাপার্শ্বে গমন কবিযা দেখিলেন, তখন জ্ঞানেন্দ্র সংজ্ঞাহীন। গভীব বাত্রিতে জ্ঞানেন্দ্র 'শতদল' 'শতদল' বলিযা চিৎকার করিযা উঠিল। তখন তাহাব ঘোব বিকাব। কিন্তু ভগবানেব আশীর্বাদে জ্ঞানেন্দ্র সে-যাত্রা আরোগ্য লাভ কবিল।

১৩১২ সালেব ভাদ্র মাসে কবিব দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কল্যাণী' প্রকাশিত হইল। বজনীকান্ত এই গ্রন্থখানি তাঁহাব বাল্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র লাহিড়ী মহাশযেব নামে উৎসর্গ কবেন। সংগীতপ্রিয ব্যক্তিগণের অনুরোধে কবি 'কল্যাণী'ব সংগীতগুলিতে বাগরাগিণী ও তাল সংযুক্ত কবিযা দেন। এই বৎসরের মাঘ মাসে 'বাণী'ব দ্বিতীয সংস্কবণও প্রকাশিত হইযাছিল। প্রথম সংস্করণে গানগুলিতে রাগিণী ও তাল দেওযা হয নাই। দ্বিতীয সংস্করণে কবি সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিযাছিলেন এবং এই দ্বিতীয সংস্কবণে অনেক নূতন গানও গ্রন্থমধ্যে সংযুক্ত কবা হয়।

জনসাধাবণে আগ্রহ কবিযা উহার অধিকাংশ সংখ্যা ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তখনও সাহিত্যজগতে বিশেষ পরিচিত হন নাই। কবির ললাটে যশেব টীকা পরাইযা দিবার জন্য বঙ্গভারতী শুভক্ষণেব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইহারই পরে কবির একখানি গানে বাংলার নগর পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তিনম্র হৃদয়ে কবিকে শ্রদ্ধাচন্দনে চর্চিত করিয়া কৃতার্থ হইযাছিল।

১১

স্বদেশী আন্দোলন

যখন দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল যে, সমগ্র বঙ্গদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করা হইবে, তখন বাঙালির চিত্তে একটা গভীর বিষাদেব চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। একই ভাষাভাষী, একই মাতার সন্তানকে বিচ্ছিন্ন কবিবার সংকল্পে বাধা দিবার নিমিত্ত সমগ্র বঙ্গদেশ জাতিবর্ণনির্বিশেষে বদ্ধপবিকর হইল। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির কোলে যাঁহারা একত্র মানুষ হইযাছেন, যাঁহাবা একসঙ্গে হাসিযাছেন কাঁদিযাছেন, আজ তাঁহাদিগকে বলপূর্বক স্বতন্ত্র ও পৃথক করিবাব জন্য রাজপুরুষেরা যে চেষ্টা কবিতে লাগিলেন, সেই চেষ্টার মূলে তাঁহাদের যতই শুভ ইচ্ছা বর্তমান থাকুক না কেন, তবুও সমগ্র বাঙালিজাতি তাহাব প্রতিবাদ কবিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না।

লর্ড কার্জন বাহাদুব তখন ভাবতেব ভাগ্যবিধাতা। বাঙালিবা সকলে এক-যোগে নানাপ্রকার আলোচনা ও আন্দোলন কবিযা বঙ্গভঙ্গ রহিত কবিবার জন্য গভর্নমেণ্টেব নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহাদেব সে আকুল আবেদনে কর্ণপাত কবিলেন না— বাঙালি তাঁহার স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার বশে এই ব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইযাছেন। কর্মী ইংবাজ ভাব অপেক্ষা কর্মের শ্রেষ্ঠতাই চিরদিন স্বীকার করেন, ভাবের উৎপত্তি যে অন্তরেব অন্তরতম প্রদেশে, প্রাণের স্পন্দন যে ভাবের ভিতব দিয়াই প্রকাশ পায়, তাহা সহজে তাঁহাদের ধারণায় আসে না। তাঁহারা মনে করিলেন, শাসনকার্যকে সুকর করিবার জন্য তাঁহারা যে সংকল্প কবিয়াছেন, বাঙালি মাত্র ভাবের আতিশয্যে তাহাতে বাধা দিয়া দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছে। তাই রাজপুরুষেরা বাঙালির এই ভাবাধিক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য ১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন (১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর) বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।[১]

পূর্বে প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহি— এই পাঁচটি বিভাগ লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত ছিল। বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পর, প্রেসিডেন্সি

১ সুখের বিষয়, গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর (২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮) যেদিন দিল্লিতে আমাদের সর্বজনপ্রিয় ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের শুভ অভিষেকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেদিন তিনি স্বয়ং দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশকে পূর্বের ন্যায় এক করিয়া দিয়া সমগ্র বাঙালিজাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ও বর্ধমান, এই দুই বিভাগ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ এবং ঢাকা, রাজশাহি ও চট্টগ্রাম, এই তিন বিভাগ লইয়া পূর্ববঙ্গ গঠিত হইল। বিহার প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইল এবং আসাম প্রদেশকে পূর্ববঙ্গেব সহিত সংযুক্ত করা হইল। এই বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র দুইজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন এবং বাজ্যশাসনেবও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল।

ফলত রাজপুরুষগণ এই বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাদ্বাবা দেশময় একটা ভাবের বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। বাঙালিব প্রাণ ভাবেব উন্মাদনায় অধীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই ঘোষণাব কিঞ্চিদধিক দুই মাস পূর্বে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ আগস্ট তাবিখে কলিকাতাব টাউন হলে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদের জন্য একটি বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিদেশী পণ্য বর্জন করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। সমগ্র বাঙালি একযোগে প্রতিজ্ঞা কবে, 'যত দিন না বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়, তত দিন আমরা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার তো দূরেব কথা, স্পর্শও করিব না।' বঙ্গবিভাগ ঘোষণাব পর বাঙালিব এই বিদেশী পণ্য বজন-প্রস্তাব রাজ-পুরুষগণের মধ্যে একটা উত্তেজনাব সৃষ্টি করিল।

যাহা হউক, বঙ্গভঙ্গের সংবাদে বাংলাব ঘবে ঘরে যেন এক গভীর বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বাংলার সেই দুর্দিনকে (৩০ আশ্বিন) স্মরণীয় করিবার জন্য বঙ্গজননীর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়াবাসী একই ভাষাভাষী সন্তানগণের মধ্যে বহির্বিচ্ছেদের পবিবতে অন্তর্মিলন গাঢ়তর করিবার মানসে আবালবৃদ্ধবনিতা সকল বাঙালিই সেই দিন অবন্ধনব্রত অবলম্বন করিয়া শুদ্ধচিত্ত ও সংযমী হইলেন এবং পবস্পরের মণিবন্ধে রাখি বন্ধন করিয়া প্রাণের টান দৃঢ়তর করিলেন।

শক্তিমান রাজপুরুষগণের বঙ্গবিভাগ-আদেশ রহিত করিবার জন্য বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই যে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিয়াছিল, তাহাই 'স্বদেশী আন্দোলন' বলিয়া প্রখ্যাত। এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশের ও দশের মঙ্গলকামনায় এই কর্মে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন লোকের মন দেশীয় শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইল— যখন দেশের লোক দেশজাত বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি দেশীয় কাপড়ের কল বাঙালির জন্য মোটা কাপড় বয়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মিহি বিলাতি বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত, বিলাসী বাঙালি এই মোটা বস্ত্রের শুভাগমনকে যথোচিত স্বাগত-সম্ভাষণ করিতে পারিল না। দেশের সর্বত্র একটা

বিরাগের স্বর ধ্বনিত হইল— 'মোটা কাপড'। ঠিক এই সময়ে সাবা দেশ মুখরিত করিয়া সুদূর রাজশাহিব পল্লীবাসী কবি রজনীকান্ত মোহমুগ্ধ বাঙালিকে তাহার পবিত্র সংকল্পেব কথা স্মরণ কবাইযা দিযা মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন—

মাযের দেওয়া মোটা কাপড
মাথায তুলে নে বে ভাই,
দীন-দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আব সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোব সঙ্গে, মাযের
অপাব স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোবে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মাযেব ঘবে, তোদেব
সবাব প্রচুব অন্ন নাই,
তবু তাই বেচে, কাচ সাবান মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয রে আমবা মায়েব নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই—
পরেব জিনিস কিনব না, যদি
মায়ের ঘরেণ জিনিস পাই।

এই গানেব সঙ্গে সঙ্গে কবি রজনীকান্তের নাম বাংলার ঘরে ঘরে, বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বাঙালির বহু দিনের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। কবির এই গান অলস, আত্মবিস্মৃত বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল— তাহাকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্য ভালো কবিয়া বুঝাইয়া দিল। প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তানের মতো যেদিন রজনীকান্ত মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের বোঝা— মায়ের অনাবিল স্নেহাশিস-ভরা দান অতি যত্নে বাঙালির মাথার উপর তুলিয়া দিলেন, সেইদিন বাঙালি রজনীকান্তকে আরো ভালো করিয়া চিনিবার সুযোগ পাইল। তাহার মানসনেত্রে কবির সুন্দর জ্যোতির্ময় ছবি প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মোটা সুতার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহের যে নয়নমনোরঞ্জন আলেখ্য তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন, তাহা দেখিয়া বাঙালিহৃদয় ভক্তিবিহ্বল ও পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিল।

কবি তাঁহার রোজনামচায় ১৩১৭ সালের ১৮ বৈশাখ তারিখে লিখিয়াছেন—

'স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড়ো ভালোবাসে। আমি "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে"র কবি ব'লে তারা আমাকে ভালোবাসে।' পুনরায় ২১ বৈশাখ তারিখে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো মহাশয়কে তিনি লিখিয়াছেন— 'আমার মনে পড়ে, যেদিন "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে procession বের করে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সেদিনের কথা মনে করে আমার আজও চক্ষে জল আসে।'

এই গান সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বঙ্গসাহিত্যের অকপট এবং নিষ্ঠাবান সেবক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, উল্লেখযোগ্য বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

'কান্তকবির "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীতসাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল-বাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদুকিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দৈববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতো সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,— নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের অশ্রু— বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" ভিন্ন আর কোনও গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।

'স্বদেশীর সূচনাকালে লোকান্তরিত পশুপতিনাথবাবুর বাড়িতে যেদিন এই গান প্রথম শুনিলাম— সেইদিন সেই মুহূর্তে এই অগ্নিময়ী বাণীর আদেশ শিরোধার্য করিয়াছিলাম।'

এই গান রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। তাই সেই সম্বন্ধে আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম .

'তখন স্বদেশীর বড়ো ধুম। একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি "বসুমতী" আপিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং আমার পরমশ্রদ্ধেয়, রাজশাহির খ্যাতনামা ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অক্ষয়কুমার সরকার

আপিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারোটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসেব ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিযা ধবিযাছে, একটা গান বাঁধিযা দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল হইয়া যাইত। তখনই গান লিখিতে বসিযাছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিযাই সে উঠিযা দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানেব জন্য উৎসুক, সে বলিল— "এই তো গান হইযাছে, চল জলদাব ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক।" এইজন্য তাহাবা সেই বেলা একটাব সময় আসিয়া উপস্থিত। অক্ষযকুমার আমাকে গানের কথা বলিলে— রজনী গানটি বাহিব করিল। আমি বলিলাম "আর কই বজনী?" সে বলিল, 'এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইযা যাইবে।" সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ কবিতে করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুইজনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল, রজনী ও অক্ষয় ৩০।৪০ খানা গানের কাগজ লইয়া চলিযা গেল। তাহার পব তাহাদের দলের অন্যান্য ছেলেবা আসিয়া ক্রমে [ছাপা] কাগজ লইয়া গেল।

'সন্ধ্যার সময আমি সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বাযচৌধুবী মহাশযের বিডন স্ট্রীটের বাড়ির উপরের বাবান্দায় প্রমথবাবু ও আবও কযেকজন বন্ধুর সহিত উপবিষ্ট আছি, এমন সময দূবে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্তী হইল। তখন আমবা শুনিলাম, ছেলেরা গাহিতেছে— "মাযেব দেওযা মোটা কাপড মাথায তুলে নে বে ভাই"। এইটি রজনীকান্তেব সেই গান— যাহা আমি কযেক ঘণ্টা আগে ছাপিযা দিযাছিলাম। গান শুনিযা সকলে ধন্য ধন্য কবিযাছিল, তাহাব পব ঘাটে মাঠে পথে নৌকায় দেশ-বিদেশে কত জনের মুখে শুনিযাছি—

মাযের দেওয়া মোটা কাপড
মাথায় তুলে নে রে ভাই।

এই গান সম্বন্ধে দেশের আরও দুইজন স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবরের উক্তি উদ্ধৃত করিব। বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড
মাথায় তুলে নে রে ভাই।

'এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথম যেদিন আমার কানে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতেই গীতরচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।'

স্বর্গীয় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন—

'১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনো মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।'

বস্তুত কান্তকবি এই একটিমাত্র গানে বাঙালির হৃদয়ে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কবির স্বদেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ যে কেবল এই গানটিতেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। কান্তকবি লোক-দেখানো স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব হইতেই তাঁহার হৃদয় দেশের দুর্দশায় বিচলিত হইয়াছিল। গানের ভিতর দিয়া, কবিতার মধ্য দিয়া, তাহার মর্মভেদী অবরুদ্ধ অশ্রু ভাষায় রূপান্তরিত হইত। সভ্যতা ও সামাজিকতার প্রবীণতমা ধাত্রী, জ্ঞানবিজ্ঞান-জননী ভারতভূমির সন্তানগণ স্বাবলম্বনবিহীন হইয়া পড়িয়াছে— এই দৃশ্যে তাহার তেজস্বী হৃদয় ক্ষুব্ধ ও অধীর হইয়া উঠিত। তাঁহার 'বাণী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই, কিন্তু কবিকল্পনা-প্রসূত 'কাব্যনিকুঞ্জে'—

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে—
জাগ সুমঙ্গলময়ি মা।

বলিয়া তিনি জননীকে জাগাইলেন। তাহার পর তিনি দেশবাসীকে অঙ্গুলি-সঞ্চালনে দেখাইলেন—

ওই সুদূরে সে নীরনিধি—
যার তীরে হের, দুখদিগ্ধ হৃদি,
কাঁদে ঐ সে ভারত, হায় বিধি!
... ..
জননী তুল্য তব কে মর-জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ, 'জয় মা বরদে!'
দীর্ণ বক্ষ হতে, তপ্ত রক্ত তুলি
দেহ পদে, তবে ধন্য গনি!

কবি বুঝিলেন, সে যোগ্যতা দেশবাসী হারাইয়াছে;— তাই নিদারুণ অবসাদে গভীর মর্মবেদনায় কবি গাহিলেন—

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

তবে কি সত্য সত্যই মা আর ধূলিশয্যা হইতে উঠিবেন না ? কবি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন--

ওই হেরো, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্বগগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি ডাকিছে সুপ্তিমগনে ;
নিদ্রালস নয়নে, এখনো রবে কি শয়নে ?
জাগাও বিশ্ব পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

পরে রজনীকান্ত মায়ের 'বোধন' করিলেন--

ঐ অভ্রভেদী ধবলশৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ—
তাহে চরণযুগল রাখ্।
শুভ্র সুষমা চাহি না,— ভীম ভৈরবী রূপে জাগ্।
. . . . .
ধর ভৈরবরাগ, বিশ্ব হয়ে অবাক,
চমকি ফিরিয়া চাক্।
সেই মত্ত তীব্র গান, গরলদিগ্ধ বাণ,
বিঁধিবে অবশ প্রাণ, হবে সুপ্তির অবসান ;
কোটি শৃঙ্গ অধীর রঙ্গে বোধনগীতি গাক ;
নূতন জীবন পাক্ সিন্ধু তটিনী লাখ,
পল্লী, বন, তড়াগ !

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে পাঞ্চজন্যনির্ঘোষের ন্যায় বঙ্গভঙ্গ-জনিত আর্তনাদ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া এই সুদীর্ঘ সুপ্তির অবসান সূচিত করিল। বাঙালি উঠিয়া বসিল ; কিন্তু তখনও তাহার ঘুমঘোর কাটে নাই, সে ভালো করিয়া চাহিয়া নিজের গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারিতেছে না। কান্তকবি তাহা বুঝিলেন। তিনি নিদ্রামুক্ত ভাইভগিনীগণকে

পথ দেখাইতে, তাহাদের কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দিতে চলিলেন; সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—

আর, কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা, প্রেমেরই গঙ্গা ব'ক ;
মায়েরই রাজ্যে, মায়েরই কার্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ।
... ...
একই লক্ষ্য, প্রীতি সখ্য, প্রাণের ঐক্য হোক।
..
হবে সমৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি, ছেড়ো না সিদ্ধিযোগ !

আর সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলেন—

হও কর্মে বীর, বাক্যে ধীর, মনে গভীর ভাব ;
সে অপদার্থ-- যে পরমার্থ ভাবে স্বার্থলাভ।

কবি আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় মায়ের পূজার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন—

তোরা আয় রে ছুটে আয় ,
ঘুমের মা আজ জেগে উঠে ছেলে দেখতে চায় !
সরা ফুল বেলের পাতা, নোয়া সাত কোটি মাথা,
প্রাণের ভক্তি, দেহের শক্তি ঢাল রে মায়ের পায়।

দেশবাসী এইবার শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুগযুগসঞ্চিত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দীর্ঘসুপ্তির অবসানে কর্তব্যের সন্ধানে চলিল। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে যেন কেমন আশঙ্কা, অবসাদ ও অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়— অর্ধ পথেই যেন চরণ আর চলিতে চাহে না। কবির হৃদয়েও এই অবিশ্বাসের ও নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি অমনই দেশবাসীকে অভয়মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া উৎসাহভরে গাহিলেন—

আর কি ভাবিস, মাঝি, বসে ?
এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে,
হাল ধরে থাক কষে।
এই হাওয়া পড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবি নে, ভেসে যাবি,
মরবি রে মনের আপসোসে।

এমন বাতাস আর ব'বে না, পাবে যাওয়া আর হবে না,
মরণসিন্ধু মাঝে গিয়ে,
পড়বি বে নিজ কর্মদোষে।

আজ, এক কবে দে সন্ধ্যা নমাজ,
মিশিয়ে দে, আজ বেদ কোরান।
(জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে বে)
(হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে বে)
থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মাযেব স্তন্যপান।

আমবা পাশাপাশি প্রতিবাসী,
দুই গোলাবই একই ধান।
এক ভাই না খেতে পেলে
কাদে না কোন ভাযেব প্রাণ?
বিলাত ভাবত দুটো বটে—
দুযেরই এক ভগবান।

আব চাষি ও তাঁতি ভাই! তোমবাও কবিব সেই অমর উক্তি মন দিযা শোন:

ভিক্ষাব চালে কাজ নাই, সে বড়ো অপমান,
মোটা হোক, সে সোনা মোদেব মাযেব খেতের ধান,
সে যে মাযেব খেতের ধান।
মিহি কাপড় পবব না আব যেচে পরের কাছে,
মায়েব ঘবের মোটা কাপড় পবলে কেমন সাজে,
দেখ তো পবলে কেমন সাজে।
... ..
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে বসে কযে মাকু চালা,
ওদের কলের কাপড় বিশ হবে রে,
না হয তোদের হবে উনিশ।

তোদের সেই পুরানো তাঁতে
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে,
আমরা মাথায় করে নিয়ে যাব রে,
টাকা ঘরে বসে গুনিস।

স্বদেশীযুগে এমনি করিয়া কান্তকবি দেশবাসীকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শেষকথা' বাঙালিকে আশায়, আশ্বাসে ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত করিয়াছিল—

বিধাতা আপনি এসে পথ দেখালে,
তাও কি তোরা ভুলবি?
বিধাতা আপনি এসে জাগিয়ে দিলে,
তাও কি ঘুমে ঢুলবি?

বিধাতা পণ করা আজ শিখিয়ে দিলে,
তবু কি ভাই ভুলবি?
বিধাতা এত মানা ক'চ্ছে, তবু
দুধে তেতুল গুলবি?
বিধাতা ধান দিয়েছে, উপোস থেকে
পথে পথে বুলবি?

রজনীকান্তের স্বদেশ-বিষয়ক সকল সংগীতেই এমন দেশাত্মবোধের ব্যঞ্জনা বিরাজমান। তাই কান্তকবির স্বদেশী গান বাংলার গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সে যুগে অনেক ভগ্নহৃদয়, দুর্বল ও নৈরাশ্যকাতর প্রাণে আশা, উৎসাহ ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু কান্তকবি শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সফলতাসম্পাদনের নিমিত্ত তিনি স্বয়ং অনুগত সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া সুদূর পল্লীতে, হাটে মাঠে ঘাটে সকলকে এই অভিনব অনুষ্ঠানের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সরল ও সহজ ভাবে বুঝাইয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শান্তসুন্দর আকৃতি ও স্বভাবদত্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর এ কার্যে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল। স্বদেশীর উন্নতিবিধায়ক সভা, সংকীর্তন, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে রজনীকান্ত সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন।

পূর্ববঙ্গে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গাওয়া নিষিদ্ধ হইল, তখন রজনীকান্ত দৃপ্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

মা বলে ভাই ডাকলে মাকে, ধরবে টিপে গলা ,
তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে বে 'মা' বলা ?
—মাল্লে কি আব 'মা' ডাক ছাডতে পারি ?
হাজাব মাবো, 'মা' বলা ভাই কেমন কবে ছাডি ?

তাঁহাব 'কেমন বিচাব কচ্ছে গোবা', 'ফুলাব কল্লে হুকুমজারি' প্রভৃতি গান পূর্ববাংলায এক অভূতপূব উন্মাদনাব সৃষ্টি কবিযাছিল। মবণেব অব্যবহিত পূর্বে নিদাকণ বোগযন্ত্রণাব মধ্যেও তিনি দেশেব চিন্তা নিমেষের জন্য ত্যাগ কবিতে পাবেন নাই। তাই হাসপাতালে বোগযন্ত্রণায কাতব অবস্থায দিঘাপতিযাব মহা-প্রাণ কুমাব শ্রীযুক্ত শবৎকুমাব বাযকে তাহাব 'অমৃত' নামক গ্রন্থটি উৎসর্গকালে এই 'মন্দভাগিনী' জন্মভূমিব স্নেহেব তুলা। বলিযাছিলেন—

কৃপাব। ককণানিধে। দেখো ব'ল দেশ।

কবি বজনীকান্ত দেশমাতৃকাব একনিষ্ঠ ভক্ত ও অকপট সেবক ছিলেন। কে আব এমন কাযমনোবাক্যে দীনত্বঃখিনী বঙ্গজননীব সেবা কবিবে ? কে আর এমন সঞ্জীবনী ও প্রাণোন্মাদকাবী শক্তি সাবা বাংলায সঞ্চাবিত কবিবে ?

১২

ভগ্ন স্বাস্থ্য

১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে ৪১ বৎসর বয়সে ৺পূজার ছুটির চারি-পাঁচ দিন পূর্বে রজনীকান্ত হঠাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার দেহে রোগের সূত্রপাত হইল। এই কালব্যাধি তাঁহাকে শেষদিন পর্যন্ত পরিত্যাগ করে নাই।

ঔষধসেবন আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহাতে কোনও স্থায়ী উপকার হইল না। অবশেষে শলা দিয়া মূত্রনালী পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ইহা তো চিকিৎসা নয়— আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা, রোগের উপশম হইল না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জ্বর দেখা দিল। পরে ইহা ম্যালেরিয়ায় পরিণত হয়। ম্যালেরিয়া-জ্বরের যেমন স্বভাব সেইরূপ পাঁচ সাত দিন অতি প্রবল বেগে জ্বরভোগ হইত, আবার পাঁচ-সাত দিন বেশ ভালোই যাইত। এই জ্বরে তিনি বহুদিন ভুগিয়াছিলেন এবং ইহাতেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নানাবিধ চিকিৎসাতেও যখন কোনও ফল হইল না তখন চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি নৌকা ভাড়া করিয়া একমাসকাল পদ্মাগর্ভে নৌকাবাস করিলেন। ইহাতেও আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। কলিকাতায় তাহার আত্মীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া তিনি রোগের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইল না, শেষে তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে বায়ুপরিবর্তনের জন্য কটক গমন করিলেন। সে সময়ে তাহার শ্যালিকা পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, মহাশয় কটকের পোস্ট অফিস সমূহের সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি অতি যত্নের সহিত রজনীকান্তকে নিজের বাসায় রাখিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মহানদী ও কাটজুড়ির সংগমের উপর অবস্থিত নয়নমনোহারী কটক নগরের সুবিমল বায়ু সেবনে এবং নিয়মিত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবহারে তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন, ক্রমে ক্রমে পূর্বস্বাস্থ্যও ফিরিয়া পাইতে লাগিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সরস কৌতুকামোদে ও গান গল্পে কটক শহর মুখরিত করিয়া তুলিলেন। কটকপ্রবাসী বাঙালিরা তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইল, তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইল; সম্মুখে আনন্দের সুধাভাণ্ড পাইয়া তাহারা আকণ্ঠ পান করিতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা, বারোটা পর্যন্ত সুরেশবাবুর বাসায় অবিশ্রান্ত গানের তরঙ্গ বহিত, আর সেই তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া রজনীকান্তের আত্মীয় ও

বান্ধববর্গ অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতেন। এই সময়ে দেশমান্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কটকে গিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য স্থানীয় টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় রজনীকান্তের সহিত বিপিনবাবুর প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সভার প্রারম্ভে এবং কার্যাবসানে রজনীকান্ত স্বরচিত গান গাওয়া হইতে নিস্তার পান নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'সদ্ভাব-কুসুম' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা তিনি কটকে অবস্থানকালে রচনা করেন। 'সদ্ভাব-কুসুমে'র কবিতাগুলি গল্পাকারে ছেলেদের জন্য রচিত।

দুই মাস কাল জ্বর একেবারেই আসিল না, মূত্রকৃচ্ছ্রও অনেকটা কমিল, তাঁহার দেহও সবল হইল, চিকিৎসক বলিলেন— আর দুই-এক মাস কটকে থাকিলেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে কোনও অপরিহার্য কার্যের জন্য তাঁহাকে রাজশাহিতে ফিরিয়া আসিতে হইল। পথশ্রম, রেলপথে রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অনিয়মে তাঁহার শরীর আবার ভাঙিয়া পড়িল। রাজশাহিতে ফিরিবার দুই-তিন দিন পরেই তাঁহার পূর্ববৈরী ম্যালেরিয়া আসিয়া আবার দেখা দিল।

ইহার পর রজনীকান্ত আবার কটকে গমন করিলেন, কিন্তু এবার আর পূর্বের ন্যায় নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। কিছুদিন কটকে থাকিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করিয়া প্রথমে ৫৫ নম্বর কর্পোরেশন স্ট্রীটে ও পরে ৪২ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে সপরিবার বাস করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ-ছয় মাস কাল রোগের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি 'জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি'র অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় কিছুকাল ছিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় কোনও ফল না পাইয়া তিনি ডাক্তার ইউনানকে দিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হইল না। তিনি রোজনামচায় লিখিয়াছেন: 'আমি ম্যালেরিয়ায় তিন-চার বৎসর ভুগে রাগ করে কলকাতায় বাসা করে ডাক্তার ইউনান্‌কে call দিয়ে সমস্ত history বলি। সে বললে, "তুমি patiently stick করে থাকতে পারো তো সারবে, But all your symptoms will reappear";— reappear না reappear! এক ডোজ ওষুধ খেয়ে এক মাসে চার বার জ্বর, সেই জ্বরেই যাই! নমস্কার করে হোমিওপ্যাথি ছাড়ি।' অবশেষে

কবিরাজি চিকিৎসা করানো স্থির হইল। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস সেন মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় রোগী একটু সুস্থ হইলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পূর্বে আবার তাহাকে বাধ্য হইয়া রাজশাহিতে ফিরিয়া যাইতে হইল।

১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে রাজশাহিতে ফিরিয়া গিয়া তিনি নিয়মমতো কাছারিতে যাইতে আরম্ভ করিলেন ও পূর্বের ন্যায় সকল কাজই করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এক-এক দিন কাছারি হইতে জ্বর লইয়া তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিতেন, দশ-বারো দিন শয্যাগত থাকিয়া আবার কার্যে মনোনিবেশ করিতেন। উপর্যুপরি জ্বর ভোগ করিয়া তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইল বটে, কিন্তু তবুও তাঁহার মানসিক প্রফুল্লতার হ্রাস হইল না। তখনও কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু-বান্ধব লইয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত গানবাজনা করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। কখনো কখনো কবিতা ও গান রচনা করিয়া অবসরসময় যাপন করিতেন।

কার্তিক মাসের প্রারম্ভে তিনি বিষয়কর্মের জন্য ভাঙাবাড়িতে গমন করেন। তখন সেখানে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। জ্বরের উপর জ্বর আসিতে লাগিল। অগত্যা চিকিৎসার জন্য তিনি সিরাজগঞ্জে যাইতে বাধ্য হইলেন এবং একটি বাসা ভাড়া করিয়া তথায় সপরিবার বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর কবিশিরোমণি মহাশয়ের সুচিকিৎসাগুণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করেন এবং রাজশাহিতে ফিরিয়া আসেন।

ফাল্গুন মাসে তিনি দেশে গিয়া আবার জ্বরে পড়িলেন। এবারও পূর্বের ন্যায় কবিশিরোমণি মহাশয়ের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু পূর্বস্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না।

১৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহপ্রবেশ

বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহপ্রবেশোৎসব ১৩১৫ সালের ২১ অগ্রহায়ণ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইল। বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে এ আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাহিত্যসেবীগণ কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। রাজশাহি হইতে বাণীভক্ত রজনীকান্ত বাণীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

তিনি কলিকাতায় আসিয়া রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। উৎসবের পূর্বদিন মধ্যাহ্নে আমি হঠাৎ দীনেশবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। ইতিপূর্বে রজনীবাবুকে আমি কখনো দেখি নাই, পত্রবিনিময়ে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম মাত্র। ইহার প্রায় চারি বৎসর আগে আমার সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকায় 'সিন্ধুসঙ্গীত' ও 'আয়ুভিক্ষা' নামক তাঁহার দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনেশবাবু তাহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া বলিলেন— 'ইনিই রাজশাহির কান্তকবি'। পরিহাসপ্রিয় কবি তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'রাজশাহির সকলের নয়, তবে একজনের বটে'।

দেখিলাম তিনি একটি হার্মোনিয়ম লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি যে একজন সুগায়ক তাহা আমি জানিতাম না। তখন জানিতাম না যে, 'বাণী'র কবি 'সুরসপ্তকে' বীণা বাঁধিয়া গভীর পূর্ণওংকারে সামঝংকারে দূর বিমান কাঁপাইয়া তোলেন, তখন জানিতাম না যে, শ্বেতপদ্মাসনা বাগ্‌দেবীর রাতুল চরণকমলে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার অমৃতোপম স্বরলহরী মূর্তিমতী রাগরাগিণীর সৃষ্টি করে, তখন বুঝি নাই যে, তাঁহার কণ্ঠামৃতপানে হৃদয়ের পরতে-পরতে মুরলীরবপূরিত বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জের নয়নমনোহর ভুবনমোহন ছবি ফুটিয়া উঠে, তখন বুঝি নাই যে, সেই জনপ্রিয় রসরাজ রজনীকান্তের মনোরম ভগবান-টলানো, সেই মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, হরিনামগান-শ্রবণে জগৎ ভুলিতে হয়, সংসার ভুলিতে হয়, আত্মহারা হইতে হয়, আর ভগবদ্‌রসে আপ্লুত হইয়া আমার ন্যায় অভাজনের মাথাও আপনা হইতে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

কবি প্রথমেই গাহিলেন :

তুমি, নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব, পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক, মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।

এই গানটি পূর্ব হইতেই আমার জানা ছিল, দুই-একজন সুকণ্ঠ বন্ধুর কণ্ঠ হইতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কবির নিজের কণ্ঠে যাহা শুনিলাম, তাহা অপূর্ব, অবর্ণনীয়। গান শুনিয়া আমার নীরস শুষ্ক প্রাণে প্রীতির মন্দাকিনীধারা ছুটিল; আঁখির কোল আর্দ্র হইয়া উঠিল। 'গানাৎ পরতরং ন হি' যে কেন তাহা বুঝিলাম, আর জগৎকবি শেকস্‌পিয়রের সেই উক্তি—

The man is that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils
. ...
Let no such man be trusted.

এবং তাহার যাথার্থ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু সে কোন্ গান যাহা জগতে অতুল্য, সে কোন্ গান যাহা শুনিয়া মুগ্ধ না হইলে বুঝিতে হইবে শ্রোতার আপাদমস্তক শয়তানিতে ভরা? ইহা সেই স্বর্গীয় সংগীত যাহা গায়কের ভক্তহৃদয় নিংড়াইয়া কমকণ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে বহির্গত হয় এবং বিন্দু বিন্দু বারিপাতের ন্যায় শ্রোতার অজ্ঞাতসারে তাহার দেহ মন প্রাণ আপ্লুত করে। গানের মতো গান হইলে, আর আপনমনে প্রাণ ঢালিয়া গাহিতে পারিলে, তবে না লোকের মন ভিজে?

এই সংগীতই জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তাই এই সংগীতশ্রবণে একদিন নদিয়ার মহাপাপী জগাই-মাধাইয়ের পাষাণপ্রাণে ভক্তির পীযূষধারা পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অমৃতবর্ষণের পর রজনীকান্ত ক্ষান্ত হইলেন। আমিও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার বচনসুধা পান করিয়া বিদায় লইলাম।

পরদিন ২১ অগ্রহায়ণ রবিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহপ্রবেশ-দিন বাঙালির সারস্বত সাধনার শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার মঙ্গলবাসর। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় কার্যারম্ভ হইবার কথা কিন্তু চারিটার মধ্যেই পরিষৎ-মন্দিরের দ্বিতলের হল জনসংঘে ভরিয়া গেল। সেদিন লোকের কী উৎসাহ! কী আনন্দ! সকলের চোখে মুখে আনন্দের কী অপরূপ দীপ্তি! এখনো চোখের উপর সেদিনের সেই ছবি ভাসিতেছে। পরিষদের তৎকালীন সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে উপরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। নিম্নতলের হলও লোকে

ভরিয়া গিয়াছে—বাহিরে রাস্তায়ও লোকে লোকারণ্য। নিম্নতলের হলেও একটি স্বতন্ত্র সভার অধিবেশন হইল এবং কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। রজনীকান্ত বিপুল জনতা ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারিলেন না, নিম্নতলের সভায় রহিয়া গেলেন। রবীন্দ্রবাবু সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে রজনীকান্তের পরিচয় দিলেন এবং সংগীতালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। সভাপতির সনির্বন্ধ অনুরোধে রজনীকান্ত সেই সভায় নিম্নলিখিত দুইখানি গান গাহিয়াছিলেন—

সৃষ্টির বিশালতা

লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ
নীল গগন-গর্ভে,
তীব্রবেগ, ভীমমূর্তি,
ভ্রমিছে মত্ত গর্বে।

কোটি কোটি তীক্ষ্ণ উগ্র
অনলপিণ্ড-তারা,
দৃপ্তনাদে ঝলকে ঝলকে,
উগরে অনলধারা।

এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
প্রকটে শক্তিবিন্দু,
নমি সে সর্বশক্তিমান্
চিরকারণসিন্ধু।

সৃষ্টির সূক্ষ্মতা

স্তূপীকৃত, গণন-রহিত
ধূলি, সিন্ধুকূলে;
কোটি কীট করিছে বাস,
এক সূক্ষ্ম ধূলে।

কীটদেহ জনম মৃত্যু,
নিমিষে কোটি, লক্ষ ;
ভুঞ্জে দুঃখ, হরষ, রোষ,
প্রীতি, ভীতি, সখ্য ।

এই সূক্ষ্ম কৌশল, রটে
যাঁর জ্ঞানবিন্দু ,
নমি সে চিরপ্রমাদশূন্য
চিৎস্বরূপ সিন্ধু !

সেই বিপুল জনসংঘ ধীর, স্থির, গম্ভীর ভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় সে বিশ্বসংগীত শুনিতেছিলেন ; হঠাৎ গান থামিয়া গেলে তাঁহাদের চমক ভাঙিল, আর সমস্বরে শতকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল— 'এ গান কোথায় ছাপা হয়েছে ?' কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিলেন যে গান দুইটি ছাপা হয় নাই। পরক্ষণেই সকলে সেই দুইটি মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এ সংগীত ত একবারমাত্র শুনিলে আশা মিটে না, তৃপ্তি হয় না, প্রাণ ভরে না— বার-বার শুনিতে ইচ্ছা করে, পুনঃ পুনঃ পড়িতে ইচ্ছা করে, ভালো করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করে। তাই গান দুইটি মুদ্রিত দেখিবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীর এত আগ্রহ !

রজনীকান্ত তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছেন— 'এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে সঙ্গে করে রবি ঠাকুরের বাড়ি তাব পরদিন সকাল বেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।'

পরিষদের এই সভাস্থলে এবং এই সময় কলিকাতায় অবস্থানকালে রজনীকান্তের সহিত বঙ্গের বহু সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যবন্ধুর পরিচয় হইয়াছিল।

১৪

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের রাজশাহি-অধিবেশন

পরিষদের গৃহপ্রবেশোৎসবের প্রায় দুই মাস পরে, ১৩১৫ সালের ৮ ও ১৯ মাঘ রাজশাহিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন-উপলক্ষে রাজশাহিতে কলিকাতা এবং বাংলার অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহু সুধী ও সাহিত্যিকের সমাগম হইয়াছিল। এই সময়েই শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য ৺রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তির সহিত রজনীকান্তের পরিচয় হয়। সকলকেই তিনি তাঁহার চরিত্রমাধুর্যে, অমায়িক ব্যবহারে এবং সরল কথাবার্তায় একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। এই সম্বন্ধে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর যাহা লিখিয়া-ছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—

'সেই সময়ে (রাজশাহি সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে) রজনীবাবুর সহিত পরিচয়ের প্রথম সুযোগ ঘটে। সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা-সংগীত প্রভৃতি করাইবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন,— তিনি থাকিতে এ ভার আর কে লইবে? সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে রাজশাহির সাধারণ পুস্তকাগারে সম্মিলনে উপস্থিত সাহিত্যিকগণের আনন্দবিধানার্থ আয়োজন হয়। সম্মিলনের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে রজনীবাবুই অভ্যর্থনা-ব্যাপারের প্রাণস্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া স্বরচিত হাসির গান এক-একটা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, সভাস্থল হাস্যরবে মুখরিত হইয়া উঠিল, নির্মল হাস্যরসের উৎস হইতে নিঃসৃত সুধাপান করিয়া সকলেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন। জানিতাম, আমাদের এই দুর্দিনে প্রাণে প্রফুল্লতা সমাগম করিয়া সজীব রাখিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের এক দ্বিজেন্দ্রলালই আছেন, জানিলাম উভয়ে সহোদর— রজনীকান্ত তাঁহার যোগ্যতম সহকারী।

'সভাভঙ্গের পর রজনীবাবু আমার নিকট আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন। এরূপ সাদর সানুরাগ সম্ভাষণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম

না। তাঁহার গানে ও কবিতায় যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার সহৃদয়তায় ততোধিক মুগ্ধ হইলাম।'

প্রথম দিনের সকাল বেলার সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে রজনীকান্ত আসিয়া আমাকে তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ কবিলেন।

সভাবম্ভের পূর্বে রজনীকান্ত নিজ রচিত নিম্নের গানখানি গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তিনি পূর্ব হইতে অন্য কয়েকজনকে এই গানটি শিখাইয়াছিলেন, তাঁহারাও কবির সহিত এই গানে যোগ দিয়াছিলেন।

স্বস্তি! স্বাগত! সুধী, অভ্যাগত, জ্ঞান-পরব্রত,
পুণ্য-বিলোকন,
বিদ্যাদেবী-পদযুগ-সেবী লোকনিরঞ্জন,
মোহবিমোচন।

লহ সব শাস্ত্রবিশারদবর্গ,—
দীন-কুটিরে প্রীতিব অর্ঘ্য,
দেব-প্রভাময় অতিথি-সমাগমে, জীর্ণ উটজ, মরি,
আজি কি শোভন!

হে শুভ-দবশন, ভাবত-আশা!
মুগধ প্রাণে নাহিক ভাষা,
ধন্য, কৃতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দীন হৃদয লহ,
হৃদয়-বিরোচন!

তাঁহার স্বাগত-সংগীতে সমবেত সকলে মুগ্ধ ও বিমোহিত হইলেন। আনন্দ-বিস্ফারিত সহস্র চক্ষুর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপে তিনি যেন কেমন একটু জড়সড হইযা পডিলেন।

বেলা প্রায় বাবোটাব সময় প্রথম অধিবেশন ভঙ্গ হইল। আমি কিন্তু মহা ভাবনায় পডিলাম। এইবার আমাকে রজনীকান্তের আতিথ্য গ্রহণ করিতে যাইতে হইবে। আমি তো তাঁহার বাডি চিনি না, লোকসমুদ্রের মধ্য হইতে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবাব উপায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। তাঁহার সেদিনকার আদর-আপ্যায়ন, সেবাযত্ন এবং আদর্শ আতিথেয়তার কথা আমি আমরণ ভুলিতে পারিব না। যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহজ সরল ব্যবহাব আমি সেদিন তাঁহার কাছে পাইয়াছি, তাহা অপ্রত্যাশিত,

অপূর্ব। রাজশাহিতে সমাগত শত শত মনস্বী ও সুধীবর্গের মধ্য হইতে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে গৃহে লইয়া গিয়া তিনি যে মধুর আদরযত্নে আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা আজ লেখনীমুখে ব্যক্ত করিতে আমি শ্লাঘা বোধ করিতেছি। সেই দিন কবির হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভাবের পরিচয় পাইয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল—সেটি তাঁহার উচ্চ-নীচ-অভেদজ্ঞান—সাম্যভাব। এই আন্তরিকতাশূন্য সমাজে, এই ইংবাজিশিক্ষিত আত্মম্ভরিতা-ভরা ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুমহলে, এই 'হামবডাই'য়ের যুগে, এই 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'য়ের দিনে যিনি বড়ো ও ছোটোকে, ধনী ও নির্ধনকে, পণ্ডিত ও মূর্খকে, গুণী ও গুণহীনকে, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমান চক্ষে দেখিয়া, সমানভাবে হৃদয়ের উৎসনিঃসৃত প্রীতিধারা দ্বারা অভিষিক্ত করিতে পারেন, দ্বিধাশূন্যভাবে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন, আবেগভবে জড়াইয়া ধরিতে পারেন, আপন জন ভাবিয়া কোলে টানিয়া লইতে পারেন, তিনি বিধাতার সার্থক সৃষ্টি, তিনি অ-মানুষ—তিনি দেবতা।

রজনীকান্তের স্নেহ ও যত্ন, প্রীতি ও ভালোবাসা, আদর ও অভ্যর্থনা, সৌজন্য ও আতিথেয়তা এমনই অকৃত্রিম, এমনই আন্তরিক, এমনই সরল যে তাহা কেবল আত্মারই উপভোগ্য, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, অন্তত সে ক্ষমতা আমার নাই। নিজে কাছে বসাইয়া যত্নপূর্বক আহার করানো, স্নেহময়ী জননীর মতো কোলের কাছে আহার্যবস্তুগুলি একটি একটি করিয়া আগাইয়া দিয়া 'এটা খান', 'ওটা খান' বলিয়া সেই যে সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাহার পর আহারান্তে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া গান শোনাইয়া মধুরেণ সমাপন—সে-সব আজ একটি একটি করিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে, আর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছে। তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিবালাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের কমকণ্ঠের মধুর সংগীত শোনাইয়া দেন। আপনহারা হইয়া তন্ময়চিত্তে সেই গান শুনিয়াছিলাম।

তাহার পর কত হাস্যপরিহাস, কত গল্পগুজব, কত আলোচনা দ্বারা গৃহসমাগত বন্ধুহৃদয়ে আনন্দধারা ঢালিয়া দিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যিনি রজনীকান্তের সহিত অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই আমার এ সকল কথা হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন। সর্বশেষে তিনি আমাকে তাঁহার পিতা ৺গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় প্রণীত 'পদচিন্তামণিমালা' দেখাইলেন। ইহা ব্রজভাষায় রচিত কীর্তনের অপূর্ব সমষ্টি।

বৈকালের অধিবেশনে কার্যাবম্ভ হইবার পূর্বে রজনীকান্ত স্বরচিত 'বাণীবন্দনা' গাহিয়াছিলেন—

তিমিরনাশিনী, মা আমার।
হৃদযকমলোপবি চরণকমল ধরি,
চিন্ময়ী মুরতি অখিল-আঁধার। ইত্যাদি

সেইদিন সন্ধ্যাব পবে বাজশাহিব সাধাবণ পুস্তকাগাবে সমাগত প্রতিনিধি-বর্গের অভ্যর্থনাব জন্য একটি সান্ধ্য সম্মিলনেব অনুষ্ঠান হয। সেখানেও বজনীকান্ত সমভাবে বিবাজমান— তাহাব হাসিব গান, স্বদেশ-সংগীত ও বহস্যাবৃত্তি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে একেবাবে মুগ্ধ কবিযা ফেলিল, আব তাঁহার সুধাকণ্ঠ পুত্রকন্যাদ্বয়ের 'সে আমাদের হিন্দুস্থান' নামক গানেব ঝংকাবে শ্রোতৃমণ্ডলীব শবীব রোমাঞ্চিত হইযা উঠিল।

দ্বিতীয দিনেব অধিবেশন-প্রাবম্ভেও বজনীকান্ত তাঁহাব 'জ্ঞান' নামক নিম্ন-লিখিত গান গাহিযা জনসাধারণেব চিত্তবিনোদন কবেন—

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান সেব্য, জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশলসাব,
জ্ঞান ধর্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধাব,
জড জীবন যাব, অলস অন্ধকাব,
জ্ঞান বন্ধু তার। ইত্যাদি

দ্বিতীয দিনে সম্মিলনেব কার্যসমাপ্তিব পূর্বে যখন কবি বিদায-সংগীত আরম্ভ করিলেন, যখন গাহিলেন—

সুখের হাট কি ভেঙে নিলে।
মোদেব মর্মে মর্মে বইল গাঁথা,
(এই) ভাঙা বীণায কি সুর দিলে।
দুঃখদৈন্য ভুলে ছিলাম,
ডুবে আনন্দসলিলে,
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে,
আঁধার ক'বে আজ চলিলে।
(মোদের) কাঙাল দেখে দয়া ক'রে
নয়নধারা মুছাইলে;

(আমরা) জ্ঞান-দরিদ্র দেখে বুঝি,
দু-হাতে জ্ঞান বিলাইলে।
(এই) শ্রেষ্ঠ দানের বিনিময়ে
কি পাইবে ভেবেছিলে ?
(ওগো) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট,
প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে।
পাও নি যত্ন পাও নি সেবা,
কষ্ট পেতে এসেছিলে।
(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা কোরো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখব বেঁধে,
রইবে না হাজার কাঁদিলে,
(শুধু) এই প্রবোধ যে, হর্ষবিষাদ
চিরপ্রথা এই নিখিলে।

তখন বিজয়াদশমীর প্রতিমা-বিসর্জনান্তে শানাইয়ের চিরপরিচিত করুণ রাগিণী হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইয়াছিল।

অপরাহ্নে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের ভবনে বিদায়সভা-স্থলেও রজনীকান্ত সংগীতসুধা বিতরণে কার্পণ্য করেন নাই।

বিদায় লইলাম, গাড়িতে উঠিলাম, কিন্তু প্রাণটুকু রজনীকান্তের কাছেই ফেলিয়া আসিলাম। নাটোর যাইবার সমস্ত পথটা— জ্যোৎস্নাবিধৌত দীর্ঘ পথে— কেবলই মনে হইতে লাগিল রজনীকান্তের কথা। একজন লোক যে এমন করিয়া নানা মূর্তিতে এমন আনন্দ দিতে পারে, তাহা আমি পূর্বে ধারণা করিতে পারি নাই। একজন লোকের ভিতর একাধারে কবি, সুগায়ক ও কর্মবীরের ত্রিমূর্তি যে সমভাবে পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহাও আমি পূর্বে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

বাস্তবিকই এই রাজশাহি-সম্মেলনে রজনীকান্তের প্রকৃত চিত্র, তথা প্রকৃতি-চিত্র, আমরা স্পষ্টীকৃতভাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম— পবিত্রতা ও সরলতা যেন মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে বিরাজমান আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ংগম করিয়াছিলাম, যিনি পরকে এইরূপ আপন করিতে পারেন তিনি 'মহতো মহীয়ান'। তাই রাজশাহি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র

ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ 'বসুমতী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: 'আর আমরা ভুলিতে পারিব না— রাজশাহির— শুধু রাজশাহির কেন, বঙ্গের কবি রজনীকান্তকে। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়"-এর কবির সাক্ষাৎ-সন্দর্শনে ও সৌজন্যে আমরা আমাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছি। রজনীকান্তের মোহ এখনো আমাদের ছাড়ে নাই।'

১৫

কালরোগের সূত্রপাত

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজশাহিতে একদিন পান চিবাইতে চিবাইতে চুনে রজনীকান্তের মুখ পুড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সেই পান ফেলিয়া দিয়া তিনি মুখ ধুইলেন। ইহার দুই-দিন পরে তাঁহার গলার ভিতরে কেমন সুড়সুড় করিতে লাগিল, অল্প ব্যথা বোধ হইল। যখন উহা অল্পে সারিল না, তখন তিনি ডাক্তারদের দেখাইলেন এবং নিয়মিতভাবে ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা তখন ইহাকে 'ল্যারিনজাইটিস' 'ল্যারিনজাইটিস্' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। ইহা যে-রোগই হউক-না কেন, সেই রোগ সম্পূর্ণ ভালো না হইতেই কোনও বিশেষ কার্যোপলক্ষে রজনীকান্তকে রঙপুর যাইতে হয়।

সেখানে গিয়া তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যেদিন তিনি রঙপুরে পৌঁছিলেন, সেই দিনই হার্মোনিয়ম লইয়া রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত গান করেন। পরদিন জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহে সন্ধ্যার সময় স্থানীয় সরকারি উকিল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে তাঁহাকে গান গাহিতে হইল। আমি নিজে একবার রঙপুরে গিয়াছিলাম, তখন রায়বাহাদুর আমাকে বলিয়াছিলেন— 'সন্ধ্যা হইতে রাত্রি একটা-দেড়টা পর্যন্ত রজনীবাবু একা অক্লান্তভাবে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান করেন। আমার এই দুইটি ঘরে প্রায় দুশোর উপর লোক জমা হয়েছিল— মশা মাছি যাবার পর্যন্ত স্থান ছিল না। এই গান গেয়ে তিনি রঙপুরের বহু লোককে এক মুহূর্তে আপনার করে ফেলেন।'

রঙপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্তের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবিশ্রান্ত গান গাওয়া এবং অতিরিক্ত রাত্রিজাগরণই এই বৃদ্ধির কারণ।

ক্রমে তাঁহার স্বরভঙ্গ হইল এবং গলার ব্যথা দিন দিন বাড়িতে লাগিল ; পরিবারবর্গ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুই-তিন মাস নিয়মমতো ঔষধসেবন, প্রলেপ-প্রয়োগ এবং স্প্রে ব্যবহার করিয়াও যখন রোগের উপশম হইল না, তখন আত্মীয়স্বজনের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল— বুঝি-বা এই ব্যাধি মারাত্মক ক্যান্সারে পরিণত হয়। তাঁহাদের নয়নের নিধি উমাশংকর যে এই দুষ্ট রোগেই কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে!

এই রোগযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া রজনীকান্ত কিন্তু প্রত্যহই কাছারি যাইতেন, মকদ্দমার সওয়াল-জবাব ইত্যাদি করিতেন। বিকালে বাসায় ফিরিয়া তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, এমনকি সময়ে সময়ে কথা কহিতে তাঁহার খুব কষ্ট বোধ হইত। অতিরিক্ত স্বরচালনায় এবং গুরু পরিশ্রমে, তাঁহার রোগ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, স্বর বিকৃত হইল এবং খাদ্যদ্রব্যগ্রহণে কষ্ট হইতে লাগিল ; আর সঙ্গে-সঙ্গে গলায় ঘা দেখা দিল। কবি তাঁহার রোজনামচায় ১৫ মার্চ তারিখে লিখিয়াছেন— 'হঠাৎ হাসতে হাসতে গলায় ঘা হল, তাই নিয়ে রঙপুরে গিয়ে তিনদিন গান করতে হল। তারপর থেকেই এই দশা।' পুনরায় ২৬ মার্চ তারিখে তিনি লিখিয়াছেন : 'First history-টা তোদের মনেই থাকে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে পান খেয়ে মুখ পোড়ে, তারপর জিভের বাঁ ধার দিয়ে মটরের মতো গুড়িগুড়ি ও বেদনা, গাল ফুলা হয় ; ক্রমে সেই যন্ত্রণা বাড়ে ; ক্রমে তা থেকে ঘা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গলনালী আর শ্বাসনালী দুটো জিনিস আছে। আমার ভাত খাবার নালীর মধ্যে ঘা নয়, নিশ্বাসের নালীর মধ্যে ঘা, সেখানে কোনও ঔষধ লাগানো যায় না। এই সময়ে জিভের বাঁ পাশ দিয়ে বরাবর ছোটো ছোটো মটরের মতো গোটা, ব্যারামের সূত্রপাত থেকেই আছে।'

যে সময়ে রজনীকান্তের গলায় ঘা দেখা দেয়, সেই সময়ে তাঁহার ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী তাঁহার জন্য রাজশাহিতে কিছু ভালো ছাঁচি পান এবং উৎকৃষ্ট চিঁড়া পাঠাইয়া দেন। সেইগুলি পাইয়া তিনি ক্ষীরোদবাসিনীকে লিখিয়াছিলেন —'ভগ্নী, তোমার প্রেরিত পান ও চিঁড়া পাইলাম। উহারা আমার অতি প্রিয় হইলেও পরিত্যাজ্য ; কারণ চিকিৎসকগণ আমাকে ঐ দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কয়েকদিন হইল আমার গলার ভিতর একটু ঘা দেখা দিয়াছে। ডাক্তারেরা ঠিক বলিতে পারিতেছেন না উহা কি রোগ। যদি ক্যান্সার হয়, তবে সত্বরই তোমাদের মায়া কাটাইতে পারিব।'

১৬

রোগের বৃদ্ধি ও কলিকাতায় আগমন

হঠাৎ রোগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, মাস ও তিথিবিচার না করিয়াই রজনীকান্ত ১৩১৬ সালের ২৬ ভাদ্র, পরিবারবর্গের সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা— নিজের প্রিয় কর্মভূমি রাজশাহির নিকট হইতে ইহাই তাঁহার চিরবিদায়গ্রহণ। যে রাজশাহির কোমল অঙ্কে উপবেশন করিয়া কবি নব নব প্রাণোন্মাদকর গীত রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, যেখানে তাঁহার কবিপ্রতিভা বালার্কের ন্যায় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল— সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার সুখ ও সৌভাগ্যের লীলানিকেতন, সেই আত্মীয়স্বজন সুহৃৎ-শোভিত, সংগীততরঙ্গ-পবিপ্লাবিত আনন্দক্ষেত্র রাজশাহি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। যখন মেডিকেল কলেজের 'কটেজ'-গৃহে দারুণ রোগযন্ত্রণায় তাহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন তিনি একদিন উন্মত্তের ন্যায় বিচলিত-ভাবে লিখিয়াছিলেন— 'তোরা আমাকে রাজশাহি নিয়ে যা, আমি সেইখানে মরব।' এই সময়ে তাঁহাকে লিখিতে দেখিয়াছি— 'রাজশাহির লোক দেখলে মনে হয় আমার নিজের মানুষ।' হায় রাজশাহি। কোন অপরাধে তোমার স্নেহপীযূষবর্ধিত সন্তানের প্রাণের কামনা মৃত্যুকালেও পূর্ণ করিলে না? সে তো চিরদিন কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কটক হইতে কলিকাতায় বদলি হইয়া ৫৭ নম্বর সার্পেণ্টাইন লেনে বাস করিতেছিলেন। রজনীকান্ত কলিকাতায় আসিয়া সপরিবার তাহার বাসাতেই উঠিলেন।

প্রথমে ডাক্তার ওকেনেলি সাহেবকে দেখানো হইল। তিনি অতি যত্নপূর্বক বৈদ্যুতিক আলো ও বহুবিধ যন্ত্রসাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিলেন এবং ইহা ক্যানসার প্রতিপন্ন করিয়া বলিলেন যে, অতিরিক্ত স্বরচালনাই বোধহয় এই রোগের উৎপত্তির কারণ। এই রোগের চিকিৎসার এখনো কোনও প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবিত হয় নাই। এই রোগের অনিবার্য পরিণাম যে মৃত্যু, তাহা ডাক্তার-সাহেব রোগীর নিকট ব্যক্ত না করিলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি রজনীকান্ত ডাক্তারের মুখভাব দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন— বুঝিলেন এই মারাত্মক রোগের কবল হইতে তাঁহার আর নিস্তার নাই। তাই তিনি ডাক্তার-সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, 'বলুন এটা মারাত্মক— শাদা কথায় ক্যানসার— কিনা?' তখন অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তার

উত্তর করিলেন, 'মারাত্মক— এ-কথাও বলিতে পারি না, আর মারাত্মক নয় তাও বলিতে পারি না। তবে রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।'

ওকেনেলি সাহেবের চিকিৎসা ও ব্যবস্থা চলিতে লাগিল, ইহার পরে সাহেব আরও দুইবার পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু রোগের হ্রাস হইল কই? কাজেই কলিকাতার প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণকে দেখানো হইল, রোগী তাঁহাদের ব্যবস্থামতো ঔষধাদি ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল,- আহার করিতে যন্ত্রণা হইতে লাগিল, মাঝে মাঝে জ্বর হইতে লাগিল, গলার বেদনা ও ফুলা বৃদ্ধি হইল এবং অনবরত কাশিতে কাশিতে রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল।

সেই সময়ে ৺কাশীধামে বালাজি মহারাজ নামে একজন অবধূত চিকিৎসক ছিলেন। রজনীকান্তের স্বগ্রামবাসী আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু বহরমপুরের বিখ্যাত সরকারি উকিল রাধিকামোহন সেনের উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি নিরাময় করেন এবং আরও অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরাম করিয়াছিলেন। এ-সকল কথা রজনীবাবু পূর্বাবধিই জানিতেন। কাজেই যখন তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, কলিকাতার চিকিৎসা তথা পার্থিব চিকিৎসায় তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিল না, তখন ভগবৎকৃপালাভের জন্য দৈবশক্তির সাহায্য লইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশ্বেশ্বরের চরণপ্রান্তে গিয়া দৈব ঔষধ ব্যবহার করিলে, তিনি রক্ষা পাইবেন— তখন ইহাই তাঁহার ধারণা। তাই স্বামীজির চিকিৎসাধীন থাকিবার জন্য রজনীকান্তের প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি রাধিকাবাবুকে চিঠি লিখিয়া বালাজির কাশীর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন। তখন কাশী যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

১৭

কাশীধামে কয়েক মাস

কার্তিক মাসে রজনীকান্ত সপরিবার কাশীধামে যাত্রা করেন। যাইবার পূর্বে অত্যন্ত অর্থাভাববশত তিনি 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র গ্রন্থস্বত্ব, মায় অবিক্রীত দুই শত পুস্তক কেবল চারি শত টাকায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এই দুইটি রত্ন বিক্রয় করিয়া কবি যে মর্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষাতেই বলি না কেন? তিনি রোজনামচায় লিখিয়াছেন: 'আমার এমন

অবস্থা হল যে, আর চিকিৎসা চলে না, তাইতে বড়ো আদরের জিনিস বিক্রয় করেছি। হরিশ্চন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করেছিলেন। হাতে টাকা নিয়ে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়ছিল। আর তো তেমন মাথা নাই। আর তো লিখতে পারব না। যদি বাঁচি জড়পদার্থ হয়ে রইলাম।'

কাশীতে রামাপুরায় একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া রজনীকান্ত প্রথমে থাকেন, তৎপরে স্বামীজির পরামর্শে গঙ্গার তীরে মানমন্দিরের নিকট একটি বাড়িতে তিনি অবস্থিতি করেন এবং সর্বশেষে কাকিনা রাজের বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন। প্রথমে আত্মীয়স্বজনগণের নির্বন্ধাতিশয্যে রজনীকান্তকে অল্প কয়েকদিনের জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় থাকিতে হয়, কিন্তু তাহার দুরদৃষ্টবশত এই চিকিৎসায় কোনও ফল হইল না, অধিকন্তু তাঁহাকে কয়দিন অত্যধিক শ্বাসক্লেশ ভোগ করিতে হইল।

অনন্তর কার্তিক মাসের শেষ হইতে বালাজি মহারাজ রজনীকান্তের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীর ব্যবস্থার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব এই যে, রজনীকান্তকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে হইত। এই ব্যবস্থা শুনিয়াই বাড়ির সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। যে রোগী এই সুদীর্ঘকাল রোগভোগের মধ্যে একটি দিনও স্নান করেন নাই, তাঁহাকেই গঙ্গাস্নান করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা যখন পরিজনগণের মনোনীত হইল না, তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কবি নির্ভীকভাবে বলিয়াছিলেন, 'ভয় কোরো না, দেখো, আমার আর কোনও অসুখ হবে না'। বস্তুত তাঁহার ধারণা হইয়াছিল স্বামীজির কৃপায় তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে এবং স্বামীজি-প্রদত্ত প্রলেপ ও পাচন ব্যবহারে বাস্তবিকই তিনি কিছু সুস্থ বোধ করিলেন। সকলের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

দেবদেবীবহুল বারাণসী রজনীকান্তের চিত্তে পবিত্র ভাব ও মনে অপূর্ব প্রফুল্লতা আনিয়া দিল। তিনি প্রতিদিনই কখনো বা হাঁটিয়া, কখনো বা পালকি করিয়া বিভিন্ন দেবদেবী দর্শন করিতেন এবং বৈকালে নৌকা করিয়া গঙ্গাবক্ষে বেড়াইতেন আর সন্ধ্যার সময়ে যখন আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টারোলে কাশীনগরী মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন তিনি ভক্তিপ্লুতচিত্তে মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীর আরাত্রিক দেখিয়া ধন্য হইতেন— প্রাণে নব বল পাইতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার একটু একটু জ্বর হইত এবং সময়ে সময়ে গলা দিয়া রক্তও পড়িত; তবু মোটের উপর তিনি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ হইতেছিলেন।

কাশীর ভদ্রমণ্ডলী ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন তাঁহার পরিচয় পাইলেন,

তখন তাঁহারা রজনীকান্তকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পরিচর্যাতেও নিযুক্ত হইলেন। কাশীতে একটি সেবকসমিতি আছে। রজনীকান্ত যখন রোগযন্ত্রণায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন, তখন সেই সমিতির সেবকগণ পর্যায়ক্রমে রজনীকান্তের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। কবি রোজনামচায় লিখিয়াছেন: 'কাশীতে এক সেবকসমিতি আছে। আমি যখন বড়ো কাতর, তখন তাঁহারা পর্যায়ক্রমে আমার শুশ্রূষা করতেন। তাঁদের অধিকাংশই কাব্যতীর্থ।'

এই সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের আন্তরিকতা, সেবা ও যত্নের গুণে বিদেশ রজনীকান্তের কাছে স্বদেশ হইয়া উঠিল। হাসির গল্প, কবিতারচনা ও শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি দ্বারা তিনি সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। কবির স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আবার যেন একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মাঘ মাসের প্রথমে হঠাৎ একদিন রজনীকান্তের প্রবল জ্বর হইল, এবং সেই-সঙ্গে গলা ফুলিয়া তাঁহার গলায় খুব ব্যথা হইল, তিনি খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। বালাজির ঔষধে আর কোনও ফল হইল না। তাঁহার চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি কিছুদিন এক প্রসিদ্ধ ফকিরের প্রদত্ত ঔষধ সেবন করেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই সময় হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, অথচ ইহার কোনও প্রতিকার কাশীতে কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। একবার আগ্রায় গিয়া রেডিয়াম চিকিৎসা করিবার জন্য অনেকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্বাসকষ্ট দিনদিন এতই বাড়িতে লাগিল এবং জ্বরের প্রকোপ, অনিদ্রা, খাদ্যগ্রহণে কষ্ট এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, প্রাণরক্ষার জন্য অতি শীঘ্রই তাঁহাকে কলিকাতায় আনা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না।

১৮

কলিকাতায় পুনরাগমন

রজনীকান্তের কাশীত্যাগ এক মহাহৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য। প্রাণ অন্নপূর্ণার কোল ছাড়িতে চাহে না, কিন্তু না ছাড়িলেও যে প্রাণরক্ষা হয় না! আর কবিকে ছাড়িতে চাহেন না—কাশীর ভক্তমণ্ডলী! তিনি যে এই কয়মাসে তাঁহাদিগকে

নিতান্ত আপনজন করিয়া তুলিয়াছেন। কাশী হইতে ট্রেন ছাড়িল— কিন্তু যাঁহারা কবিকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না, মোগলসরাই পর্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। তাহার পর বিদায়মুহূর্তে রোদনের পালা— আমরা লিখিতে পারিব না।

কবির পরিবারবর্গ তাঁহাকে লইয়া ২১ মাঘ কলিকাতায় সার্পেণ্টাইন লেনের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতার প্রধান প্রধান কবিরাজগণ রজনীকান্তের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার রোগের উপশম নাই, জ্বরের বিরাম নাই, যন্ত্রণার লাঘব নাই, অধিকন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট তাহাকে উত্তরোত্তর ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাহার অবস্থা ক্রমশ সংকটাপন্ন হইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজি— সকল চিকিৎসাই ব্যর্থ হইল।

ক্রমে নিশ্বাস ফেলিতে এবং শ্বাসগ্রহণ করিতে তাহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। বহুক্ষণ অক্লান্ত চেষ্টা করিলে তবে অল্প একটু নিশ্বাস বাহির হইত। তখন সেই বিষম যন্ত্রণায় রজনীকান্ত কখনো বসিয়া পড়েন, কখনো ছুটিয়া বেড়ান, কখনো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া যুক্তকরে দয়ালকে ডাকেন, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পান না। তখন কাতরকণ্ঠে তিনি লিখিয়া জানাইতে লাগিলেন —'হয় মৃত্যু, নয় শ্বাস প্রশ্বাস লইবার ক্ষমতা দাও ঠাকুর।' দিন যায় তো ক্ষণ যায় না— প্রতি মুহূর্তেই সকলের মনে হইতে লাগিল, এইবার বুঝি প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

২০ মাঘ বুধবার বৈকালে সাড়ে-চারিটার সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় ডাক্তার বার্ড সাহেবকে লইয়া আসিলেন। ডাক্তার-সাহেব তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন— 'অস্ত্রসাহায্যে গলায় ছিদ্র করিয়া রবারের নল বসাইয়া দিতে হইবে, সেই নলের ভিতর দিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা যাইবে। এ-ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই।'

তিনদিন দিবারাত্র এই যমযন্ত্রণার সহিত প্রাণান্ত যুদ্ধ করিয়া ২৮ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে মৃত্যু অবধারিত ও সন্নিকট দেখিয়া রজনীকান্ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়স্বজনকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার যাবতীয় বিষয় স্ত্রীর নামে লিখাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তখন তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা ছিল না— অতিকষ্টে কোনও রকমে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিদারুণ প্রাণান্তকর অবস্থা দেখিয়া এবং ইহার কোনও প্রতিকারই নাই বুঝিয়া আত্মীয়স্বজনের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সকলের চোখের সম্মুখে কবি

একটু নিশ্বাসের জন্য ধুলায় লুটাইতে লাগিলেন। হাসপাতালের রোজনামচায় তিনি এই নিদারুণ প্রাণান্তকর অবস্থা সম্বন্ধে লিখিযাছেন : 'হাসপাতালে আসবার আগে তিন দিন তিন রাত কেবল একটু নিশ্বাসের জন্য ভয়ানক হাঁপিযেছি।'

যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য অক্সিজেন দেওযা হইল, কিন্তু তাহাতে কোনও উপকার হইল না। বেলা এগারোটার সময়ে তাঁহার একেবারে দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। যতীন্দ্রবাবু রজনীকান্তের সেই অবস্থা লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার কণ্ঠদেশে শীঘ্র অস্ত্র করা ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই—এই কথা পরিজনবর্গকে জানাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য মেডিকেল কলেজে চলিযা গেলেন। কবির আত্মীযস্বজন ও পুত্রগণ সেই কণ্ঠাগত-প্রাণ রোগীকে অতি সন্তর্পণে গাড়িতে তুলিযা মেডিকেল কলেজে যাত্রা করিলেন। পাঠক, এইবার প্রকৃত জীবনসংগ্রাম দেখিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায়

অন্তকালে আমাকেই স্মরি দেহমুক্ত হয়—
যে জন আমার ভাব প্রাপ্ত হয় অসংশয়।
যে যে ভাব স্মরি মনে ত্যজে অন্তে কলেবর,
সে সে ভাব পায়, পার্থ। সে ভাবভাবিত নর॥

—গীতা।

১

গলদেশে অস্ত্রোপচার

এইবার অস্ত্রোপচার। সুকণ্ঠ কবির কমনীয় কণ্ঠে অস্ত্রোপচার! এই কথা মনে হইলেই হৃৎকম্প হয়, আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে, অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। কি নিদারুণ ভবিতব্য, নিয়তির কি প্রাণঘাতী লীলা! দেহে এত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিতে গায়কের গলদেশেই আক্রমণ! বিচিত্রময়ের এই কঠোর বিচিত্রময় লীলাখেলার মর্মন্তুদ রহস্য বুঝিবার শক্তি বা সামর্থ্য আমাদের নাই।

কিন্তু আর সময়ক্ষেপের অবকাশ নাই, ভাবিবার সময় নাই, যুক্তিতর্কের অবসর নাই। কবির কণ্ঠে অনতিবিলম্বে অস্ত্রোপচার করিলে হয়তো তিনি এ-যাত্রা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। জানি, কবির কলকণ্ঠ চিরতরে নীরব হইবে, জানি, তাঁহার প্রাণোন্মাদকর সংগীতসুধা আর পান করিতে পারিব না, জানি, তাঁহার সুধাসিক্ত চিত্তাকর্ষক আবৃত্তি আর শুনিতে পাইব না— জানি, তাঁহার হাস্যমুখর, প্রাণভরা, প্রাণখোলা কথা আর উপভোগ করিতে পারিব না, জানি সব, বুঝি সব— কিন্তু তবু যদি তিনি রক্ষা পান, তাঁহাকে তো বুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিব, কবি বলিয়া, রসিক বলিয়া, সুগায়ক বলিয়া প্রাণের মানুষ বলিয়া মাথায় করিয়া রাখিতে পারিব – এই আশা আমাদিগকে কঠোর হইতে কঠোরতর করিল। আর ভাবিবার সময় নাই— অচিরে কবিকণ্ঠ নীরব করিতেই হইবে। তাহাই হউক।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি মেডিকেল কলেজে চলিয়া গিয়া অস্ত্রোপচারের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। ইতিমধ্যে কবিকে একখানি ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া লইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিজাশংকর এবং শ্যালিকাপুত্র সুরেশচন্দ্র হাসপাতাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে-দশটা। পথে গাড়ির মধ্যে অক্সিজেন যন্ত্র লওয়া হইল, সমস্ত পথ কবির নাকের ও মুখের কাছে অক্সিজেন গ্যাস প্রবেশ করানো হইতে লাগিল। অন্য একখানি গাড়িতে কবির পত্নী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে হাসপাতালে চলিলেন।

সার্পেন্টাইন লেন হইতে মেডিকেল কলেজ অতি সামান্য পথ, কিন্তু এই পথটুকুই কত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। গাড়োয়ান দ্রুতগতি গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল, কিন্তু সে পথ যেন আর শেষ হয় না। কবির অবস্থা তখন এতই

সংকটাপন্ন যে, প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হইতে লাগিল, এই বুঝি প্রাণ বাহির হইয়া যায়। গাড়ি যখন বহুবাজার স্ট্রীটে আসিয়া পড়িল, তখন সত্য সত্যই কবির অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন বলিয়া সকলের মনে হইল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে নিদারুণ মুহূর্ত একটু পিছাইয়া গেল। বেলা ১১টার পর কবিকে লইয়া সকলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। যতীন্দ্রমোহন পূর্ব হইতেই রোগীর আগমনপ্রতীক্ষায় ছিলেন। রজনীবাবু উপস্থিত হইবামাত্রই লিফটের সাহায্যে তাঁহাকে একেবারে তিনতলে অস্ত্র করিবার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় কাপ্তেন ডেনহাম হোয়াইট সাহেব ২৮ মাঘ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ১২টার সময় রজনীবাবুর কণ্ঠদেশে 'ট্র্যাকিওটমি' অস্ত্রোপচার দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের জন্য ছিদ্র করিয়া দিলেন। প্রথমে সেই ছিদ্র দিয়া ঝড়ের মতো কতকটা বাতাস, তৎপরে শ্লেষ্মা, শেষে রক্ত বাহির হইয়া গেল। শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের জন্য ছিদ্রপথে প্রথমত একটি রূপার নল বসাইয়া দেওয়া হইল এবং ৭।৮ দিন পরে ঐ স্থানে রবারের নল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উপস্থিত কোনপ্রকারে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু হায়! জন্মের মতো তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। যে অমৃতনিস্যন্দী, অক্লান্ত কণ্ঠ হইতে সংগীতসুধাধারা নিঃসৃত হইয়া সারা বাংলাদেশ প্লাবিত করিয়াছিল,--যে কণ্ঠোচ্ছ্বসিত প্রাণোন্মাদকর ভগবৎসংগীতে শ্রোতার চক্ষে দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িত,—যে কণ্ঠ সাধনসংগীত গাহিতে গাহিতে ভাবে গদগদ গম্ভীর হইত,—আর সঙ্গে সঙ্গে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া পুলক ও রোমাঞ্চে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিত—সেই কণ্ঠ, মধুময় সংগীতসুধার সেই অফুরন্ত প্রস্রবণ চিরতরে শুষ্ক ও নীরব হইয়া গেল।

কবির কণ্ঠ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ আপাতত রক্ষা পাইল। আর আধ ঘণ্টা বিলম্ব হইলে তাঁহার মৃত্যু হইত। অস্ত্রোপচারের পূর্বে কথা কহিবার সামান্য যে একটু শক্তি ছিল, অস্ত্রোপচারের পর তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। রক্তাক্তদেহে যখন তাঁহাকে অস্ত্র করিবার গৃহ হইতে বাহিরে আনা হইল, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পরিবার ও আত্মীয়বর্গ একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। রজনীকান্তের জ্ঞান কিন্তু লুপ্ত হয় নাই, তিনি বেশ স্পষ্টভাবে সকলের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক তাঁহাদের মনোগত ভীতিভাব বুঝিতে পারিয়া অঙ্গুলিদ্বারা হস্ততালুতে লিখিলেন: 'ভয় নাই, বেঁচেছি'। তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাগণ সার্পেন্টাইন লেনের বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

প্রথম দিন মেডিকেল কলেজের ত্রিতলের কাউন্সিল ওয়ার্ডে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। পরে দুই দিন তিনি জেনারেল ওয়ার্ডে ছিলেন।

অল্প একটু জ্বর হইল বটে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা তিনি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁহাকে দ্বিতলের জেনারেল ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হইল। এই দিন তাঁহার সহিত মেডিকেল কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বক্সি মহাশয়ের পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের দিন হইতে মৃত্যুসময় পর্যন্ত হেমেন্দ্রবাবু কবির সহচররূপে তাঁহার কাছে কাছে থাকিতেন। ২৪ বৈশাখ শ্রীযুক্ত চন্দ্রময় সান্যাল মহাশয়কে রজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন—'ওর নাম হেমেন্দ্রনাথ বক্সি। আমার যেদিন operation হয়, তার পরদিন আমি হাসপাতালে জেনারেল ওয়ার্ডে, হেমেন্দ্র কি কাজে সেই ঘরে গিয়ে আমাকে দেখে চিনতে পারে না— এমন reduced হয়ে গেছি। আমার অসুখের টিকিট দেখে বললে— "আপনি রাজশাহির উকিল রজনীবাবু?" আমি বললাম— "হাঁ"। ও বললে, "কোনও ভয় নাই। যত যা করতে হয় আমরা করছি।"—সেই যে আমার শুশ্রূষায় লেগে গেল—এ পর্যন্ত একভাবে।' রজনীকান্ত 'কটেজ' ভাড়া করিবার পরেও হেমেন্দ্রবাবু নিজের মেসে যাইতেন না। কেবল কলেজের সময় কলেজে যাইতেন, আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্তের নিকট থাকিতেন। তাহার আহারাদিও রজনীকান্তের কটেজেই হইত।

আমার নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে করে নিয়ে রয়েছ।

করুণাময় শ্রীহরি কান্তকবির এই বিপদের সময়ে—তাহার অপরিসীম ব্যথা ও বেদনার মাঝখানে বন্ধুরূপী হেমেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিলেন। ভগবৎপ্রেরিত হেমেন্দ্রনাথ রোগযন্ত্রণা-প্রপীড়িত কান্তকবির দেহ কোলে করিয়া লইলেন। এই দারুণ বিপৎকালে কান্তের ভাগ্যে যে বন্ধুলাভ ঘটিল, সেই বন্ধুই পরামর্শ দিয়া মেডিকেল কলেজের অধীন একটি কটেজ-গৃহে পরিবারসহ কান্তের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অস্ত্রচিকিৎসার তৃতীয় দিনে—১৩১৬ সালের ৩০ মাঘ শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০) তাঁহাকে খাটে করিয়া কটেজে লইয়া যাওয়া হয়।

মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হাসপাতালের দক্ষিণে ইডেন হাসপাতাল রোডের উপর তিনখানি সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ি নির্মিত হইয়াছে—এই

তিনখানি বাড়িই মেডিকেল কলেজের অন্তর্ভুক্ত 'কটেজ ওয়ার্ডস্'। তিনজন বদান্য মহাত্মা এই তিনখানি বাড়ি নির্মাণ করাইয়া দিয়া সাধারণ ভদ্রলোকের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

চারিটি পরিবার থাকিতে পারে, এইরূপ ভাবে প্রত্যেক বাড়িটিকে উপরে এবং নীচে সমান চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি অংশে তিনখানি শয়নগৃহ এবং রান্না ও ভঁড়ারের জন্য দুইখানি ঘর আছে। রুগ্ন ব্যক্তি অনায়াসে সপরিবার প্রতি অংশে বাস করিতে পারেন। দৈনিক ভাড়া উপরের অংশে সাড়ে-পাঁচ টাকা এবং নীচের অংশে সাড়ে-চার টাকা।

রজনীকান্ত ১২ নম্বর কটেজে থাকিতেন। এই কটেজেই সাতমাসকাল রোগ-শয্যায় থাকিয়া রজনীকান্ত প্রাণত্যাগ করেন।

রজনীকান্ত যে বাড়িটির নিম্নতলের একাংশে থাকিতেন—সেই বাড়িটি রায় বাহাদুর শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা কর্তৃক তাহার পিতা সুরজমল ঝুনঝুনওয়ালার স্মৃতিরক্ষার্থ নির্মিত হইয়াছে। যে সমস্ত রোগী কটেজ ওয়ার্ডসে বাস করেন, তাহারাও বিনাব্যয়ে মেডিকেল কলেজ হইতে চিকিৎসার সমস্ত সাহায্যই (ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি) পাইয়া থাকেন। কটেজের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠই দেখিতে সুন্দর এবং বৈদ্যুতিক আলো, পাখা ও রোগীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামে সজ্জিত।

২

কটেজে

চিরহাস্যময় কলকণ্ঠ কবির যন্ত্রণাদায়ক হাসপাতাল-জীবন আরম্ভ হইল। যিনি হাসিয়া হাসাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদাইয়া, কণ্ঠের সুমধুর সুরহিল্লোলে জনসাধারণের প্রাণে বিভিন্ন ভাববন্যার সৃষ্টি করিতেন, নবীন বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণের মতো যাঁহার কণ্ঠোত্থিত রসাত্মক বাক্য ও সংগীততরঙ্গ বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতাকে পুলকিত করিত— কাব্যকাননের সেই কলকণ্ঠ পিক আজ নীরব, মূক। প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইত, তবুও যাঁহার গান থামিত না, যাঁহার রসাল গল্প-শ্রবণে বন্ধুবর্গ আহারনিদ্রা ভুলিয়া যাইত, সেই অক্লান্ত ভাষণপটুর নির্বাক জীবন আরম্ভ হইল। তখন রজনীকান্তকে মনের ভাব লেখনী-সাহায্যে ব্যক্ত করিতে হইত। এই সম্বন্ধে

তিনি স্বয়ং ২ ফাল্গুন তারিখে হেমেন্দ্রনাথ বক্সি মহাশয়কে লেখেন—'তবু যা হোক, যে লোকটা "লেখা" আবিষ্কার করেছিল, তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। নইলে আমার দশা কি হ'ত। এই ইশারা বোঝে না, আর রেগেমেগে মারতে যাই আর কি! "লেখা"টা যেমন perfect তেমন কিছু হতে পারে না, কারণ ইশারাকে infinite না করলে infinite কি করে বুঝাতে? কিন্তু লেখাতে অসীমকে সসীমের মধ্যে এনে ফেলা গেছে।' ৬ ফাল্গুন রজনীকান্ত মুরারিমোহন বসু ও বিধুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী নামক কলেজের দুইটি ছাত্রকে "লেখা"র অসুবিধা বিষয়ে লেখেন—'আর সকল মনের কথাই কি লিখে প্রকাশ করা যায়? লেখাটা কি elaborate dilatory process। একজন একটা কথা বলে গেল, তার দশগুণ সময় লাগে তার উত্তর দিতে। আর সমস্ত দিন লিখতেই বা কত পারি?'

ঐ দিনই তাঁহার শুশ্রূষাকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বলেন,—'দেখ সুরেন, আমার কথা বলবার শক্তি নাই, সব লিখে দেখাতে হয়। কি ভয়ানক পরিশ্রম আর অসুবিধে। একজন একটা কথা বলে গেলে তার জবাব দিতে আমার লাগে ১০ মিনিট। লেখাটা ভয়ানক dilatory process কিনা।'

হাসাইয়া যাঁহার পরিচয়, কাঁদাইয়া তাহার শেষ জীবন আরম্ভ হইল।

বড় আদর করিয়া প্রাণের প্রবল আবেগে কবি তাঁহার দয়াল শ্রীহরির উদ্দেশে একদিন গাহিয়াছিলেন,—

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে।
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি
(অম্‌নি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।

ঠিক তাহারই চারি বৎসর পরে তাঁহার দয়াল শ্রীহরি দুঃখযন্ত্রণার স্তূপীকৃত ভারে তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিয়া, তাঁহারই মুখ দিয়া বলাইলেন,—

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে—
গর্ব্ব করিতে চুর।

প্রকৃতই দয়াল তাঁহাকে সকল রকমে কাঙাল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর চিরতরে নীরব হইয়াছে, জীবনরক্ষা হইলেও সে স্বর, সে ধ্বনি আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না। তিনি এখন সম্পূর্ণ বাক্‌শক্তিরহিত। যিনি 'মূকং করোতি বাচালম্‌' তিনিই রজনীকান্তকে—সেই কলকণ্ঠ, কলহাস্যপ্রিয়, সংগীতপটু রজনীকান্তকে— নীরব নির্বাক্‌ করিয়াছেন। জীবনরক্ষার আশাও তো

ক্রমে ক্ষীণতর হইতেছে, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। আর সেই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব রজনীকান্ত আজ রোগশয্যায় ঋণজালে জড়িত—মহাব্যয়সাধ্য চিকিৎসা, নিজের দেহে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় অবস্থান, বায়ুপরিবর্তনার্থ বিদেশে কটকে গমন, তাহার পর কালব্যাধির উপশমের জন্য কাশীতে অবস্থান প্রভৃতি নানাবিধ কারণে তিনি ঋণগ্রস্ত। কাশীপ্রবাসের সময় হইতেই তাঁহাকে পরের অর্থসাহায্য লইতে হইয়াছে। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় কাশীতেই রজনীকান্তকে প্রথম অর্থসাহায্য করেন, আর এই কটেজে অবস্থানকালে তাঁহাকে তো কুমারেরই মাসিক সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে। তাঁহার নিয়মিত সাহায্য ভিন্ন রজনীকান্তের তো কটেজে থাকাই হইত না। তাই বলিতেছিলাম, বাস্তবিকই হাসপাতালে রজনীকান্ত সকলরকমে কাঙাল হইতে বসিয়াছেন। ইহা ভক্তের উপর ভগবানের লীলা হইলেও—অতিশয় তাণ্ডবলীলা বলিয়া বোধ হয়।

মনে হয়, তাহার মতো খাঁটি সোনাকে উজ্জ্বলতর করিবার জন্য ব্যাধিরূপ অগ্নিতে ভগবান সম্পূর্ণ দগ্ধ করিয়া লইলেন। এই দারুণ উৎকট ব্যাধিতে কবি যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন সে যন্ত্রণা শুধু রোগযন্ত্রণা নহে—সে এক মহা মর্মান্তিক যন্ত্রণা—সে যন্ত্রণায় চিরহাস্যময় চিরমুখর সংগীতময় কবি নির্বাক্ ও মূক হইয়া সুদীর্ঘ সাতমাসকাল নীরবে কালযাপন করিয়াছিলেন। কণ্ঠের সুমধুর স্বরহিল্লোলে হাসির গান ও কবিতা আবৃত্তি করিতে এবং অন্তরের অন্তস্তল হইতে সরল প্রীতিপূর্ণ বাক্যরাজি উপহার দিতে যে কবি এই বিরাট কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সদানন্দ কবিকে নীরবে কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইল।

জানি না, ভগবান্। এ কেমন তোমার রীতি। এ কেমন তোমার দয়া—দুঃখের মাঝে না ফেলিয়া তুমি কি কাহাকেও নিজের কোলে লও না? জানি না, এটা দুঃখ কি সুখ? তবে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কালব্যাধির কথা যখনই মনে পড়ে, তখনই রজনীকান্তের এই নিদারুণ দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, দুঃখের ভিতরেও সুখ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে—মনে হয়, তোমার মঙ্গল-আশীর্বাদ, তোমার করুণার কোমল করস্পর্শ ঐ পীড়নের মধ্য দিয়াও পীড়িতকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে, তোমার শান্তির বিমলজ্যোতি তাহার মনপ্রাণ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। আমরা মূর্খ, মোহান্ধ জীব, শুধু দূরে দাঁড়াইয়া দুঃখটুকুই

দেখিতে পাই। তাই আমরা দেখিয়াও দেখি না, আমরা বুঝিয়াও বুঝি না—

শান্তিসুধা যে রেখেছ ভরিয়া
অশান্তি-ঘট ভরি।

সরলাবালা



জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ

রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। তিনি যখন উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, হাসপাতালে শয্যাগত, যখন কালব্যাধি তাঁহার দেহের উপর উত্তরোত্তর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাঁহাকে মরণের মুখে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, যখন তাঁহার জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে— তখন সেই শয্যাগত, মৃতকল্প, মুমূর্ষু পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। এই ঘটনা বিশেষ বিসদৃশ, যৎপরোনাস্তি অস্বাভাবিক এবং অতিশয় অশোভন বলিয়া বোধ হইবার কথা। বাস্তবিকই এ যেন সেই বাসরগৃহে 'শেষের সে দিন ভয়ংকর' গানের পালটা জবাব।

এই বিবাহব্যাপার বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে— রজনীকান্তের ধর্ম ও সামাজিক মতের আলোচনা করিতে হইবে। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী হইলেও, 'জজের উকিল'[১] হইলেও, 'conscience to him is a marketable thing, which he sells to the highest bidder' হইলেও, সব্‌জজের সন্তান হইলেও এবং বিদুষী পত্নীর স্বামী হইলেও—রজনীকান্ত বেশ একটু, 'সেকাল-ঘেঁষা' লোক ছিলেন। যাহাকে আজকালকার সভ্যভাষায় বলে 'স্থিতিশীল' বা 'রক্ষণশীল' ব্যক্তি —তিনি তাহাই ছিলেন। এই সনাতন সমাজের অনেক পুরানো প্রথা তিনি মানিতেন এবং সেইগুলি পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহা তাঁহার কুসংস্কার বলিতে হয় বলুন, তিনি উচ্চশিক্ষা পাইয়াও সুশিক্ষিত হন নাই বলিতে হয় বলুন বা তাঁহার বিবেকবুদ্ধি মার্জিত হয় নাই বলুন— তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু এ কথা সত্য যে রজনীকান্ত একটু 'সেকেলে' ধরনের লোক ছিলেন— সমাজ

১ 'উকিল'— কল্যাণী

সম্বন্ধে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁহার চিন্তার ধারা অনেকটা 'সেকেলে' লোকের মতো ছিল।

তাই তিনি হিন্দুর বিবাহকে একটা ছেলেখেলা, একটা আইনের চুক্তি— একটা দৈহিক যোটনা বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বেশ ভালোরূপেই জানিতেন—

এ নহে দৈহিক ক্রিয়া, চিরবিনশ্বর
বিলাসলালসা তৃপ্তি, এ নহে ক্ষণিক
মোহের বিজলিপ্রভা, নহে কভু সুখ-
দুঃখময় দু দিনের হরষ ক্রন্দন—
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয়।

কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুর বিবাহ 'গৃহীর ব্রহ্মচর্য,' 'সচ্চিদানন্দলাভের সোপান,'— 'এ মিলন লয়ে যাবে সেই মিলনের মাঝ'। ইহাই তাহার একটি 'সেকেলে' ভাব।

তাহার পর পুত্রের বিবাহ দেওয়া যে পিতার একটি প্রধান কর্তব্য, ইহাও তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। তিনি এই সংসারকে 'আনন্দবাজার' বা সুখের হাট মনে করিতেন। অসহ্য রোগযন্ত্রণায় যখন তিনি কাতর, সাত মাস শয্যাগত, সেই দারুণ জ্বালা, সেই অসহ্য কষ্ট সেই তীব্র যাতনায় যখন তিনি মুমূর্ষু, দীর্ঘ অনাহার ও অনিদ্রায় জর্জরীভূত, তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ তখনও তিনি বার বার প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ 'সুখের হাট' ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ চাহে না— ইচ্ছা হয় না। এই সুখের হাট, এই সৌন্দর্যের মেলা বুঝাইতে হইলে পুত্রকে সংসারী করিতে হইবে, তাহাকে দারপরিগ্রহ করাইতে হইবে, তবে তো সে সংসার চিনিবে, সমাজ চিনিবার সুযোগ পাইবে, গৃহস্থ হইবে, আর গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইবে এবং পিতৃপুরুষগণকে ধন্য করিবে। তিনি অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করিতেন, শুধু পুত্রের প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্য পিতা দায়ী নহেন— পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই পিতার কর্তব্যের সমাপ্তি হয় না— যাহাতে পুত্র সংসারী হইয়া বংশের বিশেষত্ব, বংশের ধারা, পিতৃ-পিতামহের কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সেই বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা ও সাহায্য দান করাও পিতার অন্যতর প্রধান কর্তব্য— মহাধর্ম। ইহা না করিতে পারিলে পিতার জীবনই বৃথা। ইহাই তাঁহার আর একটি 'সেকেলে' ভাব।

আর তিনি বাল্যবিবাহের একটু পক্ষপাতী ছিলেন— তা ছেলে উপার্জনক্ষম হউক বা না হউক। ভাবটা এই— বিবাহিত না হইলে নিজের কর্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ব

—ফুটিয়া উঠে না, যেন কেমন উড়ো-উড়ো ভাব, কেমন ভবঘুরে ধরন— 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে'। এও তাঁহার একটা পূতিগন্ধময়ী পৌরাণিকী ধারণা। আধুনিক অনূঢ় যুবক নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, 'ঘোর কুসংস্কার। ভয়ানক অন্ধ বিশ্বাস। যে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করে, সে মহামূর্খ, আর তাকে সেই মূর্খতার ফল ও পরিণামে ভোগ করিতে হয়।' প্রাচীন বহুদর্শী বৃদ্ধ উত্তরে বলিবেন— 'কেন বাপু, তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই তো বলেন, তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতাই তো শিক্ষা দেয় যে, অষ্টপ্রহর—অনবরত অভাব বাড়াইবার চেষ্টা কর, **try to create, to increase your wants**, তবে সেই অভাব দূর করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইবে, চেষ্টা হইবে— নতুবা তুমি আরও অলস, অসাড়, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে, উদ্যমহীন হইবে, উৎসাহবর্জিত হইবে জীবনে স্ফূর্তি পাইবে না।' তাই রজনীকান্তের ধারণা ছিল, বিবাহিত জীবনে দায়িত্বজ্ঞান অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়, পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি কর্তব্য বিবাহিত ব্যক্তির চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে— সে তখন উৎসাহভরে, হাসিমুখে সেই সকল কর্তব্যসম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ইহাও তাহার আর একটি 'সেকেলে' ভাব।

তাই রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্র আই এ পরীক্ষা দিবার পরেই তিনি পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। রাজশাহির প্রসিদ্ধ জমিদার, তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহাস্পদ সুহৃদ যাদবগোবিন্দ সেনের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। তখন রজনীকান্ত রাজশাহিতে ওকালতি করিতেছেন, তখনও তাহার কালরোগের সূত্রপাত হয় নাই। কিন্তু কালের গতি বুঝা দায়— তাহার পর নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, কিন্তু তবুও তাঁহার পরিত্রাণ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। **Misfortune never comes single but in battalions**— দুর্ভাগ্য কখনো একাকী আসে না, দলবদ্ধ হইয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া আসে। ক্রমে কালরোগের সূচনা, বৃদ্ধি, কলিকাতায় আগমন ও কাশীযাত্রা। কাজেই পুত্রের বিবাহের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল।

যখন তিনি কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উৎকট ব্যাধিতে যখন তিনি পূর্ণমাত্রায় আক্রান্ত, মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন তিনি তাঁহার কোনও আত্মীয়ের একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। তিনি লিখিতেছেন, যাদববাবু বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন তাঁহার তৃতীয়া কন্যা গিরীন্দ্র-

মোহিনী চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। যাদববাবুর একান্ত ইচ্ছা, শ্রীমান শচীনের সহিতই সত্বর তাহার বিবাহ হয়। রজনীকান্ত তাঁহার স্নেহাস্পদ সুহৃদের অবস্থা অনুভব করিলেন এবং সেই দিনই টেলিগ্রামে উত্তর দিলেন যে, তিনি সে বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন, কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিবেন।

জীবনমরণের সন্ধিস্থলে রজনীকান্ত কলিকাতায় ফিরিলেন, গলায় অস্ত্র করা হইল, কটেজে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, পরানুগ্রহে সেবা, শুশ্রূষা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা চলিতে লাগিল চিকিৎসক, পরিবার ও বন্ধুবর্গ অসাধ্যসাধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রজনীকান্ত বেশ বুঝিলেন যে, কিছুতেই কিছু হইবে না, এ যে 'ভগবানের টান'—কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, জগতের আলো ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, আর অন্ধকার ঘনায়মান হইতেছে। তাই তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আর তো কালক্ষেপের অবসর নাই—জীবনের কর্তব্য বুঝি সম্পন্ন হয় না, শচীনকে বুঝি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারি না। এই সব চিন্তায় তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি ভাবিলেন—শীর্ণা, সেবাপরায়ণা, দুশ্চিন্তাভারাক্রান্তা, শুশ্রূষাকারিণী পত্নীর একটি 'দোসর' জুটাইয়া দিই, নববধূর সাহায্যে যদি পতিপ্রাণা একটু আসান পান, আর হয়তো পুত্রবধূর শুভাগমনে—লক্ষ্মীর আবির্ভাবে তাঁহার অমঙ্গলও দূর হইবে। এই সব কথা ভালো করিয়া বুঝিলে, রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহব্যাপার অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই উপলব্ধি হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, রজনীকান্ত আদর্শ জনক, কর্তব্যপরায়ণ পিতা—যমযন্ত্রণার মধ্যেও, মুমূর্ষু অবস্থাতেও তিনি তাঁহার লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হন নাই। তিনি ধন্য।

১৯৩ নম্বর বহুবাজার স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া লওয়া হইল, ১৬ ফাল্গুন শ্রীমান শচীন্দ্রের বিবাহ। স্থির হইল, রজনীকান্তের স্ত্রী ও দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞান রাজশাহি যাইবেন। শচীন তখন রাজশাহির বাটীতেই থাকিত। বিবাহের পর তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বহুবাজারের বাসায় উঠিবেন। স্ত্রীকে রাজশাহি যাইবার জন্য রজনীকান্ত বিশেষ পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না, পতিপ্রাণা সাধ্বী কিরূপে মৃতকল্প স্বামীকে ছাড়িয়া যাইবেন? জ্ঞানও মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিলেন না। ফলে তাঁহারা উভয়েই রাজশাহি গেলেন না।

রজনীকান্তকে বহুবাজারের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। ১৬ তারিখেই শ্রীমান শচীন্দ্রের বিবাহ হইল, শচীন বিবাহের পর দিনই নববধূ লইয়া কলিকাতায় পুনরাগমন করিলেন। এত দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও পরিবারমধ্যে আনন্দের ক্ষীণ রেখাপাত হইল। মুমূর্ষু রজনীকান্তের মনে একটু প্রফুল্লভাব পরিলক্ষিত হইল-- যেন মহা-দায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। তিনি রোজনামচায় লিখিয়াছেন: 'ছেলের বিয়ে দিয়ে একটু হাত নাড়বার জো হয়েছে।'

রজনীকান্ত কিন্তু পুনরায় কটেজে ফিরিয়া যাইতে চাহেন না— একেবারে অসম্মত। তিনি বলিলেন যে, কুমার শরৎকুমার যে অর্থসাহায্য করিতেছেন, তাহাতে আর কটেজে থাকা চলে না— সেই সাহায্যে তিনি বরং অধিকতর সচ্ছলভাবে বাসায় থাকিতে পারিবেন। কিন্তু চিকিৎসকগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না -বাসায় তাঁহার চিকিৎসা ও সেবার ত্রুটি হইবে। কিন্তু তবুও তিনি কটেজে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন, শেষে কুমার শরৎকুমারের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয্যে ২৪ ফাল্গুন তাহাকে কটেজে যাইতে হইল। কুমার মাসিক সাহায্য বাড়াইয়া দিলেন।

পুত্রবধূ লাভ করিয়া রজনীকান্তের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল — মনে হইল, এই কল্যাণীর কল্যাণে তাঁহার আনন্দের ভাঙা হাট আবার জোড়া লাগিবে— বুঝি কল্যাণীর পদ্মহস্ত তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিবে। তাই রজনীকান্ত তাহার শয্যাপার্শ্বোপবিষ্টা, লাজনম্রা, সাক্ষাৎ সাবিত্রীরূপিণী, শুশ্রূষাকারিণী পুত্র-বধূকে লক্ষ্য করিয়া রোজনামচায় লিখিলেন: 'তুমি লক্ষ্মী, ঘরে এয়েছ,— তোমার পুণ্যে যদি বাঁচি। যত সুন্দরী বউ দেখি — তোমার মতো ঠাণ্ডা, তোমার মতো লজ্জাশীলা, তোমার মতো বাধ্য কেউ না। শাদা চামড়ায় সুন্দর করে না— স্বভাবে সুন্দর করে। যে তোমাকে দেখে, সে-ই তোমার প্রশংসা করে। এমনি প্রশংসা যেন চিরদিন থাকে। ভালো করে তোলো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো সেরে উঠি।' কিন্তু বালিকার কোমল হস্ত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই— বালিকার সকল প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল।

বিবাহের পরেই বন্ধুবান্ধবে, আত্মীয়স্বজনে কানাঘুষা করিতে লাগিলেন, রজনীকান্ত নাকি পুত্রের বিবাহে 'পণ' লইয়াছেন। ক্রমে সংবাদটা সংবাদপত্রের সম্পাদকের ও সমাজ-সমালোচকের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা তো একটু হুজুগ পাইলেই হয়— তাহারা অমনি লেখনীচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রজনীকান্তই না 'বরের দর', 'বেহায়া বেহাই' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক পদ্য লিখিয়াছিলেন?—

এই রজনীকান্তই না পণগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজ-শাসকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন? এই রজনীকান্তই না পণগ্রহণকারী পুত্রের পিতার পৃষ্ঠে মিষ্ট মধুর চাবুক চালাইয়াছিলেন? এখন বুঝা গেল, রজনীকান্তের মুখে এক আর কাজে আর! এমন লোক বাংলার কলঙ্ক! রজনীকান্তের আচরণে সম্পাদক স্তম্ভিত, 'বাঙালি' বিস্মিত।

আমরা সাহিত্যসম্রাটের ভাষায় বলি—'ধীরে রজনি। ধীরে!'—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়াই পুরুষার্থ নয়। হাঁ, এই রজনীকান্তই পণপ্রথা লক্ষ্য করিয়া তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন—আর সে কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। তিনিই পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বৈবাহিক যাদববাবুর নিকট হইতে ১০০০ টাকা লইয়াছিলেন,—এ কথাও সত্য। কিন্তু সে পণ নয়, সে দান, সে জুলুম-জবরদস্তি নয়—বেহায়ের বুকে বাঁশ নয়—সে ধনী, বিত্তশালী বৈবাহিকের অযাচিত, অপ্রার্থিত, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাহায্য—যিনি মনে করিলে অনায়াসে অক্লেশে, অকাতরে সহস্র কেন শত সহস্র প্রদান করিতে পারিতেন। রজনীকান্ত স্বয়ং তাহার বৈবাহিককে কি লিখিয়াছিলেন পড়ুন—

'দেখ, একটা কথা বলি। আমার এই বাংলাদেশে যেটুকু সামান্য পরিচয় তা আমি ছেলের বিয়েতে টাকা নিয়ে প্রায় নষ্ট করেছি। শিক্ষিত সম্প্রদায় বলেছে—রজনীবাবু মুখ হাসিয়েছেন, তা আমি না শুনতে পাচ্ছি এমন নয়। তবে আমি যে আজ এগারো মাস জীবনমৃত্যুর সংগ্রামে পড়ে ঘোর বিপদ-সাগরে ভাসছি,—তা তোমার না জানা আছে তা নয়—নইলে টাকা নিতাম কিনা সন্দেহ।'

এই কৈফিয়তেও যদি আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় সন্তুষ্ট না হন, যদি আমাদের বিচক্ষণ সম্পাদকগণ শিরঃসঞ্চালনপূর্বক গম্ভীর ভাবে বলেন—'তা তো বটে, তবু কাজটা ভালো হয় নাই'—তাহা হইলে সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, সেই বিজ্ঞ সমালোচককে আমরা অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিব, 'আচ্ছা, বুকে হাত দিয়া বলুন তো দাদারা, ঘটনাচক্রে, অবস্থাবিপর্যয়ে, গ্রহবৈগুণ্যে, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সকলকেই নিজ নিজ মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয় কি না? আপনি আমি, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, কবি অকবি, কুলগৌরব কুলাঙ্গার—এমনকি যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ—কাহারো চরিত্রে কি ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছেন?' তবে এ অনর্থক দোষারোপ কেন? মানব তো মানবের মালিক নয়, আমরা তো আমাদের কর্তা নই যে, যাহা মনে করিব

তাহাই করিব, আর যাহা করিব না মনে করিব তাহাই অকৃত থাকিবে। আমরা যে নেহাৎ অবস্থার দাস : 'তোমার কাজ তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি'।

হে শিক্ষিত সম্প্রদায়! জিন ভাল্‌জিনের (Jean Valjean) সেই পাউরুটি অপহরণের চিত্র মনে পড়ে কি? সেই— 'The family had no bread. No bread—literally none—and seven children—সেই করুণ দৃশ্য মনে করুন, আর সঙ্গে সঙ্গে মানসনেত্রে একবার হাসপাতালে রজনীকান্তের রোগ-শয্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সেই একাদশমাসব্যাপী জীবনমরণের মহাসংগ্রাম, সেই যমে মানুষের ভীষণ টানাটানি, সেই আপাদমস্তক ঋণজাল, সেই পরান্ন-গৃহীত শতধাবিচ্ছিন্ন মরণোন্মুখ জীবন, সেই অশীতিপর বৃদ্ধা জননীর ক্রন্দন-কাতর মলিনমুখ, সেই শীর্ণ, কঙ্কালসার সহধর্মিণীর সদা সশঙ্কভাব—আর সর্বোপরি সাতটি সন্তানের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখশ্রী—সেই সব একে একে স্মরণ করুন, তবুও যদি বলেন যে, না—কাজটা ভাল হয় নাই, তবে আমরা পুনরায় ভিক্টর হুগোর উক্তি স্মরণ করাইয়া দিব, বলিব,— 'Whatever the crime he had committed, he had done it to feed and clothe seven little children.'

৪

হর্ষে বিষাদ ভগিনীপতির মৃত্যু

জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রের বিবাহ-উপলক্ষে রজনীকান্ত তাঁহার প্রায় সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। এই কালব্যাধির কবাল কবল হইতে তাঁহার উদ্ধারের আর আশা নাই—ইহা স্থির জানিয়া তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, কাজেই বাধ্য হইয়া রজনীকান্তকে এই বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাদের সকলকে আহ্বান করিয়া কলিকাতায় আনিতে হইয়াছিল। তাঁহার সহোদরা ক্ষীরোদবাসিনীও কলিকাতায় আগমন করেন। বিবাহের সাত দিন পরে রজনীকান্ত পুনরায় কটেজে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আত্মীয়কুটুম্বগণ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন, কেবল ক্ষীরোদবাসিনী ও কবির জ্যেষ্ঠতাতপত্নী রাধারমণী দেবী কলিকাতায় রহিলেন।

কটেজে ফিরিবার কয়েক দিন পরেই রজনীকান্তের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পায়। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভগিনীপতি রোহিণীকান্ত দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি পূর্ব হইতেই আমাশয়-রোগে ভুগিতেছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হইল যে, সুচিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজে আশ্রয় না লইলে আর চলিল না। একটি ঘর (কেবিন) ভাড়া করিয়া তাঁহাকে তথায় রাখা হইল। প্রায় দুই মাস কাল হাসপাতালে থাকিবার পর তিনি কঠিন আমাশয়-রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে কিন্তু হাসপাতাল ত্যাগ করিবার চারি-পাঁচ দিন পরেই তিনি জ্বরে পড়িলেন এবং সেই জ্বর পরিশেষে ডবল নিউমোনিয়া রোগে দাঁড়াইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে আবার হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, কিন্তু চিকিৎসায় এবার আর কোনও উপকার হইল না। ৮ জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটার সময়ে অনন্যসন্তানবতী বৃদ্ধা জননী, পতিগতপ্রাণা সাধ্বী পত্নী, অশীতিবর্ষীয়া শ্বশ্রূ, মুমূর্ষু শ্যালক এবং অসহায় পুত্র-কন্যাগণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া তিনি পরলোকে গমন করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ-উৎসবে আনন্দ করিতে আসিয়া রজনীকান্তের একমাত্র ভগিনী বিধবা হইলেন— এই দুর্ঘটনা কবির বুকের মধ্যে নিদারুণ শেলাঘাত করিল। কবি বুঝিলেন, এইবার তাঁহারও ডাক পড়িবে। পরদিন তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইল: 'কাল রাত্রিতে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়ে গেল। আমার ভগিনী বিধবা হল। আমার মার বয়স আশি বছর। এখন আমার পালা।'

হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর খুয়াইয়া সেই বিষাদপ্রতিমা যখন কটেজে আসিলেন, তখন রজনীকান্ত কম্পিত হস্তে লিখিলেন: 'আমার যে অবস্থা তাতে আমার মনে হয়, এ শরীরে ওকে দেখে বুঝি সহ্য করতে পারবে না। উত্তেজনা বোধ করিলেই গলা বেদনা করে। নির্দোষ পুণ্যবতী বালিকা, আমার পিঠের বোন, ওর সব সুখ গেল। মনে হলে আমার দুর্বল শরীর কেঁপে কেঁপে উঠে। আমি বসে বসে দেখি— একটু মাছ হলে ও এতটি ভাত খায়, চিরজীবনের জন্য সে মাছ উঠে গেল। এ তো মনে করতেই আমার বুক কেঁপে উঠে।'

রজনীকান্তের বৃদ্ধা জননী এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় অসহ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যে দিবারাত্র ছটফট করিতেছে— অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ইহাতেও সমাপ্ত হইল না— নিষ্ঠুর কাল একমাত্র প্রাণপ্রিয় জামাতাকে চোখের সামনে আচম্বিতে কাড়িয়া লইয়া গেল।

পতিহারা ক্ষীরোদবাসিনী দেশে যাইবার পূর্বে যখন রজনীকান্তকে প্রণাম করিতে গেলেন, তখন রজনীকান্ত ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন—'ক্ষীরো, তুই তো চললি কিন্তু আমাকে চিতার আগুনে তুলে রেখে গেলি। রোহিণীর শোক আমার মরবার দিন অনেকটা এগিয়ে এনেছে। ভগবান শীঘ্রই তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবেন। নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও পুত্রের বিবাহ দিয়া, সাক্ষাৎ সাবিত্রীসম পুত্রবধূ লাভ করিয়া এবং আত্মীয়স্বজনগণের সন্দর্শনে রজনীকান্ত একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন, রোহিণীকান্তকে অকালে কাড়িয়া লইয়া সমস্ত আনন্দকে চিরতমসায় আবৃত করিয়া দিলেন।

লীলাময়ের এই রহস্যময় প্রাণঘাতী লীলা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে, দুরু দুরু করিয়া বুক কাঁপিতে থাকে। যাহাকে তিনি আপনার করিয়া কোলের কাছে অল্পে অল্পে টানিয়া লন, উপর্যুপরি আঘাতের দ্বারা তাহাকে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তাহার সংসারমায়াপাশ এই ভাবেই ছিন্ন করেন। সাংসারিক যাবতীয় সুখ ও শান্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করিয়া মর্মন্তুদ রোগযন্ত্রণার আগুনে পুড়াইয়া— পরমাত্মীয়ের অসহনীয় বিয়োগবেদনায় ব্যথিত করিয়া, শ্রীভগবান রজনীকান্তের সংসারাসক্তিকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী করিতেছেন— ইহা বুঝিয়া আমাদিগকে অশ্রুসংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৫

কালরোগের ক্রমবৃদ্ধি

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রজনীকান্তের গলদেশে দুরারোগ্য ক্যানসার-ক্ষত হইয়াছিল। এই ক্যান্সার-ক্ষত তাঁহার গলদেশের কোন স্থান আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে মরণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহা একটু বিশদভাবে এখানে বলা আবশ্যক।

আমাদের গলদেশে দুইটি নালী আছে, একটি শ্বাসনালী, অপরটি অন্ননালী। প্রথমটির দ্বারা আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে আমাদের ভুক্তদ্রব্যসমূহ পাকস্থলীতে গিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের গলদেশের সম্মুখভাগে শ্বাসনালী এবং ঠিক তাহার পশ্চাতে অন্ননালী অবস্থিত। শ্বাসনালী তিন অংশে

বিভক্ত, উপরের অংশকে 'ল্যারিংস' মধ্যের অংশকে 'ট্র্যাকিয়া' এবং নীচের অংশকে 'ব্রঙ্কাস' বলে। 'ল্যারিংসে' 'ভোকাল্ কর্ডস' নামে এক জোড়া যন্ত্র আছে, ইহাদের সাহায্যে আমরা কথা কহি।

রজনীকান্তের ল্যারিংসে ক্যানসার হওয়ায় সেই স্থানটি ফুলিয়া উঠে, তাহার ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে তাহার খুবই কষ্ট হইত। ক্রমে ক্রমে এই ক্যানসার যখন প্রবলাকার ধারণ করিয়া রজনীকান্তের শ্বাসপ্রশ্বাস-চলাচলের পথটিকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করে, সেই সংকট সময়ে তাহার শ্বাসনালীর 'ট্র্যাকিয়া' অংশে 'ট্র্যাকিওটমি' অস্ত্রোপচার করা হয়। এই অস্ত্রোপচার দ্বারা তাহার শ্বাসনালীর 'ট্র্যাকিয়া অংশে যে ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়, তাহার সাহায্যে রজনীকান্ত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে রজনীকান্ত লিখিয়াছেন : 'যখন operation table-এ শুইয়ে আমার গলায় ছাঁদা করে দেওয়া হল ও নিশ্বাস ঝড়ের মতো গলা দিয়ে বেরুল, তখন মনে হল যে দয়াময় বুঝি নিজ হাতে নিশ্বাসের কষ্ট ভাল করে দিলেন। অস্ত্র করাতে আমি বেশি ব্যথা পাই নাই, কিন্তু বড়ো ভয় হয়েছিল। আমার তিন দিন তিন রাত্রি ঘুম ছিল না, ঐ অস্ত্র করা হলে হাসপাতালে এলাম, আর সমস্ত দিন ঘুম।'

এই অস্ত্রোপচার দ্বারা রজনীকান্তকে আশু মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আসল রোগের কোনও প্রতিকার হইল না। রজনীকান্তের গলদেশের যে স্থানে অস্ত্র করা হইল, তাহার উপরিভাগে ল্যারিংসের চারিধারে ক্ষত অল্পে অল্পে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এ সম্বন্ধে রজনীকান্ত লিখিয়াছেন : 'নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছিলাম, গলায় একটা ছিদ্র করে দিয়েছে। সেইখান দিয়ে নিশ্বাস চলছে। গলার ক্যানসার যেমন, তেমনি গলার মধ্যে বসে রয়েছে। তার তো কোনও চিকিৎসাই হচ্ছে না।' কথাটা খুবই ঠিক, আর চিকিৎসকগণও অস্ত্র করিবার সময়ে এই কথার সমর্থনে বলিয়াছিলেন : অস্ত্র করিয়া কিছুদিন জীবনরক্ষা করা হইবে মাত্র। আসল রোগের প্রতিকার কিছুই হইবে না।' তাঁহাদের মতে— The treatment would be simply palliative'।

হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রজনীকান্ত সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক মেজর বার্ড সাহেবের অধীনে রহিলেন। জ্বর কমাইবার জন্য ঔষধ ও ব্যথা কমাইবার জন্য গলার উপর প্রলেপ দেওয়া হইল, কিন্তু ক্ষতচিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা হইল না।

অস্ত্রোপচারের কয়েক দিন পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় কটেজে রজনীকান্তকে দেখিতে আসিলেন। কৃতজ্ঞ রজনীকান্ত তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন— 'সেদিন আপনি তো আমার মায়ের কাজ করেছিলেন। আপনি না থাকলে, আমি তখনই ঐ বাড়িতে মরতাম। আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি— সে কেবল আপনার কৃপায়। আপনি উৎসাহ দিলেন, কোনও ভয় নাই জানালেন, তাই আমি মেডিকেল কলেজে আসতে পেরেছিলাম।

কটেজগুলির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মথুরামোহন ভট্টাচার্য ও গিরিশচন্দ্র মৈত্র মহাশয় প্রতিদিনই রজনীবাবুর তত্ত্বাবধান করিতেন, তা ছাড়া স্বয়ং বার্ড সাহেব এবং ডাক্তার সার্ওয়ার্দি অন্যান্য চিকিৎসকগণের সহিত রজনীকান্তকে দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু হেমেন্দ্রবাবুর সেবা, শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানে রজনীকান্ত ও তাঁহার পরিজনবর্গ বিশেষ ভরসা পাইতেন। মাঝে মাঝে হেমেন্দ্রবাবুর সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত বিজিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এ বিষয়ে এই বিপন্ন পরিবারকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। কবি তাঁহার রোজনামচার একস্থলে বিজিতেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: '...this boy is named Bijitendra Nath Bose, a fourth year medical student, a Barisal man, knows me and is doing all possible nursing. He is an acquisition sent by God'।

অস্ত্রোপচারের পর রজনীকান্ত দুর্বল হইয়া পড়েন, অল্প জ্বরও দেখা দেয়। ৭।৮ দিন পরে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করেন, সেই সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীনের বিবাহের দিন স্থির করিয়া ১৬ ফাল্গুন তাঁহার বিবাহ দেন। রজনীকান্তের গলদেশে অস্ত্রোপচারের ষোল দিন পরে এই শুভকার্য সমাধা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রজনীকান্তকে কয়েকদিনের জন্য কটেজ ত্যাগ করিতে হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পুত্রের বিবাহ দিয়া রজনীকান্ত পুনরায় ২৪ ফাল্গুন কটেজে ফিরিয়া আসেন, এবং ঐ দিন হইতে মৃত্যুসময় পর্যন্ত তিনি কটেজে ছিলেন।

অস্ত্রোপচারের পর হইতে আহারগ্রহণে তাঁহার কষ্ট হইত। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত, এ অবস্থায় বেশির ভাগই তাঁহাকে তরল খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন— 'পরশু কি তার আগের দিন ভাত ঠেকে একেবারে অজ্ঞানের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। এমনি করে একদিন হয়ে যাবে। ক্রমে দুধও বাধবে।'

পুত্রের বিবাহ দিয়া কটেজে ফিরিবার পর হইতে রজনীকান্তের রোগ বৃদ্ধি

পাইতে থাকে। একদিকে তাহার আহার করিবার শক্তি কমিতে লাগিল, অপর দিকে তাহার নিদ্রাও কমিয়া আসিল। এই সময়ে গলার বেদনা বেশি হইলে তিনি ভাত, রুটি প্রভৃতি মোটেই খাইতে পারিতেন না, খাইবার চেষ্টা করিলে কণ্ঠনালীতে বাধিয়া সমস্ত ভুক্তদ্রব্য নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। সাধারণ আহার্য গলাধঃকরণ করা যখন অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তিনি তরল খাদ্যদ্রব্য— দুধ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এই তরল খাদ্যও নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়িত।

রজনীকান্তের গলদেশে ছিদ্রমুখে শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের জন্য যে রবারের নল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, গলার ভিতর হইতে শ্লেষ্মা ও রক্তের ডেলা আসিয়া মাঝে মাঝে সেই ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিত। তখন শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইত, এবং রজনীকান্তের প্রাণও সেই সঙ্গে হাঁফাইয়া উঠিত। এই জন্য প্রথম প্রথম দিনে দুইবার এবং শেষাশেষি দিনে তিন চারিবার করিয়া নল বদলাইয়া দেওয়া হইত। এই নল বদলাইয়া দিবার জন্য হেমেন্দ্রবাবুকে অধিকাংশ সময় কটেজে থাকিতে হইত। তিনি না থাকিলে কবির মধ্যম পুত্র জ্ঞানও নল বদলাইয়া দিত।

বহুবাজারের বাসায় থাকিবার সময় একদিন টিকটি জমাট বাঁধা রক্তের ডেলা নলের মুখে আটকাইয়া গিয়া রজনীকান্তের জীবনকে বিশেষ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তখন জ্ঞান ও হেমেন্দ্রবাবু কেহই বাসায় ছিলেন না, নল বদলাইয়া দিবার জন্য কাহাকেও কাছে না পাইয়া দারুণ যাতনায় দুর্বল শরীরে রজনীকান্ত একজন সহচর-সমভিব্যাহারে হাসপাতালের অভিমুখে কম্পিত চরণে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। দুর্বল শরীর লইয়া তাঁহাকে পুনরায় বাসায় ফিরিতে হইল। প্রাণ যায়। তখন অগত্যা রজনীকান্তের পতিগত-প্রাণা সাধ্বী পত্নী, অতি সাবধানে পুরাতন নলটি খুলিয়া লইয়া একটি নূতন নল ছিদ্রপথে পরাইয়া দিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিলেন। রজনীকান্ত এই সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছেন : 'আজ সকালে tube-এর মধ্যে blood-clot আটকে প্রাণ যাবার মতো হয়েছিল। আমার wife সাহস করে tube খুলে নূতন tube পরিয়ে দিলে তবে বাঁচি। সে blood-clot যদি দেখ তবে অবাক হবে। একেবারে tube-এর মুখ block করে দিয়ে বসে থাকে।' এই জমাট-বাঁধা রক্তের ডেলা মাঝে মাঝে রজনীকান্তের জীবন বিপন্ন করিত। আর একদিনের ঘটনার সম্বন্ধে রজনীকান্ত লিখিয়াছেন— 'একটা বড় clot এসে বেধে গেল, তা নল দিয়ে কি

গলার ছিদ্র দিয়ে বাহির হওয়া অসম্ভব, কাশতে কাশতে হয়রান হয়ে গেলাম। হেমেন্দ্র এসে forcep দিয়ে টেনে বের করলে তবে বাঁচি।'

ঢোঁক গিলিতে রজনীকান্তের খুব কষ্ট হইত। সময়ে সময়ে কাশি এত বেশি হইত, যে সারারাত্রিই তাঁহাকে কাশিয়া কাশিয়া কাটাইতে হইত। আর এই কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলার বেদনা খুব বাড়িয়া উঠিত। সময়ে সময়ে এই কাশির ফলে তাঁহার গলদেশের ছিদ্র দিয়া অনর্গল রক্ত বাহির হইতে থাকিত।

রাত্রিতে রোগের যন্ত্রণা এত বাড়িত যে, মোটেই তাঁহার ঘুম হইত না। এই জন্য তাঁহাকে রাত্রিতে ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে হেরোইন (আফিং হইতে তৈরি ঔষধ) ইনজেকশন দেওয়া হইত, তাহার পর যখন ইহাতে কোনও কাজ হইত না অর্থাৎ নেশায় ঘুম আসিত না, তখন মরফিয়ার ইনজেকশন দেওয়া হইত। এই ইনজেকশন দেওয়ার পর প্রথম প্রথম রজনীকান্তের বেশ ঘুম হইত। কিন্তু শেষে ইহাও বিফল হইত, তখন তিনি নানাপ্রকার আলাপ ও গল্প লিখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এই ইনজেকশন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'হাইপোডারমিক পিচকারি দিয়ে হেরোইন inject করে না দিলে সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে নৃত্য করে বেড়াই।'

এই ইনজেকশন ক্রমে তাঁহার দেহের উপর নেশার মতো প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমত দিনে একবার করিয়া ইনজেকশন দেওয়া হইত, তাহার পর দুই বার করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও রজনীকান্তের মন উঠিত না, তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। তিন-চারি ঘণ্টা অন্তর ইনজেকশন দিবার জন্য তিনি পিড়াপিড়ি করিতেন। তিনি বলিতেন—'মনে হয় যে সমস্ত দিন পিচকারি দিয়ে মড়ার মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি injection দিতে চায় না। আরে পাগল, মাসখানেক থেকে ঐ হচ্ছে। আমার কি একটা মৌতাত হয় না? সেই মৌতাতি মানুষের আফিমটুকু কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করতে চাও?'

২৭ ফাল্গুন তারিখে তিনি লিখিলেন: 'আমার আজকার অবস্থা ও কালকার অবস্থা খুব নিরাশার। সব খারাপ লাগছে। খেতে ওবেলাও পারি নাই, এবেলাও বড়ো কষ্ট ক'রে খেয়েছি। আমার বোধ হয়, আহারের সমস্ত আয়োজন সম্মুখে নিয়ে আমি অনাহারে মরব।' তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল—বাস্তবিকই তিনি আহার্যসামগ্রী সম্মুখে রাখিয়া অনাহারে মারা গিয়াছিলেন।

একদিন রজনীকান্তের গলার ছিদ্র দিয়া খুব বেশি রক্তপাত হয়। তাঁহার

পত্নী, বৃদ্ধা জননী ও পুত্রকন্যাগণ এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া খুবই ভীত হন। রজনীকান্ত তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলেন—'এরা বলে যে, একদিন bleeding হয়ে বাসা ভেসে যাবে। সেই দিন ভয় কোরো না, blood stop কোরো না; দুই-তিন দিন ধরে এই রকম bleeding হবে সমানে।'

এই রক্তপাত, জ্বর, কাশি, গলার বেদনা ও ফুলা, আহারে কষ্ট, অনিদ্রা প্রভৃতি যুগপৎ মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে টানিতেছিল।

ফাল্গুন মাসের শেষ বা চৈত্রের প্রথম হইতেই ডাক্তার বার্ড সাহেব রজনী-কান্তের একস-রে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ইহা প্রথমে গলার বাহিরে দেওয়া হইত, পরে গলার ভিতরেও দেওয়া হয়। ডাঃ ই. পি. কোনর ও তাঁহার একজন সহকারী এই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এই একস-রে চিকিৎসার প্রণালী রজনীকান্তের কথায় বলিতেছি 'X-ray treatment আজ সকালে আরম্ভ হয়েছে। একখানা খাটে চিৎ করে শোয়ায়, পিঠের নীচে বালিশ দেয়। মাথাটা বিছানার উপরেই নিচু হয়ে পড়ে—ঠিক ঝোলার মতো। গলাটা stretched হয়। তারই উপর একটা বাক্স ঝুলছে, সেই বাক্সের তলায় ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে এসে ray গলার উপর পড়ে। Connor সাহেব সেই না কি এর specialist। সেই আলো এসে গলায় লাগে, তা টের পাওয়া যায় না।'

প্রথমে তিনি এই একস রে গলার ভিতরে দিতে চান নাই। তিনি লিখিয়া-ছিলেন,—'যদি গলার মধ্যে X-ray দেয়, তবে ৫।৭ মিনিট হাঁ করে থাকতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব। Before X-ray treatment begins I die'। কিন্তু গলার ভিতরে এই চিকিৎসা আরম্ভ করবার পর রজনীকান্ত বেশ একটু ভালো বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন: 'ডাক্তার বার্ড বলেছে, X-ray skin আর flesh penetrate করে ভিতরে যায়, তাতে কতক ফল হতে পারে। দুই দিন দিয়ে ব্যথা একটু কম বুঝি। কাল থেকে একটু ঘুমুতেও পারছি।' এই চিকিৎসায় ক্রমে ক্রমে তিনি আরও বেশি উপকার পাইলেন। তাঁহার রোজনামচায় দেখিতে পাই: 'X-ray দেওয়া হচ্ছে, আর ধীরে ধীরে ভালো বোধ করছি। বেদনা খুব কমে গেছে, ফোলাও কমে গেছে, খেতে পারছি। দুর্বলতা অনেক কমেছে।' আশার এই অভিনব আলোকপাতে কবি ও তাঁহার পরিজনবর্গ অনেকটা ভরসা পাইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, ভগবানের কৃপায় হয়তো এ দারুণ ব্যাধির হাত হইতে এবার রজনীকান্ত মুক্ত হইবেন! কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে, হঠাৎ গলার বেদনা ও জ্বর বাড়িয়া গেল। ঘোর

ঘনঘটার মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ বিকাশ দেখাইয়া, সে আশু উপকার কোথায় অন্তর্হিত হইল। কবি লিখিলেন : 'এক্স্-রের উপরও ক্রমে faith হারাচ্ছি।'

ক্যানসার-ক্ষত ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল। রজনীকান্তের মুখ দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজরক্ত বাহির হইতে লাগিল। তিনি এ বিষয়ে রোজনামচায় লিখিতেছেন : 'A fluid of foul smell, mixed with blood, was coming out of the mouth the whole night. I asked Dr Connor, he said that it was a reaction of the X-ray'। কবি হতাশ হইয়া এক্স রে চিকিৎসা ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে এক দিন রজনীকান্তের নাক দিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল, এই রক্তপাতে তিনি বড়ো কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী ও পিতৃবৎসল পুত্রকন্যাগণও এই অবস্থা দেখিয়া বড়োই ভীত হইলেন। রজনীকান্তের জননী তখন স্বতন্ত্র বাড়িতে ছিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য ঘোড়া গাড়ি লোক পাঠানো হইল। সে সময়ে তিনি জপ করিতে বসিয়াছিলেন। জপে নিযুক্ত হইলে, কান্ত জননী মনোমোহিনী দেবীর বাহ্য জ্ঞান থাকিত না, তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। আমাদের এই কথার সমর্থনে আমরা রজনীকান্তের ভগিনী শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরীর লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি : 'সেই সময়ে দাদা মহাশয়ের নাসিকা দিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে আরম্ভ হওয়ায়, তিনি যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তদবস্থায় তাঁহার মাতাঠাকুরানীকে কটেজে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার প্রেরিত লোক কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ জানাইল। আমার মাতাঠাকুরানী ও খুড়িমাতাঠাকুরানীর সহোদরা যথাসম্ভব শীঘ্র জপ শেষ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়িতে উঠিবার জন্য রাস্তাভিমুখে ছুটিলেন— দেহাচ্ছাদনের বস্ত্র পর্যন্ত লইতে ভুলিয়া গেলেন। আমার দশাও এইরূপই হইয়াছিল। গাড়িতে উঠিয়া আমরা অনেকক্ষণ খুড়িমাতাঠাকুরানীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া, সকলে গাড়ি হইতে অবতরণপূর্বক পুনরায় তাহার নিকট গেলাম। যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর এ জীবনে ভুলিব না। তিনি কুশাসনের উপরে কালীদুর্গানামশোভিত নামাবলি দ্বারা দেহাচ্ছাদিত করিয়া, মুদিত নেত্রে জপে মগ্না রহিয়াছেন, যেন তাঁহার উপরে কোনও ঘটনা ঘটে নাই, যেন তাঁহার একমাত্র পুত্র আজ মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হন নাই, যেন তিনি চিরসুখিনী, যেন তিনি চিরভাবনা-বিরহিতা। খুড়িমাতাঠাকুরানীর ভগ্নী ও আমার মাতাঠাকুরানী

বলিলেন, "এ কি! এ কি! আপনার কি কোনও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই? আপনার কি চিরকালই এক ভাব?" বলিয়া কত মন্দ বলিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু কিছু বলিতে পারিলাম না। তাহার তৎকালীন ভাবগতিকে আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল, আমি জানু পাতিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তথা হইতে সরিয়া পড়িলাম। সেদিনকার সমস্ত রজনীই সেই আলোচনায় কাটাইলাম। সেই যে "আপনার সব সময়েই এক ভাব"—এই কথাই এখন আমার আলোচনার বিষয় হইল। মহামূল্য বসনাদি পরিধান করিয়া একমাত্র প্রিয় পুত্রের আপিসে যাওয়ার সময়ে তিনি যেমন মনোযোগের সহিত জপ করিতেন, সেই পুত্র মুমূর্ষু শুনিয়া, তেমনই মনোযোগের সহিত জপ করিলেন। কি আশ্চর্য! তিনি অশ্রুশূন্য অবস্থায় মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের চক্ষে জলের সীমা-পরিসীমা ছিল না।'

এই অপরিসীম ধৈর্যশীলা ও ভক্তিমতী জননীর সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াই—রজনীকান্ত হাসপাতালের নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও ধৈর্য ও ভগবন্নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

যখন এক্স-রে চিকিৎসায় কোনও ফল হইল না, তখন তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি তাঁহার বৈবাহিক যাদবগোবিন্দ সেন মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে, নদিয়া জেলার অন্তর্গত এনাৎপুরনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পিতার ক্যানসার হইয়াছিল। স্থানীয় কোনও এক ব্যক্তি শৈলেশ বাবুর পিতাকে নীরোগ করিয়াছিলেন। সে লোক এখন জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্যানসার রোগের সেই অব্যর্থ ঔষধ জানে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন সামান্য একটি তৃণের অবলম্বনে জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, রজনীকান্ত তেমনই এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেই সংকটাপন্ন অবস্থায় যেন কতকটা ভরসা পাইলেন। টেলিগ্রাম করিয়া শৈলেশবাবু ও সেই লোকটিকে কলিকাতায় আনানো হইল এবং তাঁহার দ্বারা রজনীকান্তের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মেডিকেল কলেজের একটি নিয়ম আছে যে, কটেজে অবস্থানকালে কোনও রোগী বাহিরের কোনও চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারিবে না। কিন্তু বাধ্য হইয়া প্রাণের দায়ে রজনীকান্ত বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

চিকিৎসা আরম্ভ হইল, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কবি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন। চক্ষুর সম্মুখে

পরিজনবর্গের বিষাদমলিন ও চিন্তাজর্জরিত মুখ তাঁহার রোগযন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা বাড়াইতে লাগিল। সাধ্যমতে তিনি আপনার অসহনীয় যন্ত্রণা চাপিবার চেষ্টা করিতেন। ক্ষুধায় অস্থির, আহারবস্তুও সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু খাইবার উপায় নাই। খাইলেই সমস্ত দ্রব্য গলায় বাধিয়া গিয়া নাক মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। পাছে তাঁহার এই কষ্ট দেখিয়া অন্য কেহ কষ্ট পায়, তাই ক্ষুধা থাকিলেও তিনি— 'ক্ষুধা নাই' বলিয়া পরিজনবর্গকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই মনোভাব চাপিবার চেষ্টা পতিগতপ্রাণা পত্নীর কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। তাঁহার কাছে রজনীকান্ত হাজার চেষ্টা করিয়াও কিছু লুকাইতে পারিতেন না। পত্নীর অশ্রুসজল বিষাদকালিমালিপ্ত মুখ দেখিয়া রজনীকান্ত যে যন্ত্রণা অনুভব করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত।

কাঁচড়াপাড়ার সিদ্ধ সন্ন্যাসী পাগলাবাবার কথা শুনিয়া, তাঁহার ঔষধ সেবন করিবার জন্য রজনীকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিলেন, পাগলা-বাবার ঔষধে অনেকে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তাই ১৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখের রোজনামচায় রজনীকান্তকে লিখিতে দেখি, 'আমায় পাগলাবাবাকে এনে দিন, একবার দেখি। আমি ভিক্ষা করে খরচ দেবো।'

এই সময়ে আর এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছিল। রজনীকান্তের বাম কর্ণের নিম্নস্থান হঠাৎ ফুলিয়া উঠে। যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। পাগলা বাবার ঔষধ আনানো হইল। তিনি রজনীকান্তকে খাইবার ঔষধ এবং এই ফোলার জন্য একটি প্রলেপ দিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া এবং প্রলেপ লাগাইয়া রজনীকান্ত কতকটা সুস্থ বোধ করিলেন। ৪ আষাঢ় তিনি লিখিয়াছেন : 'আমি ঔষধে যে ফল পেয়েছি, তাহা দৈবশক্তির মতো। আমি মরে গিয়েছিলাম, আমাকে বাবা বাঁচিয়েছেন। তবে এই বাঁয়ের দিকের ব্যথাটা আমার কমিয়ে দিন। ফুলো খুব কমেছে। ব্যথাটা কমিয়ে দিন। বেদনা একেবারে নাই। আর এই যে কাশি নিবারণ হয়, এটা একটা blessing, একটিবারও কাশি নি। কত যে আরাম পেয়েছি, তা জানাবার উপায় নাই। আজ যেন সেই heavy breath-টা নাই।

কিছুদিন পরে কিন্তু রোগ আবার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির দিকে যাইতে লাগিল। পাগলাবাবার ঔষধ বন্ধ হইল। বাম কর্ণমূল পূর্বেই ফুলিয়াছিল, এবার দক্ষিণ কর্ণমূলও ফুলিয়া উঠিল। অসহ্য প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ, বন্ধুবান্ধব ও পরিজনবর্গের অক্লান্ত সেবা, শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা কবির এই যন্ত্রণার

উপশম করিতে পারিল না। অপরিসীম ধৈর্যের সহিত অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত দৈহিক কষ্ট বিস্মৃত হইবার জন্য, 'দেহাত্মিকা মতি'র গতি ভগবানের চরণাভিমুখী করিয়া দিলেন। মানুষের প্রদত্ত ঔষধ ও প্রলেপ যখন তাঁহার যন্ত্রণা লাঘব করিতে পারিল না, তখন তিনি শান্তিপ্রলেপের জন্য, সেই অনন্যশরণের শরণ লইলেন। তিনি বুঝিলেন, শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন তাঁহার এ কালব্যাধির আর কোনও ঔষধ নাই। তাই কৃতসংকল্প কান্তকে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও লিখিতে দেখি: 'ভগবান, আমার তো শারীরিক কষ্ট। আমার আত্মা তো কষ্টমুক্ত। দেহমুক্ত হলেই আত্মা কষ্টমুক্ত হবে। তবে আত্মাকে দেহমুক্ত কর দয়াল, আর দেহ চাহি না। দেহ আমাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। আমার আত্মাকে তোমার পদতলে নিয়ে যাও।'

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে তাহার রোগ খুব প্রবল হইয়া উঠিল। জ্বর, ফোলা, শ্বাস, ভোজনকষ্ট, রক্তপাত, কাশি—এ সমস্ত পূর্ব হইতেই ছিল, এখন গায়ের জ্বালা আরম্ভ হইল। নিদ্রা নাই, স্বস্তি নাই, অহরহ কেবল যন্ত্রণা। প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়, দেহ-কারার মধ্যে সে আর কোনও প্রকারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। বাম কর্ণমূলের নীচে যে স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণা এত বাড়িল যে, শেষকালে বাধ্য হইয়া তাহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হইল। অস্ত্র করিবার পর রজনীকান্ত অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু উহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই।

একমাত্র পুত্রের জীবনের আশা নাই, চোখের সামনে প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতেছে—পুত্রগতপ্রাণা জননী কেমন করিয়া সহ্য করিবেন। মানুষের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও ঔষধ যখন বিফল হইল, তখন দৈববিশ্বাসী ভক্তিমতী রমণী দেবতার করুণা ভিক্ষার জন্য দেবচরণে আত্মনিবেদন জানাইতে ছুটিলেন। রজনীকান্তের 'আশি বছরের বুড়ো মা' পুত্রের অজ্ঞাতসারে বাবা তারকনাথের কাছে ধরনা দিবার জন্য তারকেশ্বরে গমন করিলেন। রজনীকান্ত যখন এই ঘটনার কথা জানিতে পারিলেন, তখন বুড়া মায়ের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন,—'আমার আশি বছরের মা ধরনা দিতে গেল ব্যাকুল হয়ে, যে মরি তো শিবের পায়ে মরব বুড়ো মার জন্য কষ্ট লাগছে। মনে হয়, পুত্রগতপ্রাণা বুঝি নিজের প্রাণ দিয়ে, পুত্রের প্রাণ দিতে গেল।'

তিন দিনের পর কান্ত-জননী বাবা তারকেশ্বরের স্বপ্নাদিষ্ট ঔষধ পাইলেন।

ঔষধ আনিয়া পুত্রকে তিনি তাহা সেবন করাইলেন। কিন্তু এ দৈব ঔষধ সেবনেও রজনীকান্তের কোনও উপকার হইল না।

এক দিনের অবস্থা এমন হইল যে, তিনি ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। পরিজনবর্গ ভয়ে আকুল হইলেন। তাঁহার চারি পার্শ্বে ক্রন্দনের ভীষণ রোল উত্থিত হইল। কিন্তু এই সংকটাপন্ন অবস্থাতেও তাহাদের আশ্বাস দিবার জন্য রজনীকান্ত লিখিয়া জানাইলেন— 'ভয় নাই, এখনই প্রাণ বাহির হবে না। বড়ো যাতনা, লিখে জানাতে পারছি না।' রজনীকান্ত পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছেন, হয় খুব বেশি রক্তপাতে, নয় আহার বন্ধ হইয়া তিনি মারা যাইবেন। তাই তাহার এই রক্তপাত দেখিয়া পরিজনবর্গ আশু মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন।

ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহের পর হইতেই তাহার গায়ের জ্বালা বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ জলপিপাসা উপস্থিত হইল। এই সময়ে একদিন রজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন— 'আমার গায়ের জ্বালা নিবারণ করে দিন, দোহাই আপনার। আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে হরিনাম দিন।' তখন মাঝে মাঝে রজনীকান্তের মুখ দিয়া পচা পুঁজ নির্গত হইতে লাগিল। কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান একে একে রজনীকান্তের সমস্ত দৈহিক শক্তি হরণ করিয়া লইতেছিলেন, তাহার সমস্ত আরাম, তাঁহার পার্থিব শান্তি, পার্থিব আনন্দ সকলই হরণ করিয়া লইয়া ভগবান অল্পে অল্পে তাহাকে নিজের কোলের মধ্যে টানিতে-ছিলেন। রজনীকান্তের— 'আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হল হেন, ভাঙো এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব'— এই আকুল প্রার্থনার উত্তরে ভগবান তাঁহার আমিত্বের বনিয়াদকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিতেছিলেন। জগতের সমস্ত শক্তি, জগতের সমস্ত চেষ্টা, যত্ন, চিকিৎসা, বিজ্ঞানের সমস্ত আয়োজন - সেই অপরাজেয়ের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। চলিবার যে সামান্য শক্তিটুকু ছিল, তাহাও রহিত হইল। রজনীকান্তের পা দুটি ফুলিয়া উঠিল। সাধারণ আহার্যবস্তু গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না, দুধ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি তরল খাদ্য— তাও অতি কষ্টে তাঁহাকে গিলিতে হইত। তাহার হজমের শক্তিটুকুও এই সময় হইতে কমিয়া আসিল।

গায়ের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে জলপিপাসা খুব বাড়িয়া উঠিল। নিজ গৃহের জলে তাহার তৃপ্তি হইত না। তিনি কটেজের যে অংশে ছিলেন, তাহারই পাশের অংশে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদরার পৌত্রীজামাতা রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পীড়িত হইয়া সপরিবার বাস করিতেছিলেন। তাহাদের

গৃহে অতি শীতল জল থাকিত। রজনীকান্তের পরিবারবর্গ তাহাদের বাড়িতে যাতায়াত করিতেন। সেই সূত্রে একদিন তাহাদের ঘর হইতে কবির জন্য জল চাহিয়া আনা হয়। সে জল রজনীকান্তের এত ভালো লাগে যে, প্রতিদিনই তাহাদের ঘর হইতে রজনীকান্তের জন্য সাত-আট বার জল চাহিয়া আনা হইত। এই সযত্নরক্ষিত শীতল জল পান করিয়া রজনীকান্ত অত যন্ত্রণার মধ্যেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করিতেন। তাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কবি জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া কম্পিত হস্তে তাহার হৃদয়ের কবিত্ব উৎসের শেষধারা উৎসারিত করিয়া লিখিলেন—

বাসার কাছে, পরম সুখী দুজন,
পরম সুখে বাঁধিয়াছিল বাসা,
পীড়িত দেহ, নিরাশাচিত স্বামীটি,
সতীটি তবু ছাড়ে না তার আশা।
কত যত্ন কত পরিশ্রমে
সোনার স্বামী উঠিল তার বাঁচি,
শীতল হল পত্নীগত প্রাণটি
সতী বলিত, 'এখনো আমি আছি'।
আগে কি জানি, শীতল কথা পাশে
রাখিত তারা এত শীতল বারি।
আমি চাহিলে, দিতে বলিত স্বামীটি,
আনিয়া দিত কি আনন্দে নারী।

কবিতাটির শেষে রজনীকান্ত লিখিলেন—'রুগ্নের কৃতজ্ঞতার উপহার'। এই কবিতাটি রজনীকান্তের শেষ রচনা। ১৮ ভাদ্র তিনি ইহা রচনা করেন এবং ঐ দিনেই তিনি তাহার প্রতিবেশী সুখী দম্পতিকে উহা উপহার দেন।

ক্রমে গনা দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। মুমূর্ষু কান্তের ক্ষীণ লেখনীমুখে বাহির হইল: 'ভগবান যখন বিমুখ হন, তখন মানুষের শক্তি পরাজিত হয়।' সপ্তরথীবেষ্টিত নিরস্ত্র অভিমন্যুর ন্যায় রজনীকান্তের ক্ষীণ দুর্বল দেহটুকুকে নানা দিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। শীর্ণ দেহে রজনীকান্ত 'শেষের সেদিন-এর জন্য উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণার অবধি নাই। কণ্ঠহীন চলচ্ছক্তি-রহিত, রোগক্লিষ্ট কবির এ মর্মভেদী কাহিনী আর আমরা লিখিতে পারিতেছি

না। তাঁহার রোগশয্যার অন্যতর সহচর কবি সন্তোষকুমারের কয়েকটি কথা তুলিয়া দিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি—

শয্যাপার্শ্বে বসি তব কত দিন, কত মাস ধরি,
হে ভাবুক কবি!
নিমেষ পলকহীন নয়নে হেরেছি রোগক্লিষ্ট
শান্ত তব ছবি।
বুঝিয়াছি কি দাহনে দগ্ধ করি নিশিদিন
দুরন্ত অনলে,
সর্ব চেষ্টা তুচ্ছ করি, দারুণ বিরামহীন ব্যাধি
প্রতি পলে পলে,
তোমারে মৃত্যুর পথে গিয়াছে লইয়া; যাতনায়
সুশীতল জল
লয়েছ বদনে, তাও পড়েছে গড়ায়ে, সিক্ত করি
শুধু শয্যাতল।

৬

রোজনামচা

হাসপাতালের রোজনামচা এক অপূর্ব সামগ্রী। হাসপাতালে আশ্রয়গ্রহণের সময় হইতে মৃত্যুসময় পর্যন্ত বাক্যহারা রজনীকান্তকে লেখনীসাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তৃষ্ণার জলটুকু চাওয়া হইতে লোকের সহিত কথা কওয়া, রোগযন্ত্রণার কাতরোক্তি, বন্ধুগণের সহিত আলাপ, কবিতা ও সংগীত-রচনা, ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন পর্যন্ত তাঁহার মনের সমস্ত ভাবই তাঁহাকে লেখনীসাহায্যে জানাইতে হইত। সামান্য রহস্যালাপ হইতে আরম্ভ করিয়া, বড়ো বড়ো ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের আখ্যায়িকা পর্যন্ত যিনি কথার সাহায্যে ব্যক্ত করিতেন, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই যিনি কথা কহিয়া ও গান গাহিয়া কাটাইতেন, অতিরিক্ত স্বরচালনায় যাঁহাকে কখনো কোনও দিনও কাতর হইতে দেখা যায় নাই, সেই অসাধারণ ভাষণপটু রজনীকান্তের

কথা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 'যেটা যার এ সংসারে তীব্রতম আকর্ষণ' —তাহাই কাড়িয়া লইয়া ভগবান রজনীকান্তকে এক উৎকট পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কণ্ঠহারা রজনীকান্ত লেখনীর সাহায্যে কিরূপে তাঁহার ব্যক্তিত্ব নানাভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—কিভাবে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও ভগবানের চরণে তিনি একান্ত নির্ভর করিয়াছিলেন, কিভাবে তিনি সমস্ত দৈহিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার রোগশয্যাপার্শ্বে সমাগত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে বহস্যালাপে ও নানা আলোচনায় পর্বের ন্যায় পরিতৃপ্ত করিতেন, কিভাবে শত অভাব ও দৈন্যের মধ্যেও অবিচলিতচিত্তে তিনি বঙ্গবাণীর সেবা করিতেন—এই রোজনামচাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

রজনীকান্ত আটমাসকাল খাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়া তাঁহার সমস্ত মনোভাব, তাহার যাবতীয় বক্তব্য জানাইয়া গিয়াছেন। এই খাতাগুলিতে তাঁহার সে সময়ের সকল কথাই লিপিবদ্ধ আছে। সব খাতাগুলি পাওয়া যায় নাই, যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিরও সকল স্থান পাঠ করা যায় না। এই সকল খাতায় লিখিত বিবরণের বিভিন্ন বিষয় নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া 'হাসপাতালের রোজনামচা' নামে মুদ্রিত হইল। ইহা ঠিক রোজনামচা বা ডায়েরি নহে—কারণ সকল বিবরণ পর পর তারিখ হিসাবে লিখিত হয় নাই এবং লিখিবার উপায়ও ছিল না। এই রোজনামচা হইতে নানা অংশ বিষয় বিভাগ করিয়া বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রজনীকান্তের হাসপাতালে রচিত বহু কবিতাও লিখিত আছে। তাহার কতকগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে, কতকগুলি মাসিক ও সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, আর অনেক গান ও কবিতা এখনো অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে হাসপাতালে রচিত রজনীকান্তের কবিতা ও গানের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

১ রসালাপ

Allopath-রা ছাঁদা করবার পর আমার গলার দড়ি খুলে দিয়ে বলেছে—এখন দুনিয়ার মাঠে চরে খাও গে।[১]

না খেয়ে একদিন রাগ করেছিলাম—কেউ আর খেতে বলে না। সন্ধ্যায়

১ এখানে 'ছাঁদা' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক শ্লিষ্টপ্রয়োগ। গোরু দুহিবার সময়ে গোরুর পিছনের পা দুইটি দড়ি দিয়া বাঁধাকে 'ছাঁদা' বলে।

সময় নিজেই চেয়ে খেলাম। সেই দিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, রাগ করতে হয় তবে বেশ করে খেয়ে নিয়ে রাগ করব। আর মুশকিল কিছু নাই।

.. ..

তোমাদের মতন যদি আমার আগেকার মতো loud logic থাকত তবে তর্ক করতেম। তোমরা চট করে বলে ফেল, উত্তর লিখতে আমার প্রাণান্ত। যখন না পারি তখন ভাবি— 'পড়েছি পাঠানের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'।

... .

বাবার মতো ছেলে বড়ো হয় না। Of course there are exceptions। একজন বললে যে, 'তোর বাপ মুখে মুখে কবিতা করে কত পয়সা উপায় করে গেছে, আর তুই কি করিস?' ছেলেটা বললে, 'ঐ বাবা যা করত, আমি তাই করি, তবে কথা কি জানেন—

আমার যে কবিতে করা
সাপের যেমন ছুঁচো ধরা,
নিতান্ত পৈতৃক ধারা
না রাখিলে রয় না।
আমার যে কবিতে ভাবা
সে কেবল মিছে ভাবা
যেমন করেছেন বাবা
তেমন আর হয় না।'

.. ..

একদিন একজনার কথকতা শুনেছিলাম, সে বললে যখন সমুদ্র ডিঙাবার question উঠল, তখন রাম সকলকে ডাকলেন। সকলেই বললে অত বড়ো লম্ফ যদি দিতে না পারি, সাগরশায়ী হয়ে যাব, পারব না। কেবল একটা ছোটো বানর বললে, আমার সে ভয় নাই, আমি লাফ দিলে তাক হারিয়ে শেষে লঙ্কার ওপিঠে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, সেইটে ভয়। তারপর হনুমান বললে, আমি ঠিক লম্ফ দেব। তাই বলছিলাম যে, তোমরা করতে পারো সব, কেবল there is a tendency of things being overdone like that little monkey! হেম তো সত্যি সত্যি overdo করো। রাত জাগ!

... ...

আমি যখন পড়ি তখন অরুণ বলে একটি ছেলের private tutor ছিলাম।

সে একদিন বললে— 'মাস্টার মশাই, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনার সাক্ষাতেই তামাকটা খাই। ওটা খেতে বার বার বাইরে যেতে হয়, পড়ার ব্যাঘাত হয়'। আমি তো অবাক। অরুণের বাড়ি শ্রীরামপুর। তার মামা **First Arts** দেবার সময় একটা diagram আঁকতে না পেরে, একটা মানুষ— মাথায় টুপি, দুই হাতে দুইটা football লিখে দিয়েছিল। একটা guard বললে, 'লিখছ না কেন, ছবি দাগছ কেন?' সে বললে, 'লিখতে পারলে কি আর ছবি দাগি?'

Guard -তবে কাগজ দিয়ে উঠে যাও।

সে- এত শিগগির যেতে লজ্জা করছে।

Guard— তবে পাশের wing-এ গিয়ে বোসো।

সে —যদি এক ছিলিম তামাক খাই।

ও তারই ভাগনে।

একজন বললে— 'দেখেছিলাম বলে জাত বেঁচে গেছে। কালীঘাটে একটা লোক চার পয়সা দিয়ে একটা মেটে গেলাসের এক গেলাস মদ খেলে। সে লোকটা মুসলমান। গেলাসটার যে ধারে মুখ দিয়ে খেলে -দেখে রাখলাম। সে চলে গেলে আমি গেলাসটা ফিরিয়ে ধরে এক গেলাস খেলাম। দেখেছিলাম বলে জাতটা বেঁচেছে।'

আপনারা কি পড়ছেন? আমি প্রথম ভাবতাম— 'চড়ক' বুঝি, তারপর বইতে দেখি 'চরক'। ভাবি শক্ত নাকি?

Average man কি রকম? খাইয়ে অর্থাৎ বৃকোদরও কেউ নেই, 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী'ও কেউ নেই।

সৎপথে থেকে ওকালতি করা বড়ো কঠিন হয়েছে। টাকার লোভ এত হবে যে সত্যাসত্য বিচারক্ষমতা blunt হয়ে heart callous হবে তখন টাকা হতে পারে। অর্থ হবে, তবে তার পায়ে পরমার্থটি রেখে হবে। ইতি মে মতিঃ।

...

একটা রাখাল দুটো গোরু নিয়ে যাচ্ছিল— তার একটা খুব মোটা, আর একটা খুব রোগা। একজন উকিল সেই পথে যান। তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা

করলেন, 'তোর ও গোরুটা অত মোটা কেন, আর এটা এত হালকা কেন? এটাকে খেতে দিস নে না কি?' রাখাল উকিলকে চিনত, বললে, 'আজ্ঞে না। মোটাটা উকিল, আর রোগাটা মক্কেল— রাগ করবেন না।'

•

মোমবাতি কি purgative? মোমবাতি নইলে বাহ্যে হয় না?[১]

আমি আমার রাজশাহির অট্টালিকা ছেড়ে যখন কুঁড়েঘরে এসেছি তখন শরীর তো ভালো থাকার কথাই নয়। এটা cottage কিনা!

আমি অত দুর্বল হই নি যে, দুই পা হাঁটতে heart বেশি quickly beat করবে। সে নবীন যুবকদের, আর যাদের বে হয় নি। আমাদের spirit stagnant হয়েছে। Excitement নাই। তোমাদের যদি কেউ liar বলে, তার মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত পান কর, আমাদের বললে আমরা বলি, 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'। ঠিক তাই। সেইজন্য বলি, তোমাদের exciting cells খুব sensitive!

ওরা যখন গা ফুঁড়ে, কি অস্ত্র করে, তখন মনে করে আমরা বুঝি জড়পদার্থ। কিন্তু যখন visit নেয় তখন আমরা প্রাণী!

একখানি পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের লেখকদিগের মাসিক পত্রিকা বেরুচ্ছে, শুনেছেন? তাতে আপনারা কলকে পাবেন না। তা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া পূর্ব, উত্তর, ঈশান, নৈঋত— সমস্ত বঙ্গের লেখকেরা লিখবেন। বাদ· এই পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ। অর্থাৎ বাঙালরা ভারি চটে গেছে আপনাদের উপর। কোন বইতে ভাষার বিভ্রাটে দু-একটা বাঙালে কথা বেরিয়েছিল, এরূপ প্রবাদ, তারি সমালোচনায় বাঙাল বলে ঠাট্টা করাতেই এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হচ্ছে। আর তোমাগো পত্রিকায় লিখুম না। কি বলব, পত্রিকা বেরোবার আগেই মলাম। নইলে বাঙালের চোট দেখিয়ে দিতাম। তা কি করব, ভবতারণ ডেকে নিলেন, যে রকম হলদে হয়ে উঠছি!

… … …

১ হাসপাতালে রজনীকান্তকে রাত্রিতে বাতি লইয়া মলত্যাগ করিতে যাইতে হইত।

Injection দিতে চায় না। আরে পাগল, আমার মাসখানেক থেকে ঐ হচ্ছে, আমার কি একটা মৌতাত হয় না নাকি? সেই মৌতাতি মানুষের আফিমটুকু কেড়ে নিয়ে সর্বনাশ করতে চাও? দোহাই বাবা, মেরো না বাবা, এটুকু যদি নাও তবে প্রাণটা নাও।

... ...

এত যদি ছিল মনে বাঁশরি বাজালে কেনে? বাবা! এখন যে কদমতলা বলে প্রাণ ধায়, তা নিবারণ কে করে বাবা? যখন প্রথম বাঁশি বাজিয়েছিলে তখন ভাবিতে উচিত ছিল। এই আফিমখোরের প্রাণটুকু নিয়ে কি হবে বাবা।

.

একজন এক কবিতার বই ছাপতে দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল— 'পড়ে বজ্র, হানে পিচ, বহে প্রভঞ্জন'। প্রেসের proprietor বললে, আর সব তো বুঝলাম, 'হানে পিচ'টা কি মশাই? Author বললে, অমরকোষ পড়েন নি? ওটা বিদ্যুতের নাম। পিচ=বিদ্যুৎ। Proprietor বললে, অমরকোষের কোথায় আছে 'পিচ' মানে বিদ্যুৎ? Author বললে—'তড়িৎ সৌদামিনী বিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলাপিচ।'

এই রকম গল্প আমি এক মাস শোনাতে পারতাম। এত সংগ্রহ করেছিলাম।

এক পেয়াদা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে সমনজারির, একান্নবর্তী পরিবার কাহাকেও না পাইয়া লটকাইয়া জারি করিলাম।' কিন্তু একান্নবর্তীটা লিখছে— '৫১বর্তি'।

.. ..

শাহাজাদপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এক ছেলে সাহিত্যের উত্তরের কাগজে লিখেছিল—

এমন সহজ প্রশ্ন কভু দেখি নাই।
কিন্তু আমি হতভাগা কিছু লিখি নাই॥

আমি যে কত রকম দেখেছি, তা বললে শেষ হয় না।

X-ray কেন জানো? **X is an unknown quantity.**

... .

শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী যখন মরে গেল, তখন তার এক মুসলমান বন্ধু শ্রীশবাবুর ছেলেকে লিখল, 'বন্ধু "শ"চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুতে বড়ো ব্যথিত হয়েছি।'

সূর্যটা কত বড়ো জান ? এই পৃথিবীর মতো ১৪ লক্ষ পৃথিবী একত্র করলে যত বড়ো একটা জিনিস হয়, অত বড়ো একটা জিনিস। ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার পৃথিবী একত্র করলে যত বড়ো হয়, তত বড়ো। ৯২ কোটি ৭০ হাজার মাইল অর্থাৎ প্রায় ৯৩ কোটি মাইল পৃথিবী থেকে দূরে। ঐ লেজটা কত বড়ো জান ? প্রায় ১৪ লক্ষ মাইল লম্বা। ওটার নাম 'হেলি'র ধূমকেতু। ৭০ বৎসর পর পর একবার করে দেখা যায়। এটার বেগ এক মিনিটে ৬২ হাজার মাইল। সকল স্থান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

ছায়াপথের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি অসংখ্য তারা অনেক দূরে আছে। অসীম শূন্যে আছে, স্থানের অভাব কি ? 'লীরা' নামে একটা তারা আছে , এত দূরে থাকে বলে একটা তারা বোধ হত, কিন্তু দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখা গেল যে, সেটা অনেক-গুলি তারার সমষ্টি।

চাঁদের মধ্যে সে সব পাহাড় আছে, তার এক একটা প্রায় ৬ মাইল উঁচু। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোটো, কিন্তু ওর পাহাড়গুলো পৃথিবীর পাহাড়ের চেয়ে ঢের বড়ো। দূরবীন দিয়ে চাঁদকে বেশ ক'রে দেখা গেছে, প্রাণী নাই,— বাতাস নাই, তেজ নাই। প্রাণহীন, কেবল পাহাড়। আর কিছু নাই। নদী নাই, ঝরনা নাই, সমুদ্র নাই, গাছ নাই। পাহাড়গুলো কত উঁচু তা পর্যন্ত মাপা গেছে। সর্বোচ্চটা ৬ মাইল, অর্থাৎ তিন ক্রোশ উঁচু।

১৩ লক্ষ ৩১ হাজার পৃথিবী একত্র করলে যা হয়, সূর্যটা তাই। আছে প্রায় ৯৩ কোটি মাইল দূরে। তাই যখন ভাবি তখন আমাকে এত ক্ষুদ্র মনে হয় যে, নিজকে হাতড়ে পাই নে, বেদনাও থাকে না।

যে কমেটটা উঠছে, তার লেজটা ১৪ লক্ষ মাইল লম্বা। ৭০ বৎসরে একবার দেখা যায়।

আমি শ্রীরজনীকান্ত সেন বি-এল, এখানে বসে কত গর্বই না করছি, কত অভিমানই না করছি। কত রাগ, কত ক্রোধ, কত কাণ্ড করছি— মনে হলে লজ্জা হয় না ?

আমি আবার এ দেশের মানুষ নাকি ? এই সকল intelligent giant-দের মধ্যে আমি কোন্ নগণ্য ব্যক্তি ! ··আমার ছবি আর সংক্ষিপ্ত একটু জীবনী যে দেওয়া হয়েছে— 'সুপ্রভাতে' দেখে একটু তুষ্ট হলাম। কিন্তু আমি কি ওর উপযুক্ত ?···

যে টানলে সমস্ত জড-জগতের টান ব্যর্থ হয়, সেই টেনেছে, বুঝছ না? আচ্ছা তা নাই বা হল, কেনই বা রাখতে চাও? এ কীটকে দিয়ে কি হবে? এই আমাব মানুষেব কাছে নত হবার সময় যায়। আব এ-ই আমার প্রাণের ভগবান সমস্ত বাত্রি শিখিয়েছেন।

আমি তো একটা কীটাণুকীট। আমাব আবাব position কই? আমাব মতো কাঙাল, অধম, পাপীকে যা দিলে ঠিক উপযুক্ত হয়, তাই আমাকে দিন।

যে দেশে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুবীব প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে আছে, সেখানে আবাব আমবা কে? আপনাদেব প্রতিভাতেই দেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে, এদেশে আবাব আমবা কে? এখানে আমবা কোথায লাগি? দেশের এই শত শত প্রতিভা-মাতঙ্গেব মধ্যে আমি কোন জোনাকি? ·আমাকে খামকা উঁচু কববেন না। আমি বড়ো দীনহীন, বড়ো কাঙাল।

.. .

আজ রবি ঠাকুব আমাকে বড়ো অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে তিনি বল্‌লেন—'আপনাকে পূজা কবতে ইচ্ছা কবে'।—শুনে আমি লজ্জায মবি।

. .

আপনাবাই মানুষ, মায়ের কাজ করছেন, আমি কিছুই করতে পারলাম না। দেখুন, বেশভূষায বড়ো করে না, বড়ো যাতে করে তা দেখলেই লোকের মাথা তার কাছে নত হযে পড়ে।

আমাকে দেখে যান, আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমার যাবার সময় অকাবণ আমার মান বাড়াবেন না।

তা ভগবান আছেন। নইলে কি আজ আর আমাকে জীবিত দেখতে, না কথা কইতে? না হাতে শাঁখা থাকত? দীন, মলিন বেশে রাজশাহি গিয়ে উপবাস করতে হত না? তোমার কি আর এই শ্রী থাকত? তাই বলি ভগবান আছেন। তিনিই এই ৬।৭ মাস কাল চালালেন—কেমন আশ্চর্য রকমে

চালালেন তা তো দেখলে? তবে আর চিন্তা কি? আমাদের ভাবনা তিনি ভাবছেন। ভার দাও।

বড়ো পিপাসা, জ্ঞান বে বাবা, এই তো দেহেব পবিণাম। বাবা আমার, কাছে এসে বোসো।

এবার বাবা তাবকেশ্বব তোমাব মুখ রাখলেন। বাবাব দযায তোমার মুখ থাকল। এ বেলা ভালোই বোধ হচ্ছে। তোমার চবণেব ধুলোয় ভালো লাগছে।

ঐ একখানা সম্পত্তি কবে থুযে গেলাম। বাজারেব পযসা নাই—দু খান বেচে বাবো আনা দিযে বাজার কব। এই 'অমৃত' আব 'আনন্দমযী' তোমার বাজাবেব পযসা, হীবা বে।

আমাব কাছ ছাড়া হযে থেকো না। তোমাকে মিনতি কবছি, আমি যে বসে থাকতে পাবি না।

আজ কত পিপাসা যে সংববণ কবেছি হিরণ, তবু কেউ জল দেয নি। পিপাসার আব শেষ নেই। যে কষ্ট বাত্রিতে গিয়েছে, তা আব লিখে কি করব? তাবপব তোমাব দীর্ঘ অদর্শন। না দেখলে প্রাণটা আমাব অস্থিব কবে, ফাঁপর কবে। মনে হয ম'লাম বুঝি।

আব তো হল না হিবণ। আমাকে ছেড়ে থেকো না। অন্ধকার হযে আসে। মাছ-টাছ সব বেখে এসো। আব কিছু চাই না। দেখ, ও তো আব মা আমাকে খেতে দিল না। একটু জল দাও তো, দেখি অধঃকরণ হয কি না?

দিদি, যাবেন না। আমাব রাত আজ আর যেতে চায় না। আপনার পায়ে পড়ি, দিদি।

.. . ...

দেখ, হিরণ! আমার শ্রাদ্ধে বেশি খরচ কোরো না। কিন্তু যেমন পিপাসা তেমনি খুব জল দিয়ো। আম উৎসর্গ করিও, জল দিতে কৃপণতা কোরো না।

বড পিপাসায মলাম, জল দিয়ো। বুদ্ধি যে দেহাত্মিকা তা ঠিক বুঝলাম না। কি জানি যদি আমার দযাল বলে যে হ্যাঁ, এ অধম সেটা বুঝেছিল, তবুও জল দিও। তিনি যদি আমাকে জল দেন—জল খাব। নইলে আর নয়। আর দেখ, শ্রাদ্ধের পূর্বেই সব রাজাদেব কাছে লিখো যে, দশ দিনে শ্রাদ্ধ হবে—এক্ষণে কিছু বেশি টাকা নেওযা উচিত নয়। কাবণ বাজারা বলবে,—আবার এই অনাথ পবিবাবকে এখনি সাহায্য করতে হবে? যা হয, সুবেশ প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবদেব সঙ্গে পবামর্শ কবে দেখো।

হিরু বে, আমবা খেতে যে পাচ্ছি এ তো পবম সৌভাগ্য। তখন কেঁদেছিলি বে, আমাব মনে আছে।

...

হিবণ, আমাব পাণ বডো অস্থিব হবে তুমি নিজে বলো 'হরিবোল'—হবিনাম আমাব কানে যত দিতে পারো। আমার মুখ বন্ধ হযেছে—কান বন্ধ হয় নি।

ভয কি হিবণ। মাব কাছে যাই, সকলে গেছে। দেখি সে কেমন দেশ। মাব কোল কেমন নির্মল, কেমন শীতল দেখে নি। আমাব দিন ঘনিযে এসেছে, তোবা সব বোস আমাব কাছে। মা বে। হীবা বডো কষ্ট দিযেছি, মাপ কব। আমাব যাবাব সময সত্যি আমাকে মাপ কব।

.. .. .

যে দিচ্ছে ববাবর সেই দিবে, ভাব কেন? সেই কষ্ট যদি থাকে, তবে তা কি ভাবলে খণ্ডিবে, হিবণ্ময়ী। তাও যে তাঁবই প্রেরিত, তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তবে কি তুমি ভাবলে খণ্ডে যাবে? তোমার ভুল। সেখানে তোমার মস্ত ভুল। তা তো হবেই না। যা হবাব নয, তা ভেবে কষ্ট পাও। তা ভেব না। আমার দিন প্রায ফুবিযে এল। আমাব অনুভবটা অন্যের অনুভবের চেয়ে একটু প্রবল। তবে যেটা খুব বেশি সম্ভব সেইটে বলতে পারি,—বেদবেদান্ত বলা যায না।

... ..

যাদবকে বলবেন, আমি তাকে কুটুম্ব করে তার উদার চরিত্রের গুণে বড়ো সুখী হযেছি। যাদব আর তার স্ত্রী আমাকে আশা দিয়ে যে-সব পত্র লেখে, তা পড়লে আমার মরতে ইচ্ছে করে না। যাদবকে বলবেন, সে আমাকে

কুটুম্ব করে তার কোনো সুখ হয় নি, কিন্তু আমার বড়ো উপকার, বড়ো সুখ হ'য়েছে।

... ...

ধীরে পথ করছে হিরণ, তুমি পদে পদে তাঁর হাত দেখতে পাচ্ছ না? আগাগোড়া খাবার সংস্থান একজনকে দিয়ে করালো। দেখ, আবার কাকে দিয়ে কেমন করে কোন্ পথ করে। তাঁর নামের জয় হোক।...মানুষে আমার জন্য এত করছে। তাঁরই মানুষ, সুতরাং তাঁরিই প্রেরণায়।

... ...

দেখুন, আমাদের দেশের বিদ্যোৎসাহীরা আমাকে কি চক্ষে দেখেন। এমন নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাবর্জিত যশঃ বাংলার কোন্ কবি পেয়েছে?

... ...

কোন্ দেশের একটা বাঙাল্ কবি, তাও এখন কাঙাল হয়েছে। আপনার গৌরব বাড়ুক না বাড়ুক আমার বাডবে।...আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর জন্য কি চেষ্টা যে, বাংলা দেশ করছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। বিলাত থেকে আমার জন্য রেডিয়াম্ নিয়ে এসে চিকিৎসার চেষ্টা হচ্ছে। তাতে ঢের টাকা লাগবে। তবু চাঁদা করে তুলে রেডিয়াম এনে আমাকে বাঁচাবে। সে তিন-চারি হাজার টাকার কাজ।

... ...

বঙ্গে একটা নূতন প্রাণ এসেছে। বিশ্বাস যদি না হয় তবে একটু পীড়িতের ভাণ করে সাতদিন পরে advertisement দেন তো!

... ...

আমাকে দেশশুদ্ধ লোকে কেমন করে যে ভালোবাসলে তা বলতে পারি না। আমার মলিন প্রতিভাটুকুর কত যে আদর করলে! আমার এই ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ প্রতিভাটুকুর যে আদর আপনারা করলেন, আমি তার উপযুক্ত তো নই।... বঙ্গদেশ আমাকে ছেলের মতো কোলে করে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করেছে, সেইজন্য আমি ধন্য মনে করে ম'লাম।

... ...

আমি একটু বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করেছিলাম বলে বাংলা দেশ আমার যা করলে তা unique in the annals of Bengali Literature! এই সাহিত্যপ্রিয় বাংলাদেশ মানে—Literature-loving section of

Bengalis bearing the major portion of my expenses. Is it not unprecedented in a poor country like mine? তা নইলে আমার সাধ্য কি নীবদ, যে আমি এই দীর্ঘকাল এই heavy expense bear করি? One and all—names are secret! They do not wish to add force to favour and are averse to advertisements

ববিশাল থেকে যে যা যেখানে পাচ্ছে আমাকে পাঠাচ্ছে। ধন্য বরিশাল। দু টাকা পাঁচ টাকা—যার যেমন ক্ষমতা সেই দিচ্ছে। আমার গুণটা কি? আমি দেশের কি করেছি? দেশ আমাকে বড়ো ভালোবেসেছে, বড়ো সাহায্য করেছে। আমি দেশের তেমন কিছুই করতে পারি নি।

লোকে কি সম্মান, কি সাহায্য আমার করছে। আমি পড়ে থেকেও কেবল লেখাপড়ার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে না। মূর্খ হলে কে আমাকে জিজ্ঞাসা করত? এই পরিবার বৎসরাবধি প্রতিপালন হচ্ছে কেবল লেখাপড়ার জোরে। ভদ্রলোকের মধ্যে বসা যাক বা না যাক, পড়ে থেকেও খালি লেখাপড়ার জোরে এই বৃহৎ পরিবারের মুখে গ্রাস উঠছে।

সত্য সত্যই শরৎকুমার, অশ্বিনী দত্ত, পি সি. রায়, নাটোরের মহারাজা, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি আমাকে যেভাবে সাহায্য করছেন ও যেভাবে আশা দিয়ে পত্র লিখছেন, আমি শুধু উকিল হলে, আমাকে এতখানি অযাচিত সম্মান করতেন কি না সন্দেহ। আর দেখবেন কি? আমার স্ত্রীর যেন বৈধব্যের সম্ভাবনা হয়েছে,—অশ্বিনী দত্ত, পি সি. রায়, কাশিমবাজার, দীঘাপতিয়া—এঁদের তো সে রকম দুঃখ হবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবু আমার জন্য কাঁদেন। ধন্য বঙ্গদেশ। ধন্য সাহিত্যসেবার গুণগ্রাহিতা। আমার মনে হয়, আমাকে এই বিদ্বন্মণ্ডলী, সাহিত্যানুরাগী বঙ্গসমাজ যেমনটা দেখালে তা unique in the history of Bengali Literature, তোমরা তো সব খবর জান না। তাঁরা এই দুঃসময়ে আমাকে শুধু মুখের ভালোবাসা দেন নি—substantial help দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

আমার একটুখানি প্রতিভাকণিকার আদর যা বঙ্গদেশ করলে, তা unprecedented, আমি দীর্ঘকাল পীড়িত হয়ে যখন অর্থহীন হলাম, তখন আমাকে ধনী সাহিত্যানুরাগীরা বুকে তুলে নিয়ে আমাকে প্রতিপালন করছে। আমার

এত সৌভাগ্য —আমার ব্যাবাম না হলে বুঝতে পারতাম না। কোন্ পুণ্যে এই অসুখ হয়েছিল। আমাকে সবাই ভালোবাসে, এমন সৌভাগ্য ক'জন কবির হয়। কেউ আমাব শত্রু নাই। স্কুলের ছেলেবা আমাকে বড়ো ভালো-বেসেছে। আমি তাদের কি দিতে পাবি?

আত্মজীবনীব ভূমিকা

বন্ধুবর্গেব বিশেষ আগ্রহে ও প্রার্থনায রজনীকান্ত ৪ শ্রাবণ হইতে আত্ম-জীবন-চবিত বা 'আমাব জীবন' লিখিতে আবম্ভ কবেন। ইহাব ভূমিকা বা "নিবেদন" এবং "জন্ম ও বংশপবিচয" নামক প্রথম পবিচ্ছেদটি লিখিবার পব তাঁহাব পীডা বৃদ্ধি পায, কাজেই লেখা আব অগ্রসব হয নাই। "জন্ম ও বংশপরিচযেব" অধিকাংশ তথ্যই "পিতৃকুল ও মাতৃকুল" শীর্ষক পবিচ্ছেদে বিবৃত হইযাছে, সুতবাং সেই অংশ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। কেবল তাহাব লিখিত "নিবেদন" আত্মন্ত উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বজনীকান্তের তাৎকালীন ঈশ্ববনিভবতা, পবোপকাবী হিতৈষীগণপ্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে আকুলতা, তাঁহার ধর্মবিশ্বাস, তাঁহাব বাংলা গদ্য লিখিবার ধাবা ও পদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয অনাযাসে বোধগম্য হয। নিবেদনেব প্রাবম্ভে শ্রীহবিব নাম লেখা এবং শেষে সিদ্ধিদাতাব নাম স্মবণ—এই দুইটি বিষযেব প্রতি পাঠকবর্গেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। আর "কৈফিযতের 'পুনশ্চ'" শব্দটি বিশেষ লক্ষ্য করিবাব যোগ্য। আত্মজীবনীর নিবেদন লিখিতে গিযাও পবিহাসপ্রিয কবি পরিহাসেব ভাষা ছাডিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীহবি

নিবেদন

আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গেব ঐকান্তিক আগ্রহ যে, আমার জীবনের ঘটনাবলী আমি নিজে লিপিবদ্ধ করিযা যাই। এ সম্বন্ধে তাঁহাদেব একটা বদ্ধমূল ধাবণা আছে যে, যে ব্যক্তি কবিতা লিখিতে পারে, তাহার জীবনে একটু বৈচিত্র্য, একটু অসামান্যতা, নিতান্ত পক্ষে সাধাবণেব শিক্ষণীয় কিছু বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা সেই জীবনের ঘটনাসমূহ মনোজ্ঞ, চিত্তাকর্ষক ও জনসমাজের হিতকর হইতে পারে। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিমত অন্য

প্রকার হইলেও আমি এই ক্ষুদ্র অবতবণিকায তাহাদের সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি রাখি না। তর্ক করিবার সময আমার নাই।

প্রশ্ন এই যে, তবে এই নিষ্ফল, ব্যর্থ, নগণ্য জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার কি প্রযোজন? স্বর্গীয কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাব জীবনীর প্রারম্ভে অতি গম্ভীবভাবে এই প্রশ্নেব অবতারণা করিযা তাহার বিস্তৃত মীমাংসা কবিযা গিযাছেন। তাহার জীবনেব ঘটনাবলী এক বিবাট ব্যাপার। সুতবাং তাহার কৈফিযৎও তদনুরূপ বিস্তৃত। আমাব জীবন ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন, নীরস, সুতবাং আমার কৈফিয়ৎ সংক্ষিপ্ত ও সবল।

আমার প্রথম জীবনে উল্লেখযোগ্য ও লোকশিক্ষাব অনুকূল ঘটনা অতি বিরল। কিন্তু জীবনের শেষাংশেব ভূযোদর্শন সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে। আমি উৎকট বোগশয্যায শযিত। এই অবস্থায আমি যে সকল মহাপুরুষের সাক্ষাৎকাব লাভ কবিযাছি, তাহাদিগেব নিকট যে সকল উপদেশ শ্রবণ কবিযাছি, এবং এই জীবন ও মবণেব সন্ধিস্থলে দণ্ডাযমান হইযা, সম্পূর্ণরূপে অশবণ ও অনন্যগতি হইযা মঙ্গলমযেব চরণে একান্ত আশ্রয লইযা, যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ কবিবাব অবসব পাইযাছি, তাহা লিপিবদ্ধ কবিযা যাইতে পাবিলে, সাধাবণ জনসমাজেব কথঞ্চিৎ উপকাব সাধিত হইতে পারে,—এই বিবেচনায এই বৃহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ কবিলাম। এই আমাব ক্ষুদ্র কৈফিযৎ। আমাব মনে হয, আমি ক্রমেই লোকনিন্দা বা প্রশংসাব বাজ্য হইতে অপসৃত হইতেছি, অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনায আর আমার উপকার বা অপকাব, লাভ বা ক্ষতি, প্রসাদ বা বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

আরও বিবেচনা কবিযা দেখিলাম যে, আমাব এই দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র ক্লেশদাযক পীড়ার অবস্থা এবং আমাব বর্তমান আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিযা যে সকল পরদুঃখকাতর, মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আমার চিকিৎসার আনুকূল্য করিযাছেন ও এখনো কবিতেছেন, এবং এই নাতিক্ষুদ্র বিপদসাগরে পতিত অনাথ পরিবারের ভরণপোষণের যাবতীয ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার একান্ত সরল কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের এই উপযুক্ত অবসর। এটি আমাব কৈফিযতের 'পুনশ্চ'।

আর একটি কথা না লিখিলে, এই ক্ষুদ্র নিবেদন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমার ডায়েরি নাই, আমি কোনও স্থানে আমার জীবনের কোনও ঘটনা

ইতঃপূর্বে লিপিবদ্ধ করি নাই, সুতরাং স্মৃতিশক্তিটাকে মারিয়া পিটিয়া তাহার উদরগহ্বর হইতে আমার 'অতীত' যতটুকু বাহির করিতে পারিলাম, তাহাই লিখিযা রাখিলাম। ইহাতে মস্তিষ্কের প্রতি একটু নিষ্ঠুর পীড়ন করিতে হইল বটে, কিন্তু কি করিব। একদিকে বান্ধবদিগের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অপর-দিকে কঠোর কর্তব্যবোধ।

ডাযেবি না থাকায, আমাব জীবনীব অনেক স্থানে অসম্পূর্ণতা, অঙ্গহীনতা ও অসামঞ্জস্য পবিলক্ষিত হইতে পাবে, কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকব জীবনে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যাহাব সন বা তাবিখ না পাইলে, পাঠকগণের মনে কোনও অভাববোধেব সঞ্চাব হইতে পাবে। এ জীবনে কোনও পানিপথেব যুদ্ধ বা চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের মতো বিশিষ্ট ঘটনাব সমাবেশ হয় নাই, যাহাতে জনমণ্ডলী স্তম্ভিত ও চকিত হইযা মুগ্ধচিত্তে বিস্ফাবিতনেত্রে চাহিযা থাকিতে পাবে, অথবা কোনও জীবনীসংগ্রাহক কোনও আখ্যানাংশ-বিশেষেব সময় বা স্থান নির্ধাবণেব নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র বা উৎসুক হইতে পাবেন। সুতবাং আমাব ব্যাধিক্ষীণা ও বেত্রাঘাতপীড়িতা, বলহীনা, স্মৃতিশক্তিটুকু যদি কোনও স্থানে একটু আধটু কর্তব্য-স্খলনেব পবিচয প্রদান কবে, তাহাতে পাঠকবর্গের মনঃক্ষুণ্ণ হইবাব কোনও কাবণ থাকিবে না।

প্রথমে যখন 'নিবেদন' বলিযা স্বস্তিবাচন করিযাছি, আব এই কৈফিযৎটি ক্ষুদ্রকলেবব হইবে বলিযা পাঠকগণকে আশ্বাস দিযাছি, তখন 'ইতি' দেওযাই কর্তব্য। সিদ্ধিদাতার নাম স্মবণ করিযা এই ঘোব দাযিত্বপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, শেষ কবিযা যাইতে পারিব কি না, তাহা সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পাবে না। তাঁহার ইচ্ছায যদি লেখনীসঞ্চালনের দৈহিক শক্তি ও ঘটনাগুলি যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিবার মানসিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয, তবে সফলকাম হইব, নচেৎ মনের বাসনা মনেই রহিয়া যাইবে। ইতি—

কলিকাতা
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কটেজ নং ১২

শ্রীরজনীকান্ত সেনগুপ্তস্য

'আনন্দময়ী'র ভূমিকা

বিশাল হিমালয়পর্বতের কোনও অধীশ্বর কোনও কালে বর্তমান ছিলেন কি না, এবং তাঁহার গৃহে শক্তিরূপা ভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া লীলা করিয়াছেন কি না, এ সকল কূট প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াও এ কথা নির্বিরোধে ও অসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় কল্পনাকুশল প্রদেশ পৃথিবীতে আর নাই। এমন সুবিস্তীর্ণ উর্বর কল্পনাক্ষেত্র অন্যত্র কুত্রাপি নয়ন-গোচর হয় না। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সর্ববিষয়ে ভারতীয়েরা উজ্জ্বল আদর্শকল্পনার সৃষ্টি করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণোক্ত আখ্যায়িকাবলীর প্রতিপাদ্য বস্তুতে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসম্প্রদায় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও, এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ধর্মরাজ্যে ঐ সকল কল্পনার প্রয়োজন ছিল, এবং ঐ সকল কল্পনার দ্বারা মানবসমাজের বহুবিধ মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে গোপবংশে আবির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনে যথাবর্ণিত মধুর লীলা করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে নব্য যুবক সন্দিহান; কিন্তু কৃষ্ণলীলার কীর্তন-শ্রবণে এ পর্যন্ত কত পাষাণচিত্ত দ্রব হইয়া ভগবদুন্মুখ হইয়াছে, কত দুষ্কৃতের সৎপথে গতি হইয়াছে, কত অপ্রেমিক প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাই বলিতেছিলাম, কল্পনানিপুণ ভারতবর্ষে পৌরাণিক আখ্যায়িকা-বিশেষকে কল্পনা বলিয়া স্বীকার করিলেও, জনসমাজে তাহার মহোপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। কৈলাস হইতে জগজ্জননীর হিমালয়ে আগমন, দিনত্রয় পিতৃগৃহে অবস্থান, এবং বিজয়ার দিবস সমস্ত হিমালয়বাসীকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্তন,—এই আখ্যায়িকা কল্পনা হইলেও মহাকবিগণের সুনিপুণ তুলিকারঞ্জিত হইয়া, এমন উজ্জ্বল চিত্তোন্মাদক কাব্যসৌন্দর্য বিকাশ করিয়াছে যে, তাহা ভারত ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় কি না, সন্দেহ।

ভগবানকে সন্তানরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহাকে সন্তানজ্ঞানে তাঁহার সহিত তথাবদ্ব্যবহার, ভারতবাসী ব্যতীত অন্য জাতি কল্পনাচ্ছলেও নিজ মস্তিষ্কে কোনও কালে স্থান দিয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। তবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, মানসিক সমস্ত বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও চরিতার্থতা ভগবানেই সম্ভব হয়; কারণ তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ও নির্দোষ আদর্শ। যশোদার গোপাল প্রভাস-যজ্ঞে পিতামাতার চক্ষে যে গলদশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, মেনকার

উমা প্রতি বর্ষে শারদীয়া শুক্লা দশমীর প্রভাতে মাতৃনয়নে সেই উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়া কৈলাসে গমন করেন। উভয় দৃশ্যই মাতৃহৃদয়ের কোমল বাৎসল্যে ও অক্ষুণ্ণ স্নেহপ্রবণতায় এমন করুণ ও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে, 'প্রভাস' ও 'বিজয়া'ব, অসম্পূর্ণ, সদোষ, পার্থিব অভিনয় দর্শন করিয়াও অবিশ্বাসী, পাষাণহৃদয় অশ্রুসংবরণ কবিতে সমর্থ হয় না।

জগজ্জননীব পিতৃগৃহে আবির্ভাব 'আগমনী', এবং কৈলাসাভিমুখে তিরোধান, 'বিজযা' নামে অভিহিত। এই ক্ষুদ্র সংগীত-পুস্তকেব আদ্যাংশ 'আগমনী' ও শেষাংশ 'বিজযা'। পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং

'যাহারা যেভাবে আমাব শবণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি।' সুতরাং সম্যক ও যথাবিধ একাগ্র সাধনায় যে ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়া যায না, তাই বা কেমন কবিযা বলি ? তিনি তো ভক্তের ঠাকুব, যে তাঁহাকে যেভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন ; এ কথা সত্য না হইলে যে তাঁহাব করুণাময়ত্বে, তাহার ভক্ত-বৎসলতায় কলঙ্ক হয়। ধর্মজীবন ভাবতবর্ষ চিবদিন এই ধাবণায কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও অকুতোভয়।

উৎকট রোগশয্যায়, দুর্বল হস্তে এই সংগীতগুলি লিখিয়াছি। আব কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও, ইহাতে জগদম্বাব নাম আছে মনে করিযা, পাঠক অনাদব করিবেন না, এই বিনীত প্রার্থনা।

উইলের খসড়া

আমি উইল করব। আমার দরকার আছে। ছেলের মধ্যে নাবালক আছে। কোনও দরকার হলে একটি পয়সা খবচ করতে পারবে না। আমাকে কাগজ এনে দাও। সংক্ষেপে কবব। সমস্ত সম্পত্তির দানবিক্রয়াদি সর্বপ্রকার হস্তান্তর করবার ও সর্বপ্রকার সাময়িক ও কায়েমি ও অধীন বন্দোবস্ত কবার ক্ষমতা দিয়ে আমার স্ত্রীকে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব লিখে দেব। আর বলব যে, আমার যে-সকল দেনা আছে তাহা তিনি ঐ ক্ষমতায় যেরূপে সুবিধা বোধ করেন শোধ করিবেন। জজ সাহেবের অনুমতি লাগিবে না। কোনও ক্রেতা বা বন্দোবস্ত-গ্রহীতা দ্বিধা না করে। আমার স্ত্রীকে universal legatee-স্বরূপ এই উইলের executrix নিযুক্ত করলাম। তিনি প্রোবেট লইয়া দেনাশোধের বন্দোবস্ত

করিবেন এবং কন্যাগণের বিবাহের জন্য যে কোনও সম্পত্তি বিক্রয় পর্যন্ত করিতে পারিবেন। আমার বৃদ্ধা মাতাব সহিত যদি আমার স্ত্রীর অসদ্ভাব হয়, তবে তিনি জীবদ্দশা পর্যন্ত মাসিক ১০ টাকা হিসাবে মাসোহারা পাইবেন। এই মাসোহাবা ষ্টেট উল্লাপাড়াব অধীন বানিয়াগাতি গ্রামের নিজাংশ যাহা পত্তনি দিয়াছি, ঐ সম্পত্তির উপর charge-স্বরূপ গণ্য হইবে। আমার মাতা রাজশাহিতে ও বাড়িতে রীতিমতো বাসের ঘর ও সবকারি চাকর পাইবেন। তাহাতে কেহ কোনও আপত্তি করিতে পারিবে না। পৈতৃক যে-সকল ক্রিযাকলাপ আছে, তাহা আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রাখা না রাখা আমার উক্ত স্ত্রীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি সাবালক ও নাবালক পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষাব জন্য আবশ্যক হইলে যে কোনও সম্পত্তি বিক্রযাদি— সকল প্রকাব বন্দোবস্ত কবিতে পাবিবেন।

আব আমাব স্ত্রী যে ছেলেকে যা দিতে ইচ্ছা কবেন, তাই দিযে যেতে পাবিবেন— দানপত্র লিখে। নইলে মেযেগুলো উত্তবাধিকাবী হয়। ছেলেদের না দিযে মেযেদেব কখনো দেবে না। সমস্ত সম্পত্তিব মালিক তিনি।

আনন্দ-বাজাব

বড়ো মাযায জড়িত হযেছি। এই সুখের হাটে দুঃখও অনেক আছে, তবু সুখগুলো তো মিষ্টি,—দুঃখগুলোও মিষ্টি লাগত। সেই হাট ভেঙে চলে যেতে ক্লেশ হয়। কিন্তু তা শুনে কে?

এই স্বর্গ, এই পৃথিবীতে স্বর্গ। ঐ মুখে যেন কার আভা পড়েছে। ভাই রে তুমিই দেবতা— মানুষেব মধ্যে দেবতা। আব একটা দিন তোদের দেখে যাই রে। আপনি আমাকে বড়ো মাযাতে ফেলেছেন। আমি তো মরব, কিন্তু আপনাদের জন্য আমাব মবতে ইচ্ছা হয না। ·

আমাকে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শোনাও। আমাকে কাঁদাও। আমার পাষাণ হৃদয় ফাটাও। প্রাণ পরিষ্কার কবে দাও, খাদ উড়াও। আমাকে আব কটা দিন বাঁচান। ভগবান আপনাব ভালো করবেন।···

আমি ব্যস্ত হই নি। একটা আনন্দ-বাজার লাগিয়েছিলাম, তাদের উপর মায়াটা যায় না। কি করি এইজন্য আব কটা দিন বেঁচে যেতে চাই।···

হা ভগবান রে! আমার প্রাণে শান্তি বর্ষণ করলে। সত্যি কি প্রাণভিক্ষা দেবে দয়াল! সত্যি কি আরো কিছুদিন বাঁচাবে দয়াল? ওরে দয়াল,

ওরে করুণাময়, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলে পিতা তবে এখন কোলে নেবে।

আমার লেখার বেশি আদর করবেন না। আদর করলে আমাব বাঁচতে ইচ্ছে করে। ··

আমার মনে হয যে, ভগবান কষ্ট দিযে দিযে বাঁচাবেন। এত লোক দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করুছে, এ কি সব ব্যর্থ হবে ? আর এই বুড়ো অথর্ব মা ? এ সুখেব হাট ভেঙে বড়ো অসমযে নিযে যায। · ভয় পাই নাই। যাব বলে ভয় কবি নে। এ আনন্দ-বাজাব ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে,—ভয হয না। · সেবার তো বাঁচিযে দিযেছিলে, এবাব প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে— যে বাঁচি, নইলে যে আনন্দ-বাজাব ভেঙে যায। আব হল না, অনেক চেষ্টা করলেম। আমাব এই আনন্দ-বাজার রইল, দেখিস।

· · ·

চন্দ্র দাদা বে, ভাই। মনে বেখো, আর বুঝি পাড়ি দিতে পারলাম না। আজকাব রাত্রি একটু আশঙ্কা লাগছে। আমাকে নেবে নেবে লাগে। এই সুখের হাট ভেঙে দিলাম রে ভাই। দুঃখিনী রমণী র'ল, তারে তুমি দেখো রে। ওবা যে কিছু করছে— জানে না বলে কত গাল দিযেছি। ভাই বে, না খেযে যেন মরে না। আমার বউ যে না খেযে মরে গেলেও জানাবে না যে, চাল নাই। উপবাস করবে— ঐ গুলো দেখো।

ধর্মবিশ্বাস

সব প্রার্থনা কি মঞ্জুর হয় ?

ইচ্ছা অনুসাবে যথন কার্য হয না সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার।

—কাঙাল হরিনাথ

ভগবান সকলেরই হৃদয়ে আছেন। গঙ্গা, কাশী প্রভৃতি সব মনেই—

'ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং শান্তি বরাননে॥

I would advise you, therefore, to offer my Puja without Sacrifice. Let see, if that would do some good to the family, We have been short-lived. The whole family is ruined so to speak.

What good has Sacrifice done to us ? Before the mother of all living beings we kill an innocent animal. Does this propitiate the Goddess ? ·

কষ্ট চক্ষে দেখলে ? আমার পাপের শাস্তি ভোগ করছি। তা না হলে কি এমন শাস্তি হয় ? ভগবান কি অবিচার করেন ? জীব নিজের কর্মফল ভোগ করে।

My idea all along is, that we ought not to sacrifice an innocent animal at the altar of the Goddess, whose grace we are going to invoke My father was of the same opinion. Specially we are going to celebrate a ceremony— ধর্মের নামে অধর্ম করতে চাই না। For a long time their family is offering sacrifices to the Goddess But of what earthly benefit has that been up to date ?

বিশ্বাস হারালে তো একেবারেই সংসার শূন্য হয়, কোনও আশ্রয়, কোনও অবলম্বন থাকে না। যা আভাস পাওয়া গিয়েছে, তা যদি ভগবৎ-প্রেরিত পূর্বাভাস হয়, তবে আমাকে কেউ রাখতে পারবে না। · বিধাতার দয়ার যেদিন অভাব হয়, সেইদিনই কোনখান থেকে কেমন mysterious way-তে এসে জুটে। ভাই কুমার, আমি যদি মরি,— আর কাছে থাক, ভাই, আমার কানে হরিনাম দিয়ো। হেমেন্দ্র, স্থরেন, আমার মৃতদেহের সঙ্গে একটা হরি-সংকীর্তন নিয়ে যেয়ো। কুমার, কাঙাল বলে কত দয়া— কত অনুগ্রহ। দেখ, যেন টাকার অভাবে আমার ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া অঙ্গহীন বা নষ্ট না হয়। ·

এই যত ক্রিয়া, যত ঔষধ, যত একভাবে থাকা, হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়া— এ সমস্তই ঐ মহাদেবের ক্ষেত্র। তাঁরই কাজ। তিনিই মূলাধার। আমার ৮০ বছরের মা ধরনা দিতে গেল, ব্যাকুল হয়ে— যে মরি তো শিবের পায়ে মরব। আমার ছেলে বাঁচলে— আর কি চাই। আমি নিজে একজন ভগবৎ-বিশ্বাসী। সবই তিনি, এতে আর দ্বিধাভাব, তা ভেবো না। বুড়ো মার জন্য কষ্ট লাগছে। মনে হয়, পুত্রগতপ্রাণা বুঝি নিজের প্রাণ দিয়ে ছেলের প্রাণ দিতে গেল।···আমার চোখের জল নয়,— মা আমাকে বড়ো মলিন দেখে আমার চোখের মধ্য দিয়ে চোখের জল ফেলছে।···

দেখুন, আমাকে এ কদিন যেমন দেখেছেন, তার চেয়ে একটু ভালো দেখছেন না? শান্তি-স্বস্ত্যয়নে নিশ্চয় গ্রহ প্রসন্ন হয়েছে বলতে হবে।...

আমার দয়াল তারকেশ্বর যদি রক্ষা করেন, তবে ওরা চুপ করুক, নইলে অন্য emergency watch কর।

ভগবান, আমার তো শারীরিক কষ্ট। আমার আত্মা তো কষ্টমুক্ত। দেহ মুক্ত হলেই আত্মা কষ্টমুক্ত হবে। তবে আত্মাকে দেহমুক্ত কর দয়াল, আর দেহ চাই না। দেহ আমাকে যত কষ্ট দিচ্ছে। আমার আত্মাকে তোমার পদতলে নিয়ে যাও।...খালি হরি বল্, বল্ হরি বল্, বল্ হরি বল্, খালি হরি বল্, আর কিছু নাই শুধু হরি বল্; আর চাই নে কিছু—শুধু হরি বল্, হরি বল্। এই রসনা জড়ায়ে আসে, বল্ হরি বল্।...আমার দয়াল ভগবান! আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে আমাকে তোমার করুণা-চরণে স্থান দাও, ভগবান।...ভগবানের কাছে ছোট বড়ো কিছু নেই।...অবশ্যি সকলের উপর ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর যে কি অভিপ্রায় তা তো আমরা বুঝতে পারছি না। তবে আমাদের বিবেচনায় যেটা সব চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত সেইটেই আমরা করে থাকি; বিধাতার ইচ্ছা তেমন না হলে সমস্ত উলটে পালটে যায়। এ তো রোজই দেখছি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যেমনই হউক, যা হবার হবে বলে বসে থাকা কি তাঁর অভিপ্রায় হতে পারে? তোমার বুদ্ধিতে যেমন হয় তেমনি করতে থাকো, তাবপর তিনি আছেন।...আমার মন থেকে পাপ-ইচ্ছা, পাপ-প্রলোভন এই কষ্টের তাড়নায় দূর হচ্ছে। যখন একেবারে হৃদয় এই সব আবর্জনা থেকে মুক্ত হবে, তখন মার কোলে যাব। তার আর বেশি দিন বাকি নেই।...যাঁর দয়ায় এ পর্যন্ত বেঁচে আছি, তাঁরই দয়ায় কষ্ট পাচ্ছি। নিচ্ছেন, আগুনে দগ্ধ করে পাপের খাদ উড়িয়ে দিয়ে নিচ্ছেন; তা তো মানুষ বোঝে না—মানুষ ভাবে, কষ্ট দিচ্ছেন।...এখানকার যারা, তাদের এই ৪৫ বৎসর ভজনা করে দেখলাম। তারা কেউ আমাকে একটু হরিনাম শোনায় না। না পেয়ে নিজেই স্তোত্র লিখি। যখন বড়ো ব্যথা হয়, তখন বলি—আর মেরো না, খুব মেরেছ, এখন তোমার চরণে টেনে নাও, এইখানে পৌঁছিলেই অবশিষ্ট আবর্জনাটুকু দূর হয়ে যাবে।...ভগবদ্দর্শনের পূর্বে সাধুর সাক্ষাৎ হয়। আমার তাই হয়েছে।...আমাকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে না দিলে খাঁটি হব কেমন করে? যত angularities আছে সব ভেঙে সোজা করে নিচ্ছে; নইলে পাপ নিয়ে, অসরলতা নিয়ে তো সেখানে যাওয়া যায়

না। একেবারে hardened sinner হবার আগেই আমার কানে ধরে বলছে, 'ও পথে যেযো না'— অসময়ে ধরে নি।

আমি যে বিচার দেখছি— splendid, এমন আর হয় না। Sub-judge, মুনসেফের সাধ্য নেই এমন বিচার করে। আমার সম্বন্ধে যে বিচার হচ্ছে, আমার কথাটি বলবার জো টি রাখে নি যে, punishment is untimely or too severe, এ বড়ো জবর Penal Code, অভ্রান্ত— নির্দোষ। আমার কথা শুনুন, আমাকে নিরুত্তর করে বেত মারছে।

বুদ্ধির দোষ অনেক আছে, অনেক হয়েছে। মানুষের কি মতিভ্রম হয় না? হলে কি করা যাবে? এ সব ভগবানের কাণ্ড। সুখ-দুঃখ কিছুই মানুষে গড়তে পারে না। তিনিই মতিভ্রম ঘটান, তিনিই অভাবে ফেলেন, তিনিই উদ্ধার করেন। মানুষ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। আজ আমার জীবনের জন্য হয়তো তিনি এই পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বেন। এ কি মানুষে করে? মানুষ কেবল মনে মনে আঁচে, সংকল্প তার। দরিদ্রতা তিনি ঘটান— কুমতি, ভ্রান্তি দিয়ে, আবার সম্পদ দেন সুমতি দিয়ে। নইলে কত চেষ্টা করে লোকে অর্থ করে, এক দিন ডাকাত পড়ে সব নিয়ে যায়—তার পরদিন সে ফকির। এ কে করায়? আমার যে দোষ তাও আমার পরিহার করবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা করলেও পারি নে, এমনি কর্ম আর অদৃষ্ট। এটা ঠিক জেনেছি যে, যত শাস্তি তত প্রেম। এ তো কষ্ট নয়। সে যে তাঁর কাছে নিতে চায়, তা আগুনের মধ্য দিয়ে, খাদ পুড়িয়ে নির্মল, উজ্জ্বল না করলে কেমন করে সেখানে যাব? যার দেহাত্মিকা বুদ্ধি তার কষ্ট। দেহ যে কিছুই নয়, তা বুঝতে পারলে গলার বেদনায় আমার কি করতে পারে? দেখুন ব্রজেনবাবু এ কষ্ট আর কষ্ট বলে মনে করি না। আমাকে আগুনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে, খাদ উড়িয়ে দিয়ে খাঁটি করে কোলে নেবে, নইলে ময়লা নিয়ে তো তার কাছে যাওয়া যায় না। এ তো মার নয়, এ তো কষ্ট নয়— এ প্রেম, আর দয়া। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে পরিষ্কার করে নেবে। গায়ের ময়লা মাটি ঝরে পড়বে কেমন করে— বেতের আঘাত না দিলে? আর এই মার যদি মরণের পর মারত, আমার কষ্ট কত, কারণ সেখানে আর শুশ্রূষা করবার কেউ নেই। সেই জন্য স্ত্রী-পুত্রের সামনে মারছে যে, কাজও হয়, কষ্টও একটু লঘু হয়। ভাই রে এ তো মার নয়, এ যে রোজকার প্রত্যক্ষের মতো অনুভব। রোজ মারে আমি কি দেখি না? আমি মার খাই

পড়ে, দেখবার চোখ আমার নাই। মতি ভগবদভিমুখী করবার জন্য এই দারুণ রোগ, আর দারুণ ব্যথা, আর কষ্ট। ··

তখন আমাকে যা লিখিয়েছিল তাই লিখেছিলাম, এখন যা ভাবাচ্ছে তাই ভাবছি। রাত্রিতে ঘুম আসে না, রোগী মনে করে—বাত আসে, না যম আসে, আমার মনে হয়, বাত এলেই বেশ নীরব নিস্তব্ধ হয়, তখন মার খাই বেশি, আর প্রেমের পরীক্ষায় পড়ে কত সান্ত্বনা পাই। কষ্ট মনে হয় না, বেশ থাকি।

সে জগৎ ভালোবাসে, আমাকে ভালোবাসে না? তাকে ভুলেছিলাম, তা সে ছেলেকে ছাড়বে কেন? যেমন করে বাপের কথা মনে হয় তেমনি করেই মারবে। আর বাপ তো যেমন তেমন বাপ নয়, যে বাপ সব দিয়েছে।

এই শেষ দেখা মনে করে আশীর্বাদ করে যান—'শিবা মে পন্থানঃ সন্তু' বলে। পথে যেন কোনও বিপদ না হয়। যেন সোজা নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারি। মন স্থির করব না তো কি? হিন্দুর ছেলে গীতার শ্লোক মনে আছে তো? 'বাসাংসি জীর্ণানি' etc. অমন তো কতবার মরেছি। মরতে মরতে অভ্যাস হয়ে গেছে। এইখানে স্ত্রী পুত্রের সামনে মারছে যে, কাজও হয়, একটু কষ্টেরও লাঘব হয়। দেখছ দয়া? দেখছ প্রেম? চন্দ্রময়। আমি রাত্রিতে ঘুমাই না, বেশ থাকি, বড়ো ভালো থাকি। আমি যেন তাকে রাত্রিতে ধরতে পারি—এমনি অবস্থা হয়। আমাকে বড়ো কষ্টের সময় বড়ো দয়া করে। আমি এখন বেশ সহ্য করতে পারি। খুব acute pain-এও আমার কষ্ট হয় না।

দেখুন, শাস্তি না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কত জন্মজন্মান্তরের পাপ পুঞ্জ হয়ে আছে; ভগবান তো উচিত বিচার করবেনই, তার শাস্তি দেবেন না? এই শাস্তি ভোগ করছি, এতে দেহমনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। যেমন তেতো ওষুধ খেতে কষ্ট, কিন্তু বড়ো উপকারী, এ শাস্তিও আমার তেমনি। এতে বড়ো উপকার হয়। চিত্ত একেবারে পৃথিবীতে শান্তি না পেয়ে ভগবানের দিকে ছোটে। তাই বলি যে, এ বড়ো মঙ্গলজনক কষ্ট পাচ্ছি। তাই সহ্য করতে পারছি। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছা হলে বাঁচতেও পারি। এই দেহাত্মিকা বুদ্ধি হয়েই যত কষ্ট। নইলে শরীরের পীড়ায় কেন কষ্ট হবে। শরীরটা তো খাঁচা, ভেঙে গেলে পাখিটার কষ্ট কি? ওটা তো দেহের বেদনা। ওতে কষ্টজ্ঞান না করলেই হয়।

বাস্তবিক মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখলেই আনন্দ হয়, লোকে তাকে আদর্শ করে।...

আমি এখন ভগবানের নামে আছি। আমার ব্যথা না কমলে আর প্রাণী হত্যা করব না।

আমাকে ভগবান এমনি করে পদে পদে সাহায্য করছেন; কেন যে, তা আমি কিছু বুঝতে পারি নে। যে ব্যাধি দিয়েছেন তাতে তো 'অদ্যশ্বীন বা কতিপয়দিনে' যাওয়া নিশ্চয়, তবে এত যে কেন করছে দয়াল, তা আমার মনোবুদ্ধির অগোচর। কিছুই ঠাওর পাই নে।

Education Department-এর লোক দেখলে আমার বড়ো আনন্দ হয়, ওঁরা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমরা যেমন quibble in law নিয়ে বিচারকের চোখে ধুলো দিতে চাই, তেমনি অন্যান্য ব্যাবসাতেও dishonesty আছে। ওঁদের কাছে dishonesty-ও নেই, মেকিও চলবার উপায় নেই।..

দেবতা, আশীর্বাদ করে দিয়ে যাও। সমস্ত সারল্য আশীর্বাদরূপে আমার মাথায় ঢেলে পড়ুক। দেবতা, কতদিনের বাসনা যে পূর্ণ হল। পথে দেবদর্শন হল, গিয়ে বলব।..

আশীর্বাদ করুন, যেন মতি ভগবন্মুখিনী হয়। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি অচলা হয়, আর সংসারে আমার কে আছে? আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। তিল তিল করে যাচ্ছি। ভাই, ভজনসাধন কিছুই জানি না! আমার দয়াল ভগবান দয়া করে যদি চরণে স্থান দেয়, ভাই রে! ·এই দেখুন, মায়ের কোলে মরবার বল। আমার মনের বল নাই? আছে কার? বীরের মতো মরব। দাঁড়িয়ে দেখতে পারবেন না? দয়ালের নাম আমার মুখে, আর গঙ্গাজল আমার গায়। এ কেমন মৃত্যু? বাবা! মহারাজ! এ কেমন মৃত্যু!...আপনি বুদ্ধিমান, জীবন আর মরণের সন্ধিস্থল দেখে যান। সে সন্ধিস্থলটা বড়ো আশ্চর্য স্থান। লোক-বিশেষের নিকট আমি বড়ো পবিত্র—লোক-বিশেষের নিকট আমি অতি নির্বোধ।

প্রার্থনা

দয়াল আমার, আমার অপরাধ মার্জনা কর। মার্জনা কর দয়াল! সকলেই একলা যায়, আমিও একলা যাব। চরণে স্থান দিয়ো। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই।...ভগবান, দয়াময়, আমাকে শ্রীচরণে স্থান দাও। বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।

কথা বন্ধ, বলবার জো নাই। আমি অধম, পায়ে পড়ে আছি। আমার গতি হোক দয়ার সাগর। আমি আর সইতে পারি না। করুণাময়! আর কষ্ট সইবার ক্ষমতাও আমার লুপ্ত করেছ! আর মান, যশঃ, কীর্তি চাই না, অর্থও আমার জন্য চাই না—এই অনাথগুলোর জন্য চাই। কিন্তু তোমারই কাছে রেখে যাই, দেখো পিতা তোমারই পরিবার—সমস্ত অনাথ গরিব। হে দয়াল, প্রাণবন্ধু, হৃদয়নিধি, এত কাল পরে কি আমার কথা মনে পড়ছে করুণাসাগর। আমি ধূলিময়, পাপী, শাস্তিতে তো সব শোধ যায় না, তবে এত দয়া কেন হল ?

আনন্দময়ি, আমার আরাধনার মা! আমার ভালোবাসার মা! আমার বড়ো স্নেহের মা! আমার ক্ষমার ছবি মা! আয় কোলে নে। আমি পরিশ্রান্ত, বড়ো ক্লান্ত! কেন ভুলাও না! কেন একেবারে একান্ত তোমার পাদপদ্ম বড়ো কর না মা! সব ভুলাও মা রে! তোমার চরণপদ্মের অমৃত পাওয়ার আশায় বসে আছি মা রে!

আর কিছু চাইনে। পৃথিবীর সব দেখেছি, আর দেখতে চাই নে। আর দেখাস নে। এতে একবিন্দু কায়িক সুখ, আর কিছু নাই। মা, আনন্দময়ি রে! রজনীকান্তের মা কোথা রে? কোল পেতে আয় মা! সোনার সিংহাসনে বোস মা। বল, 'আমার ছেলে কই ? আমাকে মা বলে কাঁদত, সে ছেলেটা আমার কই ? মা বললেই শেষ জীবনে চোখে জল আসত, মা বলে বড়ো কাতর হত—সে অধম ছেলেটা কই ?' মা রে, 'আনন্দময়ী' লিখেছি শোন্ মা! একবার ডেকে কোলে নে তো মা। আর আমি খেলনায় ভুলব না। শ্রীচরণে স্থান দেবে, তবে এখান থেকে উঠব।

ভগবান আমার দয়াল! আমার পরম দয়াল, আমার সর্বস্বধন, আমার সর্বনিধি, আদি সর্বনিয়ন্তা, কোল বুঝি পেলাম না, না পেলাম—তুমি কোলে নিলে, তুমি পায়ে স্থান দিলে, অন্যে কাজ কি ? রাজশক্তি দরকার কি নাথ ? ও আমার কি স্থান! হায় মা, তোমার কোলের চেয়ে কোন জিনিস বেশি শীতল হয় ? বেশি অমৃতময় হয়। অমৃত দিয়ে ধুয়ে নিয়ো, আর কি আক্ষেপ, দয়াল। আমাকে যদি তুমি না দেখে চলে যাও, বড়ো বিপন্ন বড়ো কষ্টে পতিত হই। মা রে! স্নেহ দিয়ে ভিজাও মা!

হে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! তুমি আমাকে কোলে নাও। তুমি দয়া করে কোলে নাও। প্রভু, চিন্তামণি, আমি কি গিয়ে তোমায় দেখতে পাব না হরি ? তুমি

দেখা দেবে না? তবে এ পাপী, অধমের আর উপায় নাই। দয়াময় করুণা-প্রস্রবণ, তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি আমার দশা দেখে আমাকে মুক্তি দেবে না? আমাকে যে এত যশঃ, এত সম্ভ্রম দিলে—তবে কেন দিলে? আমি তো চাই নে নাথ! দুঃখমুক্তি চাই। দুঃখ যেন আর না পাই। সে দিন কি হবে, দয়াল! কত অশান্ত, কত অধম, কত পাপপীড়িত সন্তানকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। আমাকে কোলে নেবে না হরি? দয়াল, এসো একবার দেখাও তোমার ভুবনমোহন মূর্তি। যা দেখলে পাপপ্রবৃত্তি থাকে না, যা দেখলে আর কিছুই দেখবার পিপাসা থাকে না। জীবনী নিজে লিখতে চেয়েছিলাম, তা জীবনে বের হল না। দয়াল রে! বুড়ো মাকেও দেখো। বড়ো দুঃখিনী পত্নী রহিল, বড়ো হতভাগিনী— তোমারই চরণে রেখে যাচ্ছি।···

অন্ধকার হয়ে আসে। তা এলই বা, এত লোক তোমার কাছে গেছে, আমার অত ভয় কি? গঙ্গাজল মুখে দিয়ো হিরণ রে!

আমাকে বিপদবর্জিত স্থানে নিয়ে যাও হরি! নিয়ে যা মা! আমাকে আর এই বিপদের স্থানে রাখিস না মা, এই বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তুলে নাও। মাগো, করুণাময়ি, কোলে নে মা!···

বড়ো কষ্ট রে হীরা, বড়ো কষ্ট। হরি হে দয়াল, সোজা হয়েছি আর মেরো না। এখনো নাও। আর কিছু করবো না, হরি! এখন তোমার কাছে টেনে নাও। আমার যে দোষটুকু আছে, তা তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিলেই সব চলে যাবে। হরি, আমি ডাকি নি, এখন ডাকাও। আমি তোমায় ভালবাসি নি, আজ বাসাও। তুমি না হলে আমায় বল কোথায় হরি? তোমার কাছে টেনে নাও, শীঘ্র টেনে নাও। দয়াল, আর কষ্ট দিয়ো না। খুব মেরেছ, আর মেরো না।···

আমাকে দেখতে আজ যে মহাপুরুষ এসেছেন, আমি তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি, পথে যেন আমার আর বিঘ্ন না হয়।···

যা ভগবান করান, আমি তাতেই গা ঢেলে বসে আছি। আর বিচার করি নে। যা হয় হোক্। এক মৃত্যু— তার জন্য ভগবানের পায়ে পড়ে আছি।···

এই ঘটনা মঙ্গলময় করেছেন, তাঁর বিধান মানো, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে চিত্ত স্থির করো। আমি যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।···আমি বলি, সে চিন্তাই তোমার বৃথা, সুতরাং অকর্তব্য। যাঁর হাতে জীবনমরণ, তাঁর উপর ষোলো আনা নির্ভর করে, কেবল তাঁর চরণ চিন্তা কর।···

আমি গেলে কারো কিছু যাবে না, Dr Ray, কেবল সম্ভ্রান্ত পরিবারকে পথে বসিয়ে গেলাম। কিন্তু এ-সব করলে দয়াল আমার— খাদ উড়িয়ে খাঁটি করবার জন্য। মার নয়, প্রহার নয়, কষ্ট নয়, ব্যথা নয়— শুধু প্রেম, শুধু দয়া। ·

দেখ সুরেন, আমি যখন 'ভগবান, দয়াল, আমার দয়াল রে' লিখি, তখন ভাবে আমার চোখ জলে ভরে উঠে। মনে হয় এখুনি হোক। যা হয় এখুনি হোক। মনে হয় দিন এগিয়ে আসুক। তোরা ভাবিস— কেঁদে তোদের চিত্তের বল পর্যন্ত হরণ করছি। না, তা নয় রে। সব করেছিস, এখন আমাকে শুয়ে থেকে নিঃশব্দে মরতে দে। আমার প্রাণের বিশ্বাস, আর চক্ষের সামনে সে তেজস্বিনী ভুবনমোহিনী মূর্তি তোরা সাজিয়ে দে রে। আর উঠিয়ে কাজ নেই, সুরেন। কেন জাগাস, জাগিয়ে তোদের ভালো লাগে, আমার তো ভালো লাগে না। আমি ভগবানের উপর ভার দিয়েছি। আর কিছু চাই নে। আজ আমি আর সে রজনী নই। আমি মদবিহ্বল আত্মবিস্মৃত জীব নই। আমাকে সোজা করে, সরল করে, পবিত্র করে নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? নইলে পিতার কাছে যাব কেমন করে? সে যে বড়ো পবিত্র, বড়ো দয়াল। তোমার কাছে যেমন করে বলি, তেমন করে এক ভগবানের কাছে বলতে পারি, আর কারুকে কিছু বলি নে। ভগবানই তো আমার ভরসা, মানুষ তো আমার সবই করলে, তা তো দেখলেই। সবাই বললে— আর চিকিৎসা নাই। কাজেই ভগবান ভিন্ন আমার আর আশা নাই।

কি করবি আর, ভাঙা কুলো ফেলে রেখে যা রে। আমি এখুনি ভগবৎ-কৃপায় বাঁচব, না হয় মরব। কেউ খণ্ডাবে না রে। ভাই রে তোমার দোষ কি? তুমি চেষ্টা তো কম কর নি। হল না— বিধাতার মার, তোমার তো দোষ নাই।

ভগবান, দয়াল। আমি একটু ছেঁড়া কাপড়ও নিয়ে গেলাম না। চাই নে দয়াল, তোমার দয়া সম্বল করে নিচ্ছি। তাতেই হবে। তোমার নাম আমার কানে খুব উচ্চৈঃস্বরে বললে আমি এখনো শুনতে পাই। তাতে যে বন্ধুবান্ধবেরা কৃপণতা করে। দয়াল, তোমাকে সাক্ষী করে সব কথা বললাম। ··

মা আজ আমাকে এখনো আগুনে না দিয়ে কেবল শীতল কোলে স্থান দিয়েছেন। আমি আবার মার দয়া সহস্র ধারায় দেখছি, তোরা দেখ। 'মা জগদম্বা' 'মা জগজ্জননী' বলে একবার সমস্বরে ডাক রে। ছেলে যেমন হোক, মা তো তেমন মন্দ হয় না। মন্দ যে মা হতেই পারে না। ··

আমার প্রাণের হরি রে। হরি রে—কোলে তুলে নাও, হরি রে! আমি নিতান্ত তোমার চরণে শরণাগত হয়েছি। আর ফেলো না। এ কি বিকাশ। একি মূর্তি প্রেমের। সখা, প্রাণবন্ধু, প্রাণের বেদনা কি বুঝেছ? এই যে তোমার নামে আমার বুড়ো দুঃখিনী মা পড়ে আছে। ৮০ বৎসর বয়স হল। তুমিই বল, তুমিই ভরসা। তুমিই দয়াময়—বাঁচাও। আমি সব দেখেছি। আমাকে যে ক্ষমা করে কোলে নেবে, সেও তুমি। আমার দয়াল রে। আর কেউ নাই রে দয়াল। স্থান দাও চরণে। শীঘ্র দাও, আর যাতনা বিচ্যুত কর। এই ক্ষুধা-পিপাসা তোমার পায়ে দিলাম। তোমার নাম করলে কষ্ট কত কমে, কত আয়েস পাই। আমার দয়াল জগদ্বন্ধু ডাকে, আমার মা ডাকে, আমার জগতের জননী ডাকে। না, ভাই রে জ্বলে পুড়ে মলাম। আগুনে ফেলে দিয়েছে। আর ভালো মন্দ নেই। মার কোলে যাবার জন্য কি আনন্দ হয়েছে। সত্য আনন্দ। আগে ভাবতুম বই দু খানা যদি পারি, তবে দেখে যাই। সে-সব ভগবানের চরণে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তা আর ভাবি নে। মরি—বেশ, বাঁচি—বেশ। তার যা ইচ্ছা তাই হোক্। ভাবব কেন? আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। আমার ব্যারাম যে অসাধ্য। বেদবাক্য বলছি না, তবে যা খুব সম্ভব তাই মানুষ বলে, আমিও তাই বলছি। তবে তৈরী হয়ে থাকা ভালো। খুব ঝড় বয়ে যাচ্ছে, নৌকা ডুবে যাওয়াই তো বেশি সম্ভব, সেই ভেবেই লোকে হরিনাম করে। আমাকে আর আশা না দেওয়াই ভালো। কারণ আশা হলে, এই শরীরেও সংসারে জড়িয়ে পড়ি—চিত্ত ভগবানের দিকে যায় না। বাঁচব না মনে হলেই আমার এখন বেশি উপকার। কারণ সুস্থ থাকলে কেউ বড়ো দয়ালের নাম নেয় না। সবাই ব্যস্ত হয়, আমি হই নে। কোনও ঔষধে কোনও ফল হল না, এতেও কি বুঝা যায় না যে, মানুষের বাবার হাতে পড়েছে, তার উপর মানুষের হাত নেই। বাঁচবার জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করা গেল। কিন্তু বিধাতার প্রয়োজন হয়েছে, পার্থিব প্রয়োজনে আর আমাকে বেঁধে রাখবে কে? এই সব মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমাকে বাঁচাবার জন্যে, একটু কষ্ট দূর করবার জন্যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কত যত্ন, কত শুশ্রূষা করছে। কত লোক কত রকম করছে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যা, তাই তো ফলবে। মানুষে চেষ্টা করবার অধিকারী, ফল দেয় আর-একজন। বিচলিত হই নি, হবও না। মা এসে বসে আছে। বিচলিত হব কেন? মা-ই কোলে নেবে। দেখ এইবার তোর দাদার মাথা কেমন ঠিক

আছে। মার কাছে ব'সে আছে কি না, তাই আর স্বপন দেখে না। ভগবৎ-শক্তি ভিন্ন আমার ঔষধ নাই। তবু আজ ভগবান আমাকে নিজের পায়ের তলে একটু স্থান দিয়েছেন। আমাকে ভগবান দয়া করেছেন। মা আমার মা রে, কোলে নে মা, আমায় মার্জনা করে নে মা। আমার অসহ্য যন্ত্রণা মা। কোলে নে মা। মা রে, আমার মা রে, ডেকে ডেকে আনে না রে কেউ। একবার দেখা, একবার দেখা রে, যে কবে হোক কেউ দেখা।· ·

তবে বলা কথা কওয়া হল না। না হল।

৭

হাসপাতালে সাহিত্যসাধনা

হাসপাতালে দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে রজনীকান্ত যে ভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব। প্রবল জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাশির প্রাণান্তকর যন্ত্রণা, সর্বোপরি ভোজনকষ্ট— এই সকল দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্ত্রণা যুগপৎ মিলিয়া যে ভাবে তাঁহার দেহকে অনবরত পীড়ন করিতেছিল, সেই পীড়নের মধ্যেও তিনি যে সাহিত্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সুমধুর ধারা পান করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত হইয়াছে। অল্প একটু জ্বর হইলে বা শরীরের কোনও স্থানে ব্যথা বোধ করিলে আমরা কতই না কাতর হইয়া পড়ি। সাহিত্যসাধনার কথা দূরে থাকুক— সমস্ত জিনিসেই কেমন বিরক্তি বোধ হয়। অসুস্থ অবস্থায় মন প্রফুল্ল থাকে না— ইহা ধ্রুব সত্য, আর মন প্রফুল্ল না থাকিলে কোনরূপ সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করা যায় না— সাহিত্যরচনা ত দূরের কথা। শারীরিক সুস্থতাই সাহিত্যরচনায় সাহায্য করে, অসুস্থ অবস্থায় মনের বিকার জন্মে, সেই মানসিক বিকারই সাহিত্যরচনার অন্তরায় হইয়া দাড়ায়। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়নকালে গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক এই কথাই লিখিয়াছিলেন—

'যাঁহারা কবি, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকেন, ততদিন সুস্থ থাকিতে পারিলেও, সুখের পরিসীমা থাকে না। এ জগতে সুস্থতার অপেক্ষা মহামঙ্গলময় ব্যাপার আর কিছুই নাই। সুখ বল, সন্তোষ বল, আনন্দ বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, শক্তি বল, উৎসাহ বল, অনুরাগ বল, চেষ্টা বল, যত্ন বল, ভজনা বল, সাধনা বল— যে-কিছু বল, এই সুস্থতাই সেই সকল বিষয়ের মূল ভাণ্ডার

হইতেছে। দেহ রোগাক্রান্ত হইলে ইহার কিছুই হয় না, মনের মধ্যে কিছুই ভালো লাগে না। কিছুতেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই সুখের উদয় হয় না, বল, বিক্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয়, বিভব সকলই মিথ্যা হয়, পরমেশ্বরের প্রতি যথার্থরূপ ভক্তির স্থিরতা পর্যন্ত হইতে পারে না।'

আমাদের রজনীকান্ত গুপ্তকবির এই উক্তির—সর্বজনগ্রাহ্য এই সাধারণ সত্যের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। হাসপাতালে রোগশয্যায় নিজের জীবন ও কার্যদ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—দৈহিক সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা—যতই নিদারুণ হউক না কেন, উপেক্ষা করিয়া, সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্যরস সৃষ্টি করিতে পারা যায়। সুস্থ অবস্থায় রজনীকান্ত যে ভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া জনপ্রিয় কবিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, অসুস্থ অবস্থায় লিখিত তাঁহার কবিতা তদপেক্ষা কম আদৃত হয় নাই। আনন্দবাজারের মাঝখানে সুখের কোলে বসিয়া যে রজনীকান্তের লেখনীমুখে একদিন বাহির হইয়াছিল—

(আমি) অকৃতী অধম বলেও তো মোরে কম করে কিছু দাও নি ;
যা দিয়েছ তারই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি।

দুঃখযন্ত্রণার বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া, শত অভাব-অনটনের মধ্যেও সেই রজনীকান্তই লিখিলেন,—

কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ-নয়ন কর অন্ধ ;
চির-যবনিকা পড়ে যাক হে, নিভে যাক রবি, তারা, চন্দ্র।
হরে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক জলদের মন্দ্র ;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসারন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ ;
স্পর্শ হর হে হরি, লুপ্ত করে দাও অসাড়, নিস্পন্দ।
(তুমি) মূর্তিমান হয়ে এস প্রাণে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।

অবস্থাবিপর্যয়ে ভাবের কি সুন্দর পরিবর্তন—পরিবর্তনই বা বলি কেন—ভাবের যে বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহা উপরি-উদ্ধৃত কবিতা পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

রোগের যন্ত্রণা যখন প্রবল হইতে প্রবলতর হইত, তখন একমাত্র কবিতা রচনাতেই তিনি শান্তি বোধ করিতেন। চিকিৎসক ও বন্ধুবান্ধবগণের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, 'যন্ত্রণা যখন খুব বেশি বাড়ে, তখন এই কবিতারচনা ছাড়া আমার শান্তির আর দ্বিতীয় উপায় থাকে না।' তাই হাসপাতালে সাহিত্য-

সাধনা মগ্ন রজনীকান্তকে দেখিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন—

'তাঁহার কবিতা তো সুন্দরই, কিন্তু কবিতাপেক্ষাও মৃত্যুশয্যায় তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাব আমার নিকট বেশি সুন্দর বোধ হইত। মৃত্যুভীতি তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহার ভাবময় জীবনের মধুরতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার ন্যায় ভাবুক কবির জন্ম বাঙালি জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে।'

রোগের যন্ত্রণা তাহাকে যতই ক্লিষ্ট করিত, শ্বাস ও অনাহারজনিত কষ্ট তাঁহাকে যতই আঘাত করিত, রজনীকান্তের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কবিতার উৎস ততই উৎসারিত হইয়া ভাষার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। ধূপ দগ্ধ হইয়া যেমন আপনার সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করে, রজনীকান্তও তেমনি যন্ত্রণার দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া কবিত্ব-মন্দাকিনীধারায় সমগ্র বাঙালি-জাতিকে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। দৈহিক যন্ত্রণা তাঁহার এই সাধনার অপরাজেয় মূর্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে তাহার সংকল্পিত সাধনার পথে কোনও প্রকার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে নাই।

হাসপাতালের প্রথম অবস্থায়, তিনি আমাদের দেশের ভবিষ্য আশাস্থল বালকবালিকাগণের মধ্যে 'অমৃত' বণ্টন করিলেন। 'যে-সকল নীতিবাক্য সার্বজনীন ও সার্বকালিক, যাহা জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব নহে, যাহা অমর সত্যরূপে চিরদিন মানবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ও অনন্ত কাল করিবে'— তিনি সেইরূপ বিষয় লইয়া চল্লিশটি অমৃতকণিকা অষ্টপদী কবিতায় রচনা করিলেন। 'অমৃতে'র কয়েকটি কবিতা হাসপাতালে আসিবার পূর্বে 'দেবালয়' নামক মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, বাকিগুলি তিনি ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মধ্যে রচনা করেন। শীর্ণদেহে ও দীর্ণমনে তিনি কি সুন্দর ও সরল নীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, দুইটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় দিতেছি।

ক্ষমা

'দশবিঘা ভুঁয়ে ছিল আশি মন ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ—
খেয়ে গেছে প্রতিবাসী গোয়ালার গোরু।
খেতগুলি পড়ে আছে, শ্মশান, কি মরু!

ক্ষেতের মালিক, আর গোরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাড়ি, চাষা বলে, 'ঠিক—
আহার পাইয়া পথে, পরম সন্তোষ,
গোরু তো বুঝে না কিছু, ওদের কি দোষ?'

কথার মূল্য

নিতান্ত দরিদ্র এক চাষির নন্দন
উত্তরাধিকারস্বত্বে পায় বহু ধন,
সে সংবাদ নিয়ে এল ব্যবহারজীবী,
বলে, 'চাষি, এত পেলি, আমারে কি দিবি?'
চাষি বলে, 'অর্ধভাগ দিব সুনিশ্চয়'।
গণনায় অর্ধ অংশে কোটি মুদ্রা হয়।
সবে বলে, 'কি দলিল? কেন দিতে যাস?'
চাষি বলে, 'কথা দিয়ে ফেলিয়াছি--বাস।'

মহা আগ্রহে ও সাদরে রুগ্ন কবির এই অমৃতভাণ্ড বাঙালি মাথায় করিয়া লইল এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল—'অদূর ভবিষ্যতে ইহার অনেকগুলি কবিতা "প্রবচনে' পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শিশুরা এই 'অমৃতে" নবজীবন লাভ করিবে—যাঁহারা শিশুর জনকজননী হইয়াছেন, তাহারাও এই "অমৃতে" সঞ্জীবনীসুধা পান করিবার অবকাশ পাইবেন।'

কার্য দ্বারা বঙ্গবাসী অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাদের এই উক্তির সার্থকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে 'অমৃতে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুই মাসের মধ্যে লোকের হাতে হাতে প্রথম সংস্করণের হাজার কপি বিক্রীত হইয়া যায়। আষাঢ় মাসে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণের হাজার সংখ্যাও নিঃশেষিত হয়। শ্রাবণে ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছিল।

এই দীর্ঘকালব্যাপী অসহনীয় রোগযন্ত্রণার মধ্যে নিরাশা ও আশার, অন্ধকার ও আলোকের, ভুলভ্রান্তি ও সত্য নির্ণয়ের যে যুগপৎ সমস্যা তাঁহার মানসপটে রেখাপাত করিতেছিল, তাহারই মনোজ্ঞ ও পরিস্ফুট চিত্র একে-একে তাঁহার লেখনীমুখে কবিতার আকারে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি যেন তাঁহার জন্মান্তরের

মি বুঝিতে পারিয়া, ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া, উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত প্রা... চরণে লীন করিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে আত্মনিবেদন করিতেছেন—

'মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে ?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্ধ্বে ধরিবে কে ?
রক্ত বহিবে মর্ম ফাটিয়া,
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া
ধর্মপক্ষে শর্ম-লক্ষ্যে
মৃত্যু বরিবে কে ?
অক্ষয় নব কীর্তি কিরীট
মাথায় পরিবে কে ?' —
বলিয়া, সেদিন হুংকার ছাড়ি
ছিন্ন করিনু পাশ,
(হায়) ধর্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করিনু সর্বনাশ।
চেয়ে দেখি কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,
আমার ধ্বনির উত্তর শুধু
মানবের পরিহাস,
(আমি) ধর্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করেছি সর্বনাশ।
এই অন্ধ, মত্ত উদ্যমে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডি-বাহিরে
করিনু আসন দান,
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,
ভেঙে দিল মোর শিবহীন যাগ,
সকল দম্ভ ধুলায় ফেলিয়া
আজ ডাকি 'ভগবান'

হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ,
কর তোমাগত প্রাণ।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার লেখনীমুখে সেই সর্বজন-সমাদৃত গানখানি বাহির হইল—

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব করিতে চুর,
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলই করেছে দূর।
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর,
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর,
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম, 'আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সংগীত ভালোবাসে দেশ',
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর,
আমায়, কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব করিতে চুর!

দিবসরজনী দেবপূজার জন্য পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তিনি আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন, কখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় দয়িত আসিয়া তাঁহার মানস পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন—তাঁহাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। সন্ধ্যাসমাগমে তাঁহারই সন্ধান-আশায় ব্যাকুল হইয়া রজনীকান্ত লিখিতেছেন—

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহাব্যোম-তলে
সুগম্ভীর নীরবতা মাঝে,
ফুল্ল শশী কোটি কোটি দীপ্ত গ্রহদলে
আলোকের অর্ঘ্য লয়ে সাজে।
তোমারই কৃপার দান দিবে তব পদে,
চন্দ্রতারা সবারই বাসনা,
কিন্তু সে চরণ কোথা? গেলে কোন্ পথে
স্নিগ্ধ হবে দীন উপাসনা?
কোটি কোটি গ্রহ, লোকে পায় নি খুঁজিয়া,
আরাধনা হয়েছে বিফল,
বিক্ষিপ্ত হৃদয় লয়ে নয়ন বুজিয়া
বসে থাকা, মন রে, কি ফল?

সন্ধ্যা চলিয়া গেল। রাত্রি আসিল। নিশীথ নিস্তব্ধতার কোলে সমগ্র ধরিত্রী যখন সুপ্তিমগ্ন, কান্তের চক্ষুতে তখন নিদ্রা নাই। তাঁহার ভক্তিনম্র হৃদয়ের শ্বেতশতদল সেই চিরসুন্দরের পূজার জন্য পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহ-বিধুর কান্তের লেখনীমুখে তাহারই আভাস ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে—

নিশীথে গগন স্তব্ধ, ধরা সুপ্তি কোলে,
গম্ভীর, সুধীর সমীরণ,
জলে স্থলে মধুগন্ধী কত ফুল দোলে,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণ।
আমি যুক্ত করে—'এসো, পূজা লও প্রভু।'
বলে কত ডাকিনু কাতরে,
মায়াময় লুকাইয়া রহিলে যে তবু?
খুঁজে কি পাব না চরাচরে?
দুর্বল এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে
কাঁদে নাথ! এ বেদনাতুর,
দেখা দিয়ে, পূজা নিয়ে রাখ পদতলে,
চাও নাথ, বিরহবিধুর।

সারা রাত্রি ডাকিয়া ডাকিয়া, চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কান্তের প্রাণ দেবদর্শন-লালসায় অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উষার আলোক যখন

ধীরে ধীরে ধরণীর অন্ধকার দূর করিয়া দিল, মঙ্গলময়ের মঙ্গল-আরতির শুভ শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি যখন দশ দিক মুখরিত করিল, তখন রজনীকান্তের হৃদয়শতদলের মাঝখানে তাঁহার হৃদয়দেবতা আবির্ভূত হইলেন। আনন্দবিহ্বল কবি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে লিখিলেন—

প্রভাতে যখন পাখি, গাহিল প্রভাতি
আলোকে বসুধা ভরপুর,
পূর্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ, ধীর, সমীর মধুর,
মঙ্গল আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতিগান।
কোথায় লুকালে প্রভু? মুক্ত চরাচরে,
বলে দাও তোমার সন্ধান।
অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার,
মুদিয়া আসিল দু-নয়ন
দেবতা কহিল ডাকি, 'মানসে তোমার
আনো পূজা, করিব গ্রহণ।'

কান্তের মানসমন্দিরে তাঁহার আরাধ্য দেবতা যখন আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন, যখন জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কান্ত তাঁহার জীবনের জীবনকে দর্শন করিলেন, তখন ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি লিখিলেন—

আজি, জীবনমরণসন্ধি রে।
প্রভু কোথা ছিলে? আহা দেখা দিলে,
এই জীর্ণ হৃদয়মন্দিরে!
(ওগো বড়ো মলিন) (ওগো বড়ো আঁধার।)
এই যে সুত জায়া, ওদের বড়ো মায়া,
(ওরা) সাধনপথের দ্বন্দ্বী রে।
(ওরা ভজন-বাধা) (ওরা আপন কিসের?)
ওরা কত ছলে, সুখ দেবে বলে,
(আমায়) রেখেছিল, করে বন্দী রে।
(এই মোহের কারায়) (এই বন্দীশালে।)

আর নাহি বাকি, এখন মুদি আঁখি,
(রাখ) বুকে অভয়চরণ ধীরে।
(আমার সময় গেল) (আঁধার হয়ে এল।)

তখন তাঁহার মানসনয়নের সমক্ষে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত দয়াল ঠাকুর অপরূপ ভুবনমোহন বেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তন্ময় হইয়া কান্ত তাহার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। চোখের জল দরবিগলিত ধারে পড়িতে লাগিল। ভাবমগ্ন রজনীকান্তের এ সমাধি তাঁহার রোগশয্যার সহচর হেমেন্দ্রনাথের আগমন ও আহ্বানে ভঙ্গ হইল। তাঁহার চোখে জল দেখিয়া হেমেন্দ্রনাথ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার কি বড়ো কষ্ট হচ্ছে? কাঁদছেন কেন? ইনজেকশন দেব কি?' রজনীকান্ত মুখ তুলিয়া হেমেন্দ্রনাথের দিকে একবার চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি রচনা করিয়া হেমেন্দ্রনাথের কথার উত্তর দিলেন—

১

আমি কাঁদি যার তরে
সে যে মোর অন্তরের হিয়া
মরমের সবটুকু
জীবনের সবটুকু দিয়া।
তাহে কি আপত্তি তব?
প্রিয়তম, কেন দিবে বাধা?
এ যে মৌনী হৃদয়ের
প্রাণভরা প্রেম দিয়ে সাধা।
ভাই রে হেমেন্দ্র, আমি
ব্যাকুল হইয়া যদি কাঁদি,
পবিত্র আদেশ তাঁরই
(তুমি তো জানিছ মোর)
কি কঠিন ক্লেশকর ব্যাধি।
আমারে শুনায়ে বীণা
কোথা হতে নির্জন প্রদেশে
নিয়ে তো যায় না তাই
কাঁদি, কোথা রব পরদেশে।

সে বাঁশি, সে বীণা মোর
কেমন করুণ স্বরে বাজে ,
আমি কোথা উড়ে যেতে
চাই উধাও হইয়া দীন সাজে।
তুমি ভাবিতেছ বুঝি
মিথ্যা বেদনার তরে কাঁদি,
ছি ছি বন্ধু, ছি ছি সখা।
আমারে কোরো না অপরাধী

২

দাও ভেসে যেতে দাও তারে।
ঐ প্রেম মেশা পরমেশ পাদোদক,
তাহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে
দিয়ো নাকো বাধা , যেতে দাও।
আমার মরাল-মন ঐ চলে যায় কার গান গেয়ে,
শোন, ঐ স্রোতোবেগে মধুর তরঙ্গ তুলি,
যেতে দাও।
বুঝিয়ো না, ওটিও চলে যাক
আসিয়াছে যেথা হতে,
সে চরণে ফিরে চলে যাক ,
দিয়ে যাক এ তৃষায় কাতর
পৃথিবীরে সুশীতল সুমধুর ধারা,
অমর করিয়া যাক বহি।
ঐ অশ্রুটুকু এ জীবনে মরালের পাথেয় মধুর,
সেটুকু নিয়ো না কেড়ে,
দিতে চাই তারই পদতলে
যে দিয়াছিল অশ্রুভিক্ষা।
আমার দয়াল ঐ বসে আছে নিরজনে—
আমারে দিয়ো না বাধা, ভেসে যাই একমনে।

মাঝে মাঝে রজনীকান্ত তাঁহার দয়িতকে চকিতে হারাইয়া ফেলিতেন, সংসারের মোহ ও মায়াজাল প্রেমময়ের কাছ হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। তখন রজনীকান্তের বিবেক আসিয়া তাঁহার চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিত, তাঁহাকে দিয়া লিখাইত—

সে বসল কি না বসল তোমাব শিয়রে—
তুমি, মাঝে মাঝে মাথা তুলে,
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে বসল কি না)
সে তো তোমাব সাথেই ছিল,
কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল,
তোমার ন্যায্য পাওনা,
বাকি নাই একটিও রে,
একটু পায়ের ধুলো বাকি আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে।
(এই যাবার বেলায়।)
চাও নি তারে একটি দিন,
আজ হয়েছ দীনহীন।
সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয় বে,
আর খাস নে রে বিষ পায়ে ধরি,
(তার) প্রেমসুধা পিও রে।
(দিন ফুরাল।)

তিনি এমনই করিয়া আপনার মতিকে ভগবদভিমুখী করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেন, আপনার মনকে উপদেশ দিতেন; তাঁহাব বর্তমান দুঃখযন্ত্রণার অবস্থার সহিত পূর্বের সুখের অবস্থার তুলনা করিয়া তিনি আপনার মনকে কতই বুঝাইতেন! তিনি দূরে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেও, যে 'দু-হাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছে'—তাঁহারই চরণে অচলা মতি রাখিবার জন্য রজনীকান্ত লিখিলেন—

ও মন, এ দিন আগে কেমন যেত?
এখন কেমন যায় রে?

গদির উপর গভীর নিদ্রা,
টানা-পাখার হাওয়া রে!
আর, ভোরে উঠেই নূতন টাকা,
আর তোরে কে পায় রে?
আমার সাধের ছেলেমেয়ে
হেসে চুমো খায় রে!
আজ কেন লাগছে না ভালো?
ভাবছ একি দায় রে!
মনের সুখে পাখির মতো,
গাইতে যখন হায় রে,
তখন 'হরি হরি' বলতে বটে,—
(কিন্তু) পোষা পাখির প্রায় রে!
সুখের দিন তো ফুরিয়ে গেছে,
তবু মন কি চায় রে!
হা রে নিলাজ, চক্ষু মুদে,
দেখ আপন হিয়ায় রে।
তুই করেছিস তারে হেলা,
সে তোর পাছে ধায় রে,
আর ভুলিস নে পায় ধরি,
মজাস নে আমায় রে!

তাঁহার প্রাণে দুঃখ, কষ্ট ও রোগযন্ত্রণায় যে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে তিনি অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিলেন আর বুঝিতেছিলেন, জীবনে তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কিছুই 'ওয়াশিল' নাই! তাই তিনি কাতর ভাবে লিখিলেন—

ওরে, ওয়াশিল কিছু দেখি নে জীবনে,
শুধু ভুরি ভুরি বাকি রে;
সত্য সাধুতা সরলতা নাই,
যা আছে কেবলই ফাঁকি রে।
তোর অগোচর পাপ নাই মন,
যুক্তি করে তা করেছি দু-জন;

মনে কর দেখি? আমাদের মাঝে
কেন মিছে ঢাকাঢাকি রে?
কত যে মিথ্যা, কত অসংগত
স্বার্থের তরে বলেছি নিয়ত,
(আজ) পরমপিতার দেখিয়া বিচার,
অবাক হইয়া থাকি রে।
রুদ্ধ করেছে আগে গলনালী,
তীব্র বেদনা দেছে তাহে ঢালি,
কবি কণ্ঠরোধ, বাক্যজ পাতক
হরেছে—খোল না আঁখি রে।
এমনি মনোজ, কায়জ পাতক,
ক্রমে লবে হরি, পাপ-বিঘাতক,
নির্মল করিয়া, 'আয়' বলে লবে,
শীতল কোলে ডাকি রে।

কিন্তু এই নির্বেদের মধ্যেও রজনীকান্ত শ্রীভগবানের করুণার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন—

তখন বুঝি নি আমি,
দয়াল হৃদয়স্বামী,
পাঠায়েছ শুভাশিস
দারুণ বেদনা-ছলে।
. ...
তারপরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম! একি?
শাস্তি কোথা? শুধু দয়া,
শুধু প্রেম—প্রতি পলে!

রজনীকান্ত এই ব্যথাবেদনার মধ্যে দেখিলেন সেই ব্যথাহারী শ্রীহরিকে—ব্যথা দিয়া যিনি স্থির থাকিতে পারেন না, ব্যথা দূর করিবার জন্য যিনি ব্যথা-হারীরূপে ছুটিয়া আসিয়া ব্যথিতের প্রাণে শান্তিপ্রলেপ প্রদান করেন। ব্যথা দেন তিনি ব্যথা দূর করিয়া ব্যথিতকে আপনার করিয়া লইবার জন্য। ভক্ত কবি বিহারীলালের ন্যায় তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

ব্যথাহারী ব'লে হরি
ভালোবাস কি হে ব্যথা দিতে ?
ব্যথা দিয়ে তাই কি হে,
চাহ ব্যথা ঘুচাইতে ?

সংসারের দুঃখকষ্ট, আধিব্যাধি, জ্বালাযন্ত্রণা, রোগশোক—এই সমস্ত অমঙ্গলের ভিতর যে কি মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না, এই সমস্ত অমঙ্গলের আবর্তনে পড়িয়া সাধারণ মানব শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ত্বে পর্যন্ত বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, ভক্ত কবির মত তাঁহারা বলিতে পারেন না—

জানি তুমি মঙ্গলময়,
সুখে রাখ দুখে রাখ
যে বিধান হয়।

সাধনামগ্ন রজনীকান্তও জানিতেন—তিনি মঙ্গলময়। হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি প্রতি কার্যেই তাই তাঁহার মঙ্গলহস্ত দেখিতেন। তাই তিনি বিপদকে আহ্বান করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। যন্ত্রণা যখন অধিক হইত, তখন তিনি লিখিতে বসিতেন, রোজনামচার মধ্যে তাঁহাকে লিখিতে দেখি—'যখন দয়াল আমাকে বেশি ব্যথা দেয়, তখন ভাবি যে এই আমার লেখার সময়। তখন উঠে বসি, দয়াল যা মাথায় জুগিয়ে দেয়, তাই লিখে চুপ করে শুয়ে থাকি।' এত যন্ত্রণার মধ্যেও কখনো কোনও দিন তাঁহাকে লিখিতে দেখি নাই, কখনো তাঁহার মুখে শুনি নাই—'আমার উপর সে কি অবিচার করছে'। কখনো শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ত্বে তিনি বিশ্বাস হারান নাই, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—

আগুন জেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে ;
ঝেড়ে ময়লা মাটি করে খাঁটি
স্থান দেয় অভয়-শ্রীচরণে।

তবে মাঝে মাঝে রজনীকান্ত তাঁহাকে পাইয়াও হারাইতেন ; মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার দয়ালের দর্শন পাইতেন না, দর্শনলালসায় তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল, অথচ তিনি দেখিতেছেন দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণের দেবতা বধির হইয়া গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন, তাঁহার শত চিৎকার ও আকুল আহ্বানেও গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন না—

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত
করিব ?
'ওগো, খুলে দাও' বলে আর কত পায়ে
ধরিব ?
আমি লুটিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া অধীর
হায় কি নিদয়, হায় কি বধিব।
বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার-বাহিরে,
মাথা খুঁড়ে আমি মরিব ?
হায়, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত
করিব ?
ঐ কণ্টকযুত বন্ধুর পথে,
ছিন্ন রুধির-আপ্লুত পদে—
আহা বড়ো আশা করে এসেছি, আমার
দেবতারে প্রাণে বরিব।
'ওগো, খুলে দাও' বলে কত আর পায়ে
ধরিব ?
ঐ, ওপারে আলোক ঝিকিমিকি করে
কি মধুসংগীত আসে বায়ুভরে,
আমি, এপারে বসিয়া বিফল রোদনে,
আর কত কাল হরিব ?

দ্বার খুলিল না। অভিমানী রজনীকান্তের অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের পরতে পরতে যে ব্যথা বাজিয়া উঠিল, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার নিম্নলিখিত গানে পাই। তিনি তাঁহার নিদয় ঠাকুরের বধিরতা ঘুচাইবার জন্য, তাঁহার উপর অভিমান করিয়া আবদারে ছেলের মতো বলিলেন—

তুমি কেমন দয়াল জানা যাবে,
আর কি তুমি আসবে না ?
কাঙাল বলে হেলা করে
হৃদিমাঝে এসে হাসবে না ?
যে নিয়েছে তোমার শরণ
তারে দিলে অভয়চরণ,

আমি, ডাকিতে জানি না বলে
আমায় কি ভালোবাসবে না ?

শ্রীভগবানের উপর যিনি অভিমান করিতে পারেন, তিনি তো তাঁহার অভয়-চরণ পাইবেনই।

এই সমস্ত রচনাব পবে রজনীকান্তেব মনেব ভাব কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা তাঁহার পরবর্তী রচনাগুলি হইতে বুঝিতে পারি। তখন তাঁহাকে আর ডাকিয়া ডাকিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিবাশ হইয়া ফিবিয়া আসিতে হইতেছে না। তখন তিনি আনন্দময়ী মাযেব সন্ধান পাইয়াছেন। মনেব এই অবস্থাতেই তিনি 'আনন্দময়ী'ব গানগুলি বচনা কবেন। দারুণ নিবানন্দেব মধ্যেও তিনি মায়ের আনন্দময়ী রূপ দেখিয়াছেন। শুধু দেখিযাই তৃপ্ত হন নাই, অপর পাঁচজনকে তৃপ্ত করিবাব জন্য ভাষাব ভিতর দিয়া সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙালি পাঠক বহু প্রাচীন সাধক কবিব বচিত আগমনী ও বিজয়াব গান শুনিয়াছেন, এখন হাসপাতালে বোগশয্যায শযিত আমাদেব আধুনিক কবি রজনীকান্তেব রুগ্নাবস্থায় রচিত 'আগমনী' ও 'বিজযা'ব কিছু বসাস্বাদন করুন। মা আসিতেছেন, তাঁহার নগরপ্রবেশেব ছবি রজনীকান্ত কিভাবে আঁকিয়াছেন, তাহা দেখুন—

কে দেখবি ছুটে আয়,
আজ, গিবিভবন আনন্দেব তবঙ্গে ভেসে যায় !
ঐ 'মা এল, মা এল' বলে,
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে,
উঠি পড়ি ক'রে সবাই আগে দেখতে চায়।
নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে কচ্ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায় ?
কি উন্মুক্ত শোভার সদন,
ফুল্ল অমল কমল বদন,
সিদ্ধি, শৌর্য, সোনার ছেলে অভয় কোলে ভায়।
কান্ত কয়, ভাই নগরবাসি !
তোদের, সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী,
দশমীতে অমাবস্যা, তোদের পঞ্জিকায়।

তাহার পর গিরিরাজমহিষী মেনকা উমার আগমনে, সারা বছরের পরে প্রিয়তমা কন্যাকে কোলের কাছে, বুকের কাছে পাইয়া কত দুঃখের কথা বলিতেছেন—

সেই, তমালের ডালে মাধবীলতারে
গেছিলি মা তুলে দিয়ে,
সেই শুভলগনে, যেন দু-জনার
হয়েছিল, উমা, বিয়ে।

ঐ সে মাধবী, ঐ সে তমাল,
জড়ায়ে, ঘুমায়ে, ছিল এত কাল,
প্রতিপদ হতে পল্লবে, ফুলে,
কে রেখেছে সাজাইয়ে।

তোর নিজ হাতে বোনা চামেলি, বকুল,
এত ছোটো, তবু দিতেছে মা, ফুল,
ঐ তোর চাঁপা, ঐ সে যথিকা,
ফুলডালি মাথে নিয়ে।

ফল ফুল কিছু ছিল না উদ্যানে,
মনে হত, যেন মগ্ন তোর ধ্যানে,
তোর আগমন, নবজাগরণে
দিয়েছে মা জাগাইয়ে।

কান্ত বলে, রানি, জেনে রাখ খাঁটি—
বিশ্বের জীবন-মরণের কাঠি
ওরই হাতে থাকে, কভু মেরে রাখে,
কভু তোলে বাঁচাইয়ে।

এই গেল আগমনী, এইবার বিজয়া। দশমীর দিনে উমা কৈলাসে যাইবেন। তাই নবমী-নিশার শেষ যাম হইতেই রানী মেনকার মনে বিরহের ভাব উঠিয়াছে—

আজি নিশা, হয়ো না প্রভাত ,
পীড়িত মরমে আর দিয়ো না আঘাত।
একবার বোঝ ব্যথা, একবার রাখ কথা,
নিতান্ত শোকার্ত, কর কৃপাদৃষ্টিপাত।
পরিশ্রান্ত কলেবর, হে কাল! বিশ্রাম কর,
ক্ষণমাত্র, বেশি নহে, আজিকার রাত;
আমি তো জানি হে সব, অব্যাহত চক্র তব,
আজিকার মতো, গতি মন্দ কর, নাথ।
উজ্জল নক্ষত্ররাজি, মলিন হয়ো না আজি,
ধ্রুব হও, দীপ যথা নিষ্কম্প নিবাত;
তোমরা পশ্চিমাকাশে চলিলে তো উষা আসে,
তোমরা মলিন হলে, শিরে বজ্রাঘাত।
চিরনিষ্ঠুরের ছবি, দশমীপ্রভাতরবি,
তুইও কি উদিত হবি? বিধির জল্লাদ।
কান্ত বলে, রাজমহিষি। পায় না যাকে যোগী ঋষি,
তিন দিন সে তোমার বুকে— তবু অশ্রুপাত?

তাহার পর বিজয়ার দিন উমা কৈলাসে চলিয়া গেলে মায়ের শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন—

(ঐ) মা-হারা হরিণশিশু, চেয়ে আছে পথপানে,
অশ্রু ঝরিছে শুধু, কাতর দু-নয়ানে।
(ঐ) হংসসারসকুল, মলিন মুখে,
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে,
কি সোহাগে খেতে দিত অন্ন নয়, সে অমৃত,
সে মা কোথা চলে গেছে, বড়ো ব্যথা দিয়ে প্রাণে।
(ঐ) শুক, শ্যামা এ কদিন 'মা' 'মা' বলে,
পড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গলে;
চলে গেছে নয়নতারা, আহার ছেড়েছে তারা,
(যেন) জিজ্ঞাসে নীরবভাবে, 'মা গিয়েছে কোন্‌খানে?'

নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ,
চলে গেছে, পড়ে আছে নীরব শ্মশান—
কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার।
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশনদানে।

এই 'আনন্দময়ী'র পরিচয়। ইহার মধ্যে আনন্দের ছড়াছড়ি। নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্ত এমন সুন্দর রচনা করিয়া গিয়াছেন। জগজ্জননী মহামায়ার লীলা উপলব্ধি করিয়া সেই লীলা ভাষার সাহায্যে এমন সুন্দর ও সরল ভাবে ফুটাইয়া তোলা কত বড়ো শক্তি ও সাধনার কাজ, তাহা আরও ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে গোটা বইখানি একবার পড়িতে হইবে।

'আনন্দময়ী' সম্বন্ধে তাঁহার রোজনামচার মধ্যে এমন কয়েকটি মূল্যবান কথা পাইয়াছি, যেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

'ভগবানকে কন্যারূপে আর কোনও জাতি ভজন করে নি। যশোদার গোপাল, আর মেনকার উমা ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত। সেই বাৎসল্যভাবটা পরিস্ফুট করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। প্রেমই নানা আকারে খেলা করে। বাৎসল্য একটা আকার, যে-বাৎসল্যে জগৎ চলছে, শুধু দাম্পত্য-প্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করত, মানে সৃষ্টি হত, কিন্তু বাৎসল্য না থাকলে সৃজন পর্যন্তই থাকত— পালন আর হত না, একেবারেই সংহার এসে উপস্থিত হত। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার— এই তিনটে অবস্থার মধ্যে স্থিতিটাই বাৎসল্য। এই ভাবটা মনে করে বই আরম্ভ করেছি, এই ভাব দিয়েই বই শেষ করব।'

হাসপাতালের রোগশয্যায় রজনীকান্ত বহু কবিতা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। উপরে মাত্র কয়েকটি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে রজনীকান্তের এই সাহিত্যসাধনা দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরিচয় অন্য অধ্যায়ে আমরা বিবৃত করিতেছি। উপস্থিত এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্বে রজনীকান্তের হাসপাতালে রচিত আর দুইটি গান উপহার দিতেছি। ইহার একটি হিন্দি ভাষায় রচিত, তাঁহার কোনও হিন্দি গান আমরা ইতিপূর্বে পড়ি নাই। গানখানি পড়িয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি।

আরে মনোয়া রে, কর লে অভি
দরিয়া-বিচ্‌মে নঙ্গর,
দিন রাত ভর্ কিস্তি চলায়া,
মিলা নে কৈ বন্দর।

আরে জ্ঞানভক্তি দোনো ধারা বহে,
কহে বেদ-তন্তর,
তুম্‌কো নযা রাস্তা কোন বতায়া,
কোন দিযা তুম্‌কো মন্তর ?
কিস্তি ভর্‌কে লিযা কিতনা
লাখ রুপযা হন্দর,
সব জমাকে বহুৎ ভুখা হো,
অভি জ্বল্‌তা অন্দর।
আরে খেযাল কর্‌লে দাঁড হাল্‌ সব্‌
খরাব হুযা যন্তর,
তিনো ররখা পার হুযা, আউর
ফুটা হুযা অস্তর।
আরে ডুবনে লগা কিস্তি,
পানিমে হৈযে হাঙ্গর,
কিতনা ফুটা বন্দ্‌ করোগে—
মুহ্‌মে বোলো 'শিউ শংকর'।

অপর গানটি আনন্দময়ী মায়ের দর্শনলাভ-পুলকিত হৃদযের অভিব্যক্তি। সাহিত্যের সাধনায সিদ্ধিলাভ করিযা তাঁহার স্বর কি উচ্চগ্রামে পৌছিযাছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয গ্রহণ করুন—

ওগো, মা আমার আনন্দমযী,
পিতা চিদানন্দময ,
সদানন্দে থাকেন যথা—
সে যে সদানন্দালয়।

সেথা আনন্দশিশির পানে
আনন্দরবির করে,
আনন্দকুসুম ফুটি,
আনন্দগন্ধ বিতরে।
আনন্দসমীর লুঠি,
আনন্দসুগন্ধরাশি,

বহে মন্দ, কি আনন্দ পায়
আনন্দ-পুরবাসী।

সন্তান আনন্দচিতে,
বিমুগ্ধ আনন্দগীতে,
আনন্দে অবশ হয়ে
পদযুগে পড়ে রয়।

আনন্দে আনন্দময়ী
শুনি সে আনন্দগান
সন্তানে আনন্দসুধা
আনন্দে করান পান।

ধরণীর ধুলোমাটি
পাপ তাপ রোগ শোক,
সেখানে জানে না কেহ—
সে যে চিরানন্দলোক।

লইতে আনন্দকোলে,
মা ডাকে 'আয় বাছা' বলে,
তাই, আনন্দে চলেছি ভাই রে,
কিসের মরণভয়?

৮

শয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ

২৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাসপাতালের কটেজ ওয়ার্ডে মরণাপন্ন রজনীকান্তকে দেখিতে যান। বাংলার বরেণ্য কবির শুভাগমনে রজনীকান্ত অত কষ্টের মধ্যেও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন।

রজনীকান্তের বহু দিনের অপূর্ণ সাধ আজ পূর্ণ হইল। তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া কৃতজ্ঞ কবি অবনতমস্তকে তাহাকে বরণ করিয়া লইলেন। ভক্তিযমুনা ও ভাবগঙ্গার অপূর্ব সম্মিলন হইল। মরণপথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথের চরণতলে যে অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য এতদিন সাগ্রহপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন—আজ তাহার সে প্রতীক্ষা সফল হইল। অশ্রুসজলচক্ষে তিনি জানাইলেন—'আজ আমার যাত্রা সফল হইল। তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া, তোমারি "কণিকা"র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া "অমৃতে"র সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্বাদ করুন, যেন আমার যাত্রা সফল হয়।'

রজনীকান্তের এই আর্তি, এই ব্যাকুলতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত— মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কান্তকবির এই ভাব দেখিয়া কবীন্দ্রের ভাবপ্রবণহৃদয়ে তুমুল তরঙ্গ উঠিল। তাহার পর তাহার কথার উত্তরে রজনীকান্ত যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার রোজনামচা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'— শরীর কেমন আছে ?

'— এই tracheotomy করে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি মহা আহ্বানে যাচ্চি। আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান, মহাপুরুষ !

'—আমি যখন বুঝলাম যে, এই উৎকট ব্যথা Penal Code নয়, এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্চে, আমাকে কোলে নেবে বলে, তখন বুঝলাম প্রেম। তার পর সব সইচি। একবার দেখতে বড়ো সাধ ছিল, নইলে হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হত— সে দেখা আমার হল। এখন বলুন, 'শিবা মে পন্থানঃ সন্তু' !

'—আপনি আমাদের সাহিত্যনায়ক, দার্শনিক ; চরিত্রে, সহিষ্ণুতায়, প্রতিভায় দেশের আদর্শ। তাই দেখে গেলে একটু পুণ্য হবে বলে দেখতে চেয়েছিলাম। নিজের তো পায়ের কাছে যাবার শক্তি নাই।

'—ভালোবাসেন জানি, তাই এত কথা বললাম। কিছু মনে করবেন না।

'—ছেলেটিকে বোলপুরে[১] দয়া করে নিতে চেয়েছিলেন, শুনে কত আনন্দ হল। আমি মহারাজকে[২] কথা দিয়ে বাগ্‌বদ্ধ হয়ে আছি, নইলে আপনার কাছে থেকে দেবতা হত, তাতে কি পিতার অনিচ্ছা হতে পারে?

'—কি শক্তি আপনার নাই? অর্থশক্তি? তার যে গৌরব, তা আমি এই যাবার রাস্তায় বেশ বুঝতে পাচ্চি। তার জন্যে মানুষ 'মানুষ' হয় না। এই যে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমার জন্য দিনরাত্রি দেহপাত করচে, এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড়লোক।

'—আর একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার "রাজা ও রানী" আপনার কাছে একবার অভিনয় করে দেখাতেম। আমি "রাজা"র অভিনয় করেছি। অমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে। আমার মাথা যেমন ছিল তেমনি আছে—

'এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়।'

[রাজা ও রানী, ২য় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য]

একবার দেবতাকে শোনাতে পারলাম না।

'—আর "কথা' আমার ছেলেরা recitation করে।

'—আর "কণিকা"র আদর্শে "অমৃত" লিখেছি। লিখে ধন্য হয়েছি। ঐ আদর্শে লিখে ধন্য হয়েছি। দীনেশবাবুর "আদর্শ" কথাটা লেখাতে যতই কেন লোকের গাত্রদাহ হোক না। হাঁ, ঐ আদর্শে লিখেছি। সেটা আমার গৌরব না অগৌরব?

'—আমি "কাব্যে দুর্নীতি"ও জানি, সবই জানি। তবে জানাতে জানি না।

'—আমি কি প্রতিভা চিনি না? আমি কি প্রতিভা দেখি নি? আমি কি পতিত-চরিত্র দেখলে বুঝি না? আমি কি দেবতা দেখলে বুঝি না? তবে এতদিন ওকালতি করেছি কেমন করে?

১ রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মবিদ্যালয়ে

২ মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

'—বোঝে কে, নিন্দে করে কে? আমাকে আর উত্তেজিত করবেন না, দোহাই আপনার।

' –"অমৃতে"র ছোটো কবিতাগুলো কি পড়েছিলেন? আমার এই পীড়ার মধ্যে লেখা, কত অপরাধ হয়েছে। আপনার চরণে দিতে আমার হাত কাঁপে।

'—আমাকে আর কিছু বলবেন না। "দয়াল" আমাকে বড়ো দয়া করছে। আমার ছেলেমেয়ের মুখে একটি গান শুনুন

ইহার পরে রজনীকান্তের ইঙ্গিতমতো তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিবালা ও পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাহাদের পিতার রচিত নিম্নলিখিত গানটি সুললিত কণ্ঠে গাহিয়া রবীন্দ্রনাথকে শুনাইয়া দেয়। রজনীকান্ত নিজে তাহাদের গানের সহিত হার্মোনিয়াম বাজাইয়াছিলেন।

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না, হায়,
অবোধ জীবনপথযাত্রি।

কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবনপথযাত্রি।

পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক-উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ—
তা কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা কে হারায়?
অবোধ জীবনপথযাত্রি।

আসিছে রাতি, কত রবি মাতি?
সাথীরা যে চলে যায়, খেলা ফেলে চলে আয়,
অবোধ জীবনপথযাত্রি।

গানটি শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাহার পর তাঁহার কথার উত্তরে রজনীকান্ত আবার লিখিতে লাগিলেন:

'—আমি চার মাস হাসপাতালে।

'—আমি চলে গেলে যেন নিতান্ত দীনহীন বলে একটু স্মৃতি থাকে—এটা প্রার্থনা করবার দাবি কিছু রাখি না, কিন্তু ভিক্ষুক তো নিজের দাবি কতটুকু তা বোঝে না।

—আমার হিসাবে আমি একটু শীঘ্র গেলাম।

—খুব মারে, আগে কষ্ট হত, এখন আর বেশি কষ্ট হয় না।…'

সেই দিন বৈকালে রজনীকান্ত 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব করিতে চুর'— এই সর্বজন-আদৃত গানখানি রচনা করেন এবং উহা বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দেন। কান্তকবির এই করুণ ও মর্মস্পর্শী সংগীত পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। তিনি ১৬ আষাঢ় তারিখে রজনীকান্তকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন :

ওঁ

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রানী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

'এ-রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়! ‥'

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোটো এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই, কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য

হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত-বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেই দিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিযাছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যে গানটি পাঠাইযাছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইযাছেন— আপনার প্রাণ, আপনাব গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিযা রহিযাছে— অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইযা গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার জীবনসংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন কবিতেছে। ইতি—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

৯

সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি

শ্রীভগবান যখন রজনীকান্তকে 'সকল রকমে কাঙাল করিয়া' তাঁহার যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি— একে-একে সকলই কাড়িয়া লইলেন, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় করিলেন, যখন হাসপাতালের রোগশয্যায় আশ্রয় লইয়া রজনীকান্ত ব্যাধির অরুন্তুদ যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন, যখন অভাবের তীব্র তাড়না তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়া তুলিল— তখন তাঁহার সেই অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি করিবার জন্য চারিদিক হইতে কবিগুণমুগ্ধ বহু সহৃদয় ব্যক্তি ছুটিয়া আসিলেন। দেশের কত পণ্ডিত ও মূর্খ, কত ধনী ও নির্ধন, কত সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যবন্ধু— এমনকি কত অপরিচিত, অজ্ঞাত লোক রজনীকান্তের এই অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে

দেখিবার জন্য হাসপাতালে, তাঁহার শয্যাপার্শে উপনীত হইলেন— প্রাণপণে রজনীকান্তের সেবা করিয়া তাঁহার অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্য সাধ্যমতো সাহায্য করিয়া এবং নানাপ্রকারে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সকলে নিজ নিজ সহৃদয়তার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সমবেত সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া কবি মুগ্ধ ও ধন্য হইলেন। কৃতজ্ঞহৃদয়ে তিনি তাঁহার রোজনামচার মধ্যে লিখিলেন, 'বঙ্গদেশ আমাকে ছেলের মতো কোলে করে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করেছে, সেইজন্য আমি ধন্য মনে করে মলাম।'

এই সমস্ত সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতির ভিতরে তিনি ভগবানের দয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন— দেখিতেন যেন তাঁহারই অফুরন্ত করুণার ধারা সহস্র ধারায় রজনীকান্তের তপ্ত হৃদয়ে পড়িতেছে। এই ভাব যখন তাঁহার মনোমধ্যে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল, তখন রজনীকান্ত সমস্ত সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতির যিনি মূল, তাঁহারই চরণে শরণাগত হইয়া নিবেদন করিলেন—

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত।
পাঠায়ে দিতেছ হরি, মোর কুটিরে নিয়ত।
মোর দশা হেরি তারা,
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা,
(তারা) যত মোরে বড়ো করে, আমি তত হই নত।
একান্ত তোমার পায়,
এ জীবন ভিক্ষা চায়,
(বলে) 'প্রভু, ভালো করে দাও তীব্র গলক্ষত।'
শুনিয়া আমার হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি,
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত।
এই অধমের প্রাণ,
কেন তারা চাহে দান?
পাতকী নারকী আর কে আছে আমার মতো?
তুমি জান, অন্তর্যামি,
কত যে মলিন আমি;
রাখ ভালো, মার ভালো, চরণে শরণাগত।

তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, 'মানুষে আমার জন্য এত করছে—তাঁরই মানুষ সুতরাং তাঁরই প্রেরণায়।'

বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদিন দাতব্য চিকিৎসালয়ে অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্রের মতো মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন আব কেহ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য ও সেবা করেন নাই; সমগ্র দেশবাসীর অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে তিনি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। জীবনের গোধুলিসময়ে চক্ষুহারা হইয়া বরেণ্য কবি হেমচন্দ্রকে কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছিল? এই সকল কথা বাঙালি ভোলে নাই। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় সে জগতের কাছে এতদিন মুখ দেখাইতে পাবিতেছিল না। এ যে তাহাদেব জাতির কলঙ্ক! ধীরে ধীরে বাঙালির আত্মমর্যাদা ফুটিতেছিল, আর সে এই জাতিগত কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ছটফট কবিতেছিল। তাই বজনীকান্তের সেবা করিয়া বাঙালি বহু দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ, বহু দিনের অন্তর্দাহী জ্বালা নিবারণ করিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের ঋণ বাঙালি এতদিনে পরিশোধ কবিবার অবসব লাভ করিয়া দেশ ও জাতিকে ধন্য করিয়াছিল। আমরা এই পরিচ্ছেদে সেই জাতিগত কলঙ্ক ক্ষালনের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

হাসপাতালেব কটেজ-ওয়ার্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রজনীকান্ত মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও ছাত্রদিগের নিকট হইতে যে সেবা ও শুশ্রূষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশাতীত। মেডিকেল কলেজের ছেলেরা পালা করিয়া রজনীকান্তের সেবা করিতেন, তাঁহাকে ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইয়া দিতেন, গলার নল বদলাইয়া দিতেন, চিকিৎসার আনুষঙ্গিক সমস্ত কার্যের সুবন্দোবস্ত করিতেন এবং রোগীর সহিত রাত্রি জাগিতেন। দেশের বিপন্ন কবির সাহায্যের জন্য আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে বলি দিয়া আরও কয়েক জন ভদ্রসন্তান রজনীকান্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, তাঁহারা রজনীকান্তের রোগযন্ত্রণার উপশম করিবার জন্য প্রাণপণে ও অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই মহৎ দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া দেশের বহুলোক স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে রজনীকান্তকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

রজনীকান্তের রোগশয্যার সহচর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বক্সি মহাশয়ের কথা পূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে। এখন রজনীকান্তের রোজনামচা হইতে অল্প উদ্ধৃত করিয়া হেমেন্দ্রবাবুর সেবাপরায়ণতার পরিচয় দিতেছি: 'হেমেন্দ্র সেই শুরু থেকে আছে। আমার জন্য বুক দিয়ে পড়ে আছে—বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার কাছে বসে আছে, যেন "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"। হেম, তোমার মতো মন্দনিদ্র কে হবে? বসে আছ, না ঠায় বসে আছ—ব্যাসদেবের ন্যায়।'

সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ উকিল কৃষ্ণগোবিন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বিশেষভাবে রজনীকান্তের সেবা করেন। তাঁহার সেবায় রজনীকান্ত কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা রজনীকান্তের উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পাবা যায়: 'তুই আমার জন্য কেন এত করছিস্, সুরেন? আমি আগে জানতাম না যে, as a man of literary pursuit I commanded any esteem from you. That you take so much anxious notice about me is a wonder!'

যশোহর জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিবারাত্র সকল সময়ে রজনীকান্তের কাছে থাকিয়া মৃত্যুসময় পর্যন্ত নিয়মিতভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত মেডিকেল কলেজের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত বিজিতেন্দ্রনাথ বসু, রাজশাহির স্বর্গীয় উকিল প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দুকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেই মাঝে মাঝে রজনীকান্তের সেবা করিতেন।

সুকবি শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু (এখন হাই কোর্টের উকিল), তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুস্থিরকুমার বসু ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু মধ্যে মধ্যে আসিয়া রজনীকান্তের সেবা করিতেন। আরও কত লোক যে রজনীকান্তের সুদীর্ঘ আটমাসকাল ব্যাপী হাসপাতাল বাসের মধ্যে সময়ে সময়ে তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনিই হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে গিয়াছেন, রজনীকান্তের অসহায় ও নিদারুণ অবস্থা দেখিয়া তিনিই সাধ্যমতো তাঁহার সেবা করিয়াছেন। দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুহ রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে যাইতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন। ইহার সম্বন্ধে রজনীকান্তকে লিখিতে দেখি 'অশ্বিনীবাবুর কেমন ভাই, তা ভগবান জানেন! সে থাম্‌কা আসে, আর শুশ্রূষা করে চলে যায়।'

যখন পাঁচজনের সেবা ভিন্ন রজনীকান্তের প্রাণ আর বাঁচে না, তখন চারি-

দিক হইতে এইভাবে বহু সেবক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। যে দেশের বালকগণ বিদ্যাশিক্ষাব জন্য পাঠশালায গিয়া 'সেবক শ্রী' লিখিয়া হাতের লেখা পাকায, যে দেশের পুরনারীর একটি বিশেষ বিশেষণ হইতেছে 'সেবিকা', যে দেশের রাজা গৃহাগত ক্ষুধার্ত অতিথির সেবার জন্য একমাত্র পুত্রের দেহমাংস-দানেও কাতর হন নাই, সেই দেশেরই বুকে আবার বহুদিন পরে সেবাধর্মের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিযা উঠিল। বাংলাব বিপন্ন কবির সেবা করিয়া বাঙালি জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল কবিযা তুলিল।

কাশীযাত্রার পূর্ব হইতেই রজনীকান্ত অর্থকষ্টে নিপতিত হন, তাই বাধ্য হইযা তাঁহাকে দেশবাসীব নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতে হয। যখন তিনি কাশীতে অবস্থান কবিতেছিলেন, তখন দিঘাপাতিযার কুমাব শ্রীযুক্ত শবৎকুমার রায, কাশিমবাজাবেব মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাকে অর্থ সাহায্য কবেন। হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি বহু লোকের কাছ হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছেন।

লোকে বজনীকান্তকে তাঁহার এই অন্তিমসময়ে যে সাহায্য করিতেন— তাহার মধ্যে কোনপ্রকার কুণ্ঠা বা বিরক্তির ভাব ছিল না। রজনীকান্তকে সাহায্য করিতে পারিলে— কি ছোটো, কি বড়ো, সকলেই আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। এইপ্রসঙ্গে অনেকের নামই উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু সর্বপ্রথমে এক জনের কথা বলিতেছি— তিনি দিঘাপাতিয়ার মহাপ্রাণ কুমার শরৎকুমার রায়। কাশী হইতে রজনীকান্ত কুমার শরৎকুমারকে সাহায্যের জন্য পত্র লিখিলে, কুমাব উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

'আমার নিকট আপনি প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার লজ্জার বিষয় কিছুই নাই, কেন না আমি যে আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে সুযোগ পাইতেছি, ইহা আমার বিশেষ গৌরবের বিষয় এবং ইহা আমি আমার কর্তব্য বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি। আপনার ন্যায় বাণীর বরপুত্র, আমাদের রাজশাহি কেন, সমগ্র বঙ্গদেশের শ্লাঘার বিষয়। আপনি নিরাময় হইয়া বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জ চিরকাল আপনার সুমধুর বীণা-নিক্বণে মুখরিত করিয়া রাখুন, ইহাই ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি।'

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া শরৎকুমারের নাম আজ বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে— কিন্তু তাহার বহুপূর্বে বাংলার এই প্রিয় কবিকে অপরিমেয় সাহায্য করিয়া তিনি বাংলার সাহিত্য ও সাহিত্যসেবকদিগকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। রজনীকান্তের কৃতজ্ঞহৃদয়ের যে অভিব্যক্তি ভাষার আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাঙালি চিরদিন মরণাহত কবির কৃতজ্ঞহৃদয়ের এই অকপট অবদান শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে শরৎকুমারের মহাপ্রাণতার উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে থাকিবে :

'শরৎকুমার সাত জন্মের সুহৃদ ছিল। শরৎকুমারের প্রাণটা আকাশের মতো। শরৎকুমার এই চিকিৎসা চালিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে। শরৎকুমার সাহায্য না করলে আজ আমাকে দেখতে পেতে না।

'কুমার, আপনি করুণাময়, আমার পক্ষে ভগবৎ-প্রেরিত। আমার এই ছেঁড়া মাদুরে বসে আমাকে আশ্বাস দেওয়া, আর আমার সাহায্য করা— এটা বড়োলোকদের মধ্যে বিরল। আপনার গুণে আপনি উঁচু। অর্থের জন্য উঁচু বলি না, রূপের জন্য বলি না, ক্ষমতা কি মানসম্ভ্রমের জন্য বলি না— উঁচু বলি আপনার প্রাণটার জন্য। ভগবান আপনাকে আশীর্বাদ দিয়ে ঢেকে ফেলুন, আপনার দীর্ঘ পরমায়ু হউক, আর বড়ো সুখের জীবন হউক।'

রজনীকান্তের হৃদয় কুমার শরৎকুমারের আন্তরিকতায়, সহৃদয়তায় এবং সহবেদনানুভূতিতে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। হইবারই কথা। তাই কৃতজ্ঞ রজনীকান্ত বহু পত্রে কুমারের নিকট তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। সেই চিঠিগুলি বাস্তবিকই তাঁহার প্রাণের কথায় পূর্ণ। পত্রগুলিতে তোষামোদের চাটুবাদ নাই— আছে কেবল প্রাণঢালা কৃতজ্ঞতা। মাত্র দুইখানি চিঠি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

' আমি কি কখনো আশা করিয়াছিলাম যে, আপনার ন্যায় ব্যক্তি আমার বাসায় পদধূলি দিবেন? আপনার উদার চিত্ত আপনার সিংহাসন অনেক উচ্চে তুলিয়া দিয়াছে। ছোটোকে যে জিজ্ঞাসা করে না, সে বড়ো নয়। আপনি সাহিত্যিক, তাহা জানিতাম— আপনি ধনবান তাহা জানিতাম— আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী তাহাও জানিতাম, কিন্তু আপনার হৃদয় এত কোমল, পরের দুঃখ দেখিলে আপনি এত সমবেদনা বোধ করেন, তাহা আমি জানিতাম না। কুমার, আমি তো কত ক্ষীণ, কত ক্ষুদ্র— আমাকেই

যখন খুঁজিয়া লইয়া প্রাণদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা জগতের অনেক উপকার হইবে।

'মনে মনে আশা করিতেছি যে, আপনার দেওয়া প্রাণ লইয়া আবার পৃথিবীতে কিছুদিন আপনাদের সঙ্গসুখ ভোগ করিতে পারিব। আপনার দেওয়া প্রাণই বটে। আপনার সুদৃষ্টি না হইলে আমি এতদিন অস্তিত্ব হারাইয়া a thing of the past হইয়া থাকিতাম। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার পরোপকারস্পৃহা। কি দিয়া ইহার পরিশোধ করিব জানি না। মঙ্গলময় আপনাকে সুস্থ, নীরোগ, দীর্ঘজীবী করুন। কুমার, এই দুর্বল, রুগ্নের হৃদয়টুকু গ্রহণ করুন। আপনি দেবতা, আপনার চরণপ্রান্তে পড়িয়া আমার হৃদয় পবিত্র হউক।'

হাসপাতালে রচিত 'অমৃত' পুস্তকখানি রজনীকান্ত কুমারের নামে উৎসর্গ করিবার সময় কৃতজ্ঞহৃদয়ের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসে লিখিয়াছিলেন—

নয়নের আগে মোর মৃত্যুবিভীষিকা,
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণকণিকা।
ধূলি হতে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে করেছে তুমি ছাড়া? আর কেবা পারে?
কি দিব, কাঙাল আমি? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মালা, বহু কষ্ট করি,
ধর দীন উপহার, এই মোর শেষ,
কুমার! করুণানিধে! দেখো ব'ল দেশ।

কুমারের ন্যায় কুমারের বিদুষী ভগিনী—'বৈভ্রাজিকা' 'কাননিকা' ও 'শেফালিকা' প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভাও রজনীকান্তকে বিশেষভাবে অর্থসাহায্য করেন। কৃতজ্ঞ কবি তাঁহার হাসপাতালে রচিত 'আনন্দময়ী' গ্রন্থখানি ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই উৎসর্গপত্র হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

দূর হতে, স্নেহময়ী ভগিনীর মতো
কেঁদেছিল করুণায় ও-কোমল প্রাণ,
তাই বুঝি সাধিবারে দুঃস্থহিতব্রত,
পাঠাইয়াছিলে দেবি, করুণার দান!
... ...

বিশীর্ণ, দুর্বল হস্তে, কম্পিত-অক্ষরে,
রচেছি 'আনন্দময়ী', শুধু মার নাম,
যে করে করেছ দান, ধর সেই করে,
ধন্য হই, সিদ্ধ হোক দীন মনস্কাম।

মৃত্যুপথযাত্রী কবির রচিত এই কবিতা কবি ইন্দুপ্রভাব কীর্তি চিরদিন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবে।

বাংলার প্রায় প্রত্যেক সাধু অনুষ্ঠান যাঁহার অপরিমেয় দানে পুষ্ট, বাঙালির সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সম্মিলন যাঁহার করুণাবারিপাতে জীবন পাইয়াছে, বাংলার সেই বদান্যচূড়ামণি মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কান্তকবিকে হাসপাতালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপন্ন পরিবারবর্গকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র হাসপাতালে কয়েকবার রজনী-কান্তকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং সর্বদা পত্রাদি লিখিয়া রোগাহত কবির সংবাদ লইতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কবির পুত্রদিগের পড়াইবার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং কবির 'অভয়া' পুস্তকের দুই হাজার কপি বিনা খরচায় ছাপাইয়া দেন। আর মহারাজার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য— কবির মৃত্যুর পর বিনা সুদে তেরো হাজার টাকা ধার দিয়া উত্তমর্ণগণের কবল হইতে রজনীকান্তের যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা। কিন্তু ইহাতেই মহারাজার বদান্যতা পরিসমাপ্ত হয় নাই। তিনি বহুকাল যাবৎ কবির বিপন্ন পরিবারবর্গকে নিয়মিতরূপে মাসিক অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রকে 'অভয়া' উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-কবিতার কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি—

আপনি খুঁজিয়া নিয়া, শাপভ্রষ্ট দেবতার মতো
আসিয়াছ কুটির-দুয়ারে—
শারীর-মানস-শক্তি-বিবর্জিত সেবক তোমার
রুগ্ন, আজি কি দিবে তোমারে?

... ...

যে সাজি লইয়া আমি বার বার আসিয়াছি ফিরি,
তাতে দুটি শুষ্ক ফুল আছে,
দেবতা গো! অন্তর্যামি! একবার নিয়ো করে তুলি—
রেখে যাই চরণের কাছে।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে আসিলে, রজনীকান্ত তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—'মহাপুরুষ! আকাশের মতো প্রাণটা—আমাব কাছে এসেছেন। সাধু এসেছেন, আমি কি দিই? আমি নির্বাক, নির্বাণোন্মুখ। আমি বৃহৎ পরিবাব রেখে গেলাম, আমার আনন্দবাজার—কেমন আনন্দবাজার তা তো জানেন না! আমি তা ভেঙে দিয়ে যাচ্ছি। আমি—গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা। আমাকে হবিনাম দিন, মার নাম দিন। আমার কোন সুকৃতি ছিল যে, আমার যাবাব বাস্তায, আপনার মতো সাধু মহাপুরুষেব দর্শন পেলাম। এই রুগ্ন, বিপন্নের সর্বান্তঃকরণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করুন, আমার আর-কিছুই নাই যে দেব। যদি বাঁচি তবে দেখাবার চেষ্টা কবব যে, আমি অকৃতজ্ঞ নই। যদি মবি, তবে আমার সমাধির কাছে মহারাজাব কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

মহারাজা চলিয়া যাইবার পব বজনীকান্ত পত্নীকে মহাবাজার সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—'আমি ঢেব মানুষ দেখেছি, এমন মানুষ দেখি নি যে, ধুলো থেকে একেবারে বুকে তুলে নেয। ওঁর নাম যেখানে হয়, সে স্থান অতি পবিত্র ও মহাতীর্থ। ও তো মানুষ নয, ও তো মানুস নয, ছল ক'রে শাপভ্রষ্ট দেবতা এসেছে, জানো না?'

মহারাজা রজনীকান্তের কণ্ঠে তাঁহাব বচিত তত্ত্বসংগীত শুনিতে চাহিযাছিলেন, এই উপলক্ষে রজনীকান্তকে ব্যাকুলভাবে লিখিতে দেখি: 'দযাল, আব একদিন কণ্ঠ দে, দেবতাকে দেবতার নাম শোনাই। একদিন কণ্ঠ দে, দয়াল! খালি ওঁকেই শোনাব, তারপব কণ্ঠ বন্ধ করে দিস!'

এতদ্ব্যতীত নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, দিঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুর, ডুবলহাটির কুমারগণ, মেদিনীপুরের কুমার শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন পাল, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বায, বরিশালের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকে কবির এই বিপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য করেন। স্কুলকলেজের ছেলেরা কবির রচিত 'অমৃত' হাতে হাতে বিক্রয় করিয়া দিয়া তাঁহার আর্থিক কষ্টেব আংশিক লাঘব করেন। পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কবির 'অমৃত' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের এক হাজার কপি বিনা খরচায় ছাপাইয়া দেন এবং সময়ে সময়ে তিনি রজনীকান্তকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কবির সাহায্যের জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য ও উদারহৃদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়কে বলিয়া মিনার্ভায় একটি সাহায্য-রজনীর আয়োজন করাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ১৩১৭ সালের ২৬ শ্রাবণ ঐ থিয়েটারে 'রানাপ্রতাপ' ও 'ভগীরথ' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের প্রায় বারোশত টাকায় কবির যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল। অভিনয়ের পূর্বে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত একটি সুন্দর প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। প্রবন্ধটির কিয়দংশ পাঠ করিলেই রজনীকান্ত সম্বন্ধে নাট্যসম্রাটের মনোভাব সহজেই উপলব্ধি হইবে—

মেডিকেল কলেজে যাইতে যাইতে পথে ভাবিতেছিলাম যে, রোগ-তাড়নায় পূর্বপরিচিত যুবার কান্তি অতি মলিন অবস্থায় শয্যাশায়িত দেখিতে হইবে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, দারুণ রোগে যদিও সেই জনমনোহর কান্তি নাই, কিন্তু এ কঠোর অবস্থায়ও শান্ত পুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত নন। রজনীকান্ত তখন কবিতা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে আমার কষ্ট বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাতে তো অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে?" তাহাতে তিনি পেন্সিলে লিখিয়া উত্তর করিলেন, তাঁহার এই এক শান্তির উপায় আছে। ভাবিলাম, হায় বঙ্গমাতা, তোমার এই কোকিলের কলকণ্ঠ কেন রুদ্ধ হইল। রজনীবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আমার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইল যে, এই দুঃখের অবস্থাতেও কবি মঙ্গলময়ের মঙ্গলপ্রদ শ্রীচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান যে সর্বমঙ্গলময়— ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন। 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চুর' গানটি আমার মনে পড়িল, বুঝিলাম যে, এই এই গানে তাঁহার হৃদয়ের অকপট বিশ্বাস অঙ্কিত। কাঙাল হওয়া তাঁহার আনন্দ, তাঁহার দেহাদি ভাব এখনো যে লুপ্ত হয় নাই, এই তাঁহার খেদ। ইহা সামান্য লক্ষণ নয়, ইহা মোক্ষলুব্ধ চিত্তের খেদ। প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁহার হৃদয়ের নির্মল ভাব প্রতিফলিত এবং সকল কবিতাই বাগাড়ম্বরে অনাবৃত। সেই স্বভাবকবির শোচনীয় অবস্থা মর্মে লাগিল। ভাবিলাম, কি অভিশাপে বঙ্গজননী এই রত্নহারা হইতে বসিয়াছেন! যিনি এই কঠিন পীড়াশায়িত কবিকে না দেখিয়াছেন, তিনি আমার বর্ণনায় বুঝিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরে চিত্তার্পিত কবি কিরূপ অবিচল ও প্রশান্তচিত্তে কবিতাগুচ্ছ

রচনা করিতেছেন, দেখিলে বুঝিবেন যে যাঁহারা ঐশ্বরিক শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসেন, তাঁহাদের মানসিক গঠনও স্বতন্ত্র। এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। গাড়িতে আসিতে আসিতে বুঝিলাম, আমার সহযাত্রী ডাক্তারও সমভাবাপন্ন হইয়াছেন।'…

বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় রজনীকান্তকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন বরিশালের আরও অনেকে রজনীকান্তকে অর্থ-সাহায্য করেন। এখানে মাত্র একজনের কথা বলিতেছি। ইনি বরিশালের জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইঁহার সহিত রজনীকান্তের পরিচয় ছিল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরিশালের উকিলমহল হইতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং সেই টাকা পাঠাইবার সময়ে রজনীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'…কবিগণ চিরদিনই আপনভোলা—আপনি উকিল-কবি হইলেও তাহা-ই। চিকিৎসাপত্রে যথেষ্ট খরচ হইতেছে জানি ; বাণীর উপাসক চিরদিন কমলার বিরাগভাজন। আমরা আমাদের এই "বার্" হইতে আমাদের বন্ধুবরের চিকিৎসাব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু অর্থ পাঠাইতেছি— আপনি যদি আমাদের ধৃষ্টতা মাফ করিয়া, দয়া করিয়া গ্রহণ করেন, কৃতার্থ হইব। আপনি আমাদের কাছে প্রার্থী হয়েন নাই। আমাদেরই অবশ্যকর্তব্য আমাদের দেশের কবিকে, আমাদের সমকর্মী ভ্রাতাকে রোগমুক্ত করা এবং সেই কার্যের সর্ববিধ ব্যয় বহন করা।'…

হাসপাতালে দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে রজনীকান্তের সাহিত্যসাধনা, অপরিসীম ধৈর্য, তাঁহার সাধক ভাব ও ঈশ্বরে একান্তনির্ভরতা দেখিয়া বাংলাদেশ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সাধনার এই অপূব চিত্র বাংলাদেশ পূর্বে কখনো দেখে নাই। শুধু বাংলার কেন, ভারতবর্ষের— এমনকি জগতের চিত্রপটেও এরূপ অতুলনীয় সমাধিচিত্রের প্রতিলিপি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাই বাংলার জনসাধারণ, ধনীনির্ধন, পণ্ডিতমূর্খ, বালবৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ সকলে সমবেতভাবে কবির সেবা করিয়া, তাঁহার সাহায্য করিয়া— সহানুভূতির ধারায় তাঁহার রোগদগ্ধ দেহে শান্তিপ্রলেপ দিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল।

কবিকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, তাঁহার রচিত গ্রন্থ ক্রয়

করিয়া, তাঁহাকে নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার উপহার দিয়া—নানাভাবে নানা শ্রেণীর লোক রজনীকান্তের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, কুমার শরৎকুমার, সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ, হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ, গুরুদাস, সব্-জজ তারকনাথ দাশগুপ্ত, প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, বিখ্যাত ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, কবি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর, আদর্শ শিক্ষক রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, মহা-মহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ধর্মপ্রাণ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা (সুরেশচন্দ্রের জননী), কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিদুষী কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী ও শ্রীমতী বাসন্তী, বাংলার ছোটো-বড়ো বহু সাহিত্যসেবক এবং কাশীর ভারত-ধর্মমহামণ্ডলের প্রাণস্বরূপ জ্ঞানানন্দ স্বামী প্রভৃতি সমগ্র বাংলার, নানা শ্রেণীর, নানা সম্প্রদায়ের, নানা অবস্থার বহুতর ব্যক্তি রজনী-কান্তের এই দুঃসময়ে তাঁহার প্রতি অযাচিতভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বাঙালিজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

দেশবাসীর এই সহানুভূতিতে কবির হৃদয় কিরূপ বিগলিত হইত, তাহা তাঁহার রোজনামচার নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে: 'আমাকে সারদা মিত্র, গুরুদাসবাবু, রবিবাবু, অশ্বিনী দত্ত—সবাই কত আশ্বাস দিয়ে চিঠি লিখেছেন; সেই চিঠিগুলো এক-একখানি আমার দয়ালের চরণামৃত। সেইগুলো আমি পড়ি আর আমার কান্না পায়।'

অশ্বিনীবাবু রজনীকান্তকে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানে মাত্র তাঁহার একখানি পত্রের কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম: 'আপনি প্রকৃতই অমৃতের অধিকারী। আপনার সংগীতগুলিতেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। লক্ষ লক্ষ লোক নিঃসংশয় ভগবৎচরণে আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছেন— আমিও তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ মিলাইয়া সপরিবারে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিলেন: 'আপনি ও আপনার স্বাস্থ্য সমগ্র বাঙালি-জাতির সম্পত্তি। করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যাহাতে আপনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন।'

হাই কোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ লিখিলেন, 'আপনার অবস্থা দেখিয়া বড়োই ক্লিষ্ট হইয়াছি। মনে হয়, ভারতবাসীগণ কত কি পাপ করিয়াছে, তজ্জন্য

দেবতাগণ রুষ্ট হইয়া আমাদের অমূল্য রত্নগুলিকে তিরোহিত করিতেছেন। তবে সেদিন যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আশা হইয়াছে।'

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র একখানি পত্রে রজনীকান্তকে লিখিলেন: 'আপনি অনেকটা ভালো আছেন জানিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। মঙ্গলময় ভগবান আপনাকে একেবারেই সুস্থ করুন। আপনার হইতে আমাদের মাতৃভাষার ঢের কাজ হইবে। আপনার অমৃতনিস্যন্দী বীণার ঝংকার কে না ভালোবাসে?'

হাসপাতালে রোগশয্যাশয়িত রজনীকান্তকে দেখিতে যাইবার সময়ে লোকের মন খুবই বিমর্ষ, উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইত, কিন্তু হাসপাতাল হইতে ফিরিবার সময়ে তাঁহাদের মনোভাব অন্যরূপ ধারণ করিত। প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিয়া আসিবার পর যে পত্র লিখেন, তাহা পড়িলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে—

'…বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে যেদিন রজনীকান্তকে হাসপাতালে প্রথম দেখিতে যাই, সেদিনকার কথা জীবনে কখনো ভুলিব না। কবির অবস্থা যে এতদূর সংকটাপন্ন, তাহা পূর্বে ভাবি নাই। ক্যান্‌সার রোগে কণ্ঠনালীর ক্ষত, কথা কহিবার শক্তি নাই, জ্বর প্রায় এক শত চার ডিগ্রি, এরূপ অবস্থায় কবি উঠিয়া বসিয়া কাগজ-কলমে লিখিয়া আমাদের সহিত যেরূপভাবে আলাপপরিচয় করিলেন, তাহা কেবল প্রাণে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। সামান্য রোগেই আমরা কিরূপ অধীর ও কাতর হইয়া পড়ি, আর এই দুরারোগ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তের কি গভীর ভগবৎপ্রেম, কি অচলা নিষ্ঠা, কি জীবন্ত বিশ্বাস, কি অসামান্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা! ভগবদ্‌ভক্তি কোন্ বলে অসহ্য যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকেও পরাভব করে, তাহা সেদিন বুঝিলাম। কবির যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া যদিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি ফিরিয়া আসিবার সময় মনে হইল যেন, কোন তীর্থস্থান হইতে ফিরিলাম। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।'

বাস্তবিকই ভুলিবার নয়, এ মহনীয় দৃশ্য দেখিয়া সাধারণে বিস্মিত, মুগ্ধ ও ভক্তিতে নত হইয়া গেল। রোগের ও দারিদ্র্যের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় রজনীকান্তের বিশুদ্ধি যখন সাধারণের গোচরীভূত হইল, তখন বাংলার বহু সাহিত্য-সেবক নানা প্রবন্ধ ও কবিতায় এই অতুলনীয় দৃশ্যের ছবি আঁকিতে লাগিলেন। গ্রন্থের কলেবর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, তাই নিম্নে মাত্র দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

১

থামো, থামো— দেখে নিই পিপাসিত দুটি আঁখি ভরে,
থামো কবি—এঁকে নিই হৃদিপটে আরো ভালো করে,
ওই সাধনার মূর্তি— নির্ভরের চিত্র মনোহর ,
কলঙ্কী দর্পণ মোর, মাজি লব— দাও অবসর।
হে সাধক, হে তাপস, আশীর্বাদ—কর আশীর্বাদ,
একবার এ জীবনে লভি তব সাধনার স্বাদ।
আজিকে তোমায় হেরে চক্ষে মোর ভরে আসে জল,
বাণীর পূজার লাগি বিকশিয়া উঠে চিত্তদল
শুভ্র শতদল সম—ভুরভুর গন্ধে ভরপুর ,
হৃদয় মাতিয়া উঠে ভক্তিরসে বেদনাবিধুর।

কে বলিবে মন্দভাগ্য ? অসহ্য এ বেদনার সুখ
সেই জানে, একনিষ্ঠ সাধনায় যে জন উন্মুখ
ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বলোকে— কে বুঝিব মোরা সাধ্যহীন,
মোরা শুধু কাঁদি, হাসি, ভালোবাসি— কেটে যায় দিন।
মধুর কোমল কান্ত। হাসি, অশ্রু, করুণার কবি,
ফুটাও মলিনচিত্তে আজি তব সাধনার ছবি।
এ সাধনা আরাধনা ধন্য হোক—আজি ধন্য হোক,
ফুটুক এ শীর্ণকুঞ্জে নন্দনের অম্লান অশোক।

—যতীন্দ্রমোহন বাগচি

২

গভীর ওংকারে যেথা সামগান ঝংকারিয়া উঠে,
সেথায় গাহিতে হবে এই লাজে গিয়াছিলে মরি !
মঙ্গলকিরণে দিব্য হর্ষে যবে প্রাণপদ্ম ফোটে—
মর্মকোষে, পদরেণু তবে তায় রাখেন শ্রীহরি।
তুমি তা জানিতে কবি, গেয়েছিলে তাই সে সংগীত,
মর্ম-মলিনতাটুকু নিয়েছিল মরমে বিদায়।

তারপর সে কি গান! বিশ্ব-হিয়া স্পন্দনরহিত—
বিহ্বল, চেতনাহারা, যোগভক্তিপ্রেম-মদিরায়!
গাও কবি, বুক ভরে, কণ্ঠ চিরে গেয়ে যাও গান,
এ দুর্ভাগ্য নীলনদে ভেসে যাও মিশর-মরাল[১]
গানে দিক ছেয়ে ফেল, সংগীতেই পূর্ণ অবসান—
তোমার এ কবিজন্ম, কভু যদি হও অন্তরাল,
বঙ্কিম নীলের গতি[২] রাখে যদি লুকায়ে তোমারে,
তবু গান গেয়ো কবি— সুদূর সিন্ধুর পরপারে।

—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়(৩)

কত লোক হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে আসিতেন, সকলকেই রজনীকান্ত এই দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও, নানাভাবে আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতেন, অবিরাম লেখনীচালনা দ্বারা কবিতা রচনা করিয়া, হাসির গল্প লিখিয়া ও নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি সকলকে পুলকিত করিতেন। সংগীতময় রজনীকান্ত, সংগীত-সাহিত্য-সেবক রজনীকান্ত নিজে কণ্ঠহারা হইয়াও, পুত্রকন্যা ও প্রিয়শিষ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দ্বারা স্বরচিত গান গাওয়াইয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। এই প্রিয়দর্শন ও সুকণ্ঠ দেবেন্দ্রনাথই স্বীয় মধুস্রাবী সংগীতধারায় হাসপাতালকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিলেন। তাই রজনীকান্তকেও লিখিতে দেখি : 'এই দেবেন্দ্র বড়ো সুন্দর গায়। ও না থাকলে, আমি আরো শীঘ্র মরতাম।'

সমাগত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি পাইয়া কবি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে যেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, এখানে তাঁহার রোজনামচা হইতে আরও দুই-চারিটি কথা তুলিয়া দিতেছি।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি লিখিয়াছিলেন : 'আমার যে ক্ষমতাটুকু আছে, তা আপনার ন্যায় সাহিত্যরসোন্মাদ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির সংস্পর্শে।'

তিনি শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন : 'আপনি একজন

১ মিশর দেশের মরাল নীলনদে গান করিতে করিতে মরিয়া যায়— ইহা জনশ্রুতি।
২ নীলনদের বক্রগতির কথা সকলেই জানেন।
৩ সুহৃদ্বর ইন্দু 'টাইটানিক' জাহাজের সহিত সাগরজলে চির-অস্তমিত হইয়াছেন। সুলেখকের এই শোকাবহ অকালমৃত্যুতে আজিও বঙ্গদেশ শোকার্ত।

self-made man, আর এখন তো ঋষিতুল্য লোক। আপনার দয়াতে আমি তাঁর দয়া দেখতে পাচ্চি। আপনাকে দেখলেই আমার ভগবৎপ্রেম হয়। কেন জানি নে, আপনার মুখে সেই আভা পাই। আপনি ঠিক রামতনু লাহিড়ীর ছেলে, তাতে আর ভুল নাই।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে গিয়া তাঁহার অরুন্তুদ যন্ত্রণা দেখিয়া বিগলিত হইয়া যান এবং বলেন, 'আমার আয়ু নিয়ে আপনি আরোগ্য লাভ করুন।' তাঁহার এই কথার উত্তরে রজনীকান্ত লেখেন, 'ডা. রায়, আপনি প্রার্থনা করছেন, না ঋষি প্রার্থনা করছেন। আমাকে আপনি আয়ু দিতে পারেন। হাঁ, আত্মত্যাগ। আপনার মতো কয়টা লোক করেছে। না করে, না পারে? এই তো বলি মানুষ। বিবাহ করেন নাই— কেবল পরার্থে আত্মোৎসর্গ।'

ভারত-ধর্মমহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামী হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে যান, তাঁহাকে রজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন—

' ভগবদ্দর্শনের পূর্বে সাধুর সাক্ষাৎ হয়। আমার তাই হল। আমি কি সৌভাগ্য করেছিলাম। আমার এ সাধ কোন সৌভাগ্যে পূর্ণ হল? মহাপুরুষ। আমি কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব? চরণের ধুলো এক কণা দিন, মাথায় করে নিয়ে যাই। সমস্ত সারল্য আশীর্বাদরূপে আমার মাথায় ঢলে পড়ুক। দেবতা, কত দিনের বাসনা যে পূর্ণ হল। পথে দেবদর্শন হল, গিয়ে বলব। আপনাকে যে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে না। যত স্বামীজী এসেছেন, তাঁদের সকলের চেয়ে বড়ো স্বামীজী এসেছেন

বরিশালের একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পত্র পাইলে বা তাঁহার প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করিলে রজনীকান্ত ভাবে বিগলিত হইয়া যাইতেন। তাই রোজনামচার মধ্যে অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিতে দেখি—

অশ্বিনীবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখেছেন, আমি আমার স্ত্রীকে বলে রেখেছি যে, যখন মরি তখন তুলসীর পাতা যেমন গায়ে দেয়, তেমনি ঐ পত্রখানা আমার গায়ে বেঁধে দিও। কি লোক। নিজের শরীর অসুস্থ, সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা। কেবল আমার কথা সমস্ত পত্রে। যাঁহারা মহানুভব, তাঁহারা পরের জন্য জীবিত থাকেন। বরিশাল গিয়ে যে আনন্দ করে এসেছিলাম, তা মনে করে কষ্ট হয়। মাতানো বরিশাল, আমি মাতাব কি? ও যে একজনই পাগল করে রেখেছে। তার কাছে আবার বাংলায় লোক আছে

কোথায়? একটা এই আক্ষেপ বযে গেল, একবার অশ্বিনী দত্তের মতো রাজর্ষি মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হল না।'

অনেকের মতো এই দীন গ্রন্থকারও রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে যাইত এবং অনেকের মতো রজনীকান্তের সাহিত্যসাধনা ও ঈশ্বরনির্ভরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইযা যাইত। রজনীকান্তের 'দযাব বিচাব' ('আমায সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চুর') গানখানি শুনিযা আমাব হৃদযে যে ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহারই আঘাতে বিহ্বল হইযা 'ন্যাযেব বিচার' নামে নিম্নলিখিত গানখানি, রচনা করিযা আমি রজনীকান্তকে উপহাব দিই—

বিপদের বোঝা চাপিযে মাথায় আপনি সে ছুটে এসেছে।
(ও সে পিছু পিছু ছুটে এসেছে)
(মজা দেখতে ছুটে এসেছে)
(বইতে না পেরে পিছু পিছু ছুটে এসেছে)
ব্যথা দিযে ব্যথাহাবী দযামব তোমারে যে ভালোবেসেছে।
আজি, যত দুঃখ তাপ অভাব দৈন্য
ঘিরেছে তোমারে করিতে ধন্য,
তোমাব, স্বাস্থ্য সুখ আশা (তাই) সকল হবণ করেছে।
তৃণাদপি নিচু করিতে তোমায, গর্ব কাডিয়া লযেছে,
সব চুরি করে চতুব সে চোর আপনি যে ধবা দিয়েছে।
(অ-ধরা নামটি ঘুচাইযে আজ নিজে এসে ধরা দিযেছে)
'কাঙাল' করিয়া কাঙাল ঠাকুর কোলে তুলে তোমা নিয়েছে।

সজলনয়নে রজনীকান্ত গানখানি পাঠ করিয়া লিখিয়া জানাইলেন—'চমৎকার হইয়াছে, আশীর্বাদ কর যেন, তোমাব কথা সত্য হয়। গানটার কি সুর হবে— কীর্তনাঙ্গ? সেই ভালো।'

কবিব শোচনীয অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া ঐতিহাসিকের হৃদয়ও বিগলিত হইয়া কবিত্বমন্দাকিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। রজনীকান্তের চিরসুহৃদ অক্ষয়কুমারের হৃদয়ভেদী কাতরতা ও মঙ্গলকামনা কবিতার ভাষায় ফুটিয়া উঠিল। নববর্ষার সহস্রধারা যেমন রৌদ্রতপ্ত ধরণীবক্ষকে শীতল করিয়া দেয়, তেমনি অক্ষয়কুমারের এক-একটি কবিতা কবির রোগক্ষতের উপর শীতল প্রলেপ প্রদান করিল। প্রথমে অক্ষয়কুমার লিখিলেন—

আমরা মায়ার জীব, কাঁদি অহরহ ;
কেন ছেড়ে চলে যাবে কিছু কাল রহ—
কিছুকাল— দীর্ঘকাল— চিবকাল রহ,
হৃদয়ের প্রীতি, স্নেহ, আশীর্বাদ লহ।
আকুল প্রার্থনাপূর্ণ বাংলাব গেহ ,
দেবতা দিবেন বব, নাহিক সন্দেহ।

কবিতা লিখিবার সময অক্ষযকুমার নিজেব ব্যক্তিত্ব ভুলিযা গিযাছেন সমগ্র বঙ্গবাসীর হইযা তিনি বলিতেছেন—

কিছুকাল— দীর্ঘকাল— চিরকাল বহ,
হৃদযেব প্রীতি, স্নেহ, আশীবাদ লহ।

তাবপর তাঁহার দ্বিতীয় পত্র। এ পত্র লিখিবাব সময় রজনীকান্তের জীবনের আশা একেবাবেই ছিল না, তাই অক্ষয়কুমাব কবিকে পরলোকের উজ্জ্বল পথ দেখাইতেছেন—

চিরযাত্রি! মহাতীর্থ সম্মুখে তোমার,
অনিন্দ্য আনন্দধাম, জরামৃত্যুহীন,
অক্ষয অমৃতবসে পূর্ণ চাবিধার,
পরীক্ষাব পরপারে, ভূমানন্দে লীন।
সকল সন্তাপে শান্তি, পবাজয়ে জয়।
সকল সংকটে মুক্তি, অমোঘ আশ্রয়॥
কল্যাণী অভযা বাণী স্বর্গ নিরাময়।
অমৃতে অমব তুমি, বল জয় জয়॥

তিনি সর্বশেষে লিখিলেন—

কত প্রীতি কত আশা কত স্নেহ ভালোবাসা
অনিমিষে চেযে আছে কাতর শিয়রে,
এখনি মঙ্গলগান কেন হবে অবসান
আকাশে দেবতা আছে বরাভয় করে।
মৃতসঞ্জীবনমন্ত্রে আহত হৃদয়যন্ত্রে
বাজিয়া উঠিছে গান নব নব রাগে ,
টুটায়ে বাসনা বন্ধ নব প্রাণে নব ছন্দ
নাচিয়া উঠিছে বিশ্বে দেব-অনুরাগে।

অনাহত অকুণ্ঠিত অকম্পিত গান
মৃত্যুমাঝে অমৃতের পরম সন্ধান ॥

এ পত্র যখন রজনীকান্তের হস্তগত হইল, তখন তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইবার আর বড়ো বিলম্ব নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কবিত্বশক্তি —তাহাও আর নাই, তবুও কবিতা জননীর স্নেহের দুলাল হৃদয়ের কবিত্ব-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ক্ষীণ ও কম্পিত হস্তে লিখিলেন—

এক্সটেম্পোর পত্র পেয়ে হয়েছি অবাক,
হাজার হলেও দাদা, মরা হাতি লাখ।
তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা হল না সফল,
জীবন ফুরায়ে গেল, ভেঙে যায় কল।
আর তো হল না দেখা, করো আশীর্বাদ,
এড়িয়ে সমস্ত দুঃখ বেদনা বিষাদ,
বড়ো যে বাসিতে ভালো, শিখাইতে কত,
ছাপাল কবিতা তাই সে নব্যভারত।
বিদায় বিদায় ভাই। চিরদিন তবে,
মুমূর্ষুর হিতাকাঙ্ক্ষা রেখ মনে করে।
একান্ত নির্ভর আমি করেছি দয়ালে,
মারে সেই, রাখে সেই যা থাকে কপালে।
প্রীতি দিয়ো তথাকার প্রিয় বন্ধুগণে
ভক্তি দিয়ো তথাকার নমস্য সুজনে।

ঠিক এই সময়ে কাতরকণ্ঠে কুমার শরৎকুমার রজনীকান্তকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'সুস্থ শরীরে আপনার যে সৌভাগ্য ঘটে নাই অসুস্থ শরীরে ঈশ্বর তাহা ঘটাবার অবকাশ দিলেন। লোকে এত দিন আপনার এত পরিশ্রমের ফলের যথার্থ স্বাদ পাইতে লাগিল, ভগবানের অভিপ্রায় বুঝা কঠিন। আজ লোকে বুঝিতেছে, আমাদের রাজশাহির কবি সমগ্র বঙ্গের কবি। আপনার এই গৌরবে আজ সমগ্র রাজশাহি গৌরবান্বিত। ভগবান কি আপনাকে পুনঃ রাজশাহিতে ফিরাইয়া দিবেন না? আমরা রাজশাহির কবিকে সমগ্র বঙ্গের কবিরূপে ফিরিয়া পাইয়া ধন্য হইব।'

দেশবাসীর নিকট হইতে এইরূপ অজস্রভাবে সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া, ক্রমে রজনীকান্ত কেমন যেন অভিভূত হইয়া উঠিলেন। তাই তাঁহাকে

বিরক্তির সহিত লিখিতে দেখি—'মনে হয় যে, বিধাতা আমাকে সপরিবারে উপবাস দিন, তা-ও ভালো তথাপি লোকের দয়ার উপব এত আঘাত দেওয়া উচিত নয়। কান্ত-গুণমুগ্ধ দেশবাসী অযাচিতভাবে, অকুণ্ঠিতচিত্তে, হাসিমুখে তাঁহার সেবা ও সাহায্য কবিতেছিল, তাহাতে তো তাহারা একটুও আঘাত অনুভব করে নাই, ববং এতদিনের একটা জাতিগত কলঙ্ক ক্ষালন করিবার সুযোগ পাইয়াছে ভাবিযা তাহারা আনন্দিত হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের সে আনন্দ স্থায়ী হইল কই? সাবা বাংলাব সমবেত চেষ্টা ও সাহায্য ব্যর্থ হইল—বাঙালি আব তো রজনীকান্তকে রোগমুক্ত করিতে পারিল না। কেন হইল, তাহা আমবা বুঝিতে পারি না। তবে মৃত্যুশয্যাশাযী রজনীকান্ত আমাদের চোখে আঙুল দিয়া বলিযা গিযাছেন: 'ডাক্তাব ডাকৃচ—ডাক্তার কি করবে? বাপ যখন তাঁর ছেলেকে টানেন, তখন জগতের এমন কি সাধ্য আছে যে, তাকে ধরে রাখতে পাবে।' অধম আমরা—ভক্তেব ভক্তিভরা এই উক্তি ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না, তাই চোখের জলে আমাদের বুক ভাসিয়া যায়।

১০

মহাপ্রয়াণ

প্রায় আটমাসকাল ক্রূর ব্যাধির অবিশ্রান্ত যন্ত্রণায রজনীকান্তের জীবনদীপ প্রায নির্বাণোন্মুখ হইযা আসিযাছিল। ক্রমে অবস্থা এমনই হইল যে একটু বাতাসের ভরও যেন আর তাঁহার দেহে সহ্য হয় না। শরীর দুর্বল এবং ক্ষীণ হইযাছে, দুরারোগ্য ব্যাধির তাডনায কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে—আর কোনও মতে, কোনও চিকিৎসায় রজনীকান্তকে রক্ষা করা যায় না।

ক্রমে যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি হইল হইল যে, বজনীকান্ত যেন আর সহ্য করিতে পারেন না। দয়ালের কাছে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি লিখিলেন—'আমাকে আস্ত রাখল না। কেটে কুচো কুচো করলে। কেন একটু প্রাণ রাখা? এখন যেতে চাই। এই দেহ গেলে তো এত কষ্ট হবে না, হেমেন? দেহ গেলে, কোথাকার ব্যথা—মন বা আত্মা অনুভব করবে? ভাই রে, আমি heart fail করে মরি, একটু শীঘ্র মরি, একটু

শীঘ্র মরি, তোরা যদি বন্ধু হোস তবে তাই করে দে। না খেয়ে, কি হঠাৎ শ্বাস আটকে মরা— তার চেয়ে ওই ভালো। আর এই জড়কে বাঁচিয়ে কি হবে, ভাই রে? আমাকে শীঘ্র যেতে দে, তারই যে পথ থাকে তাই কর। অকর্মা ঘোড়াগুলোকে গুলি করে মারে, তাই কর। আমি বুক পেতে দিচ্ছি। সেখানে একজন আছে, সে আমার নিতান্ত আপনার, তাঁর কাছে চলে যাই।'

শেষ অবস্থায় রজনীকান্তকে একজন সন্ন্যাসীর ঔষধ সেবন করানো হয়। কালীঘাটের একজন প্রসিদ্ধ গ্রহাচার্য তাঁহার আরোগ্যকামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ দ্রুতগতিতে বাড়িতেই লাগিল। যন্ত্রণার উপশমের জন্য এই সময় রজনীকান্তকে দিনে প্রায় চার-পাঁচ বার করিয়া ইনজেকশন দেওয়া হইত। কিন্তু ইনজেকশনের ফলও আর স্থায়ী হইত না— যন্ত্রণা লাঘব করিবার শক্তিও যেন উহার কমিয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজগণের উত্তেজক ঔষধসমূহ প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গেল। বিধাতার বিধানের কাছে মানুষের শত চেষ্টা পরাজিত হইল।

বিষাদের কালোছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। রজনীকান্তের বৃদ্ধা জননী, পতিগতপ্রাণা সহধর্মিণী, পিতৃবৎসল পুত্রকন্যাগণ, সেবাপরায়ণ বন্ধুবর্গ— সকলেরই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইতে লাগিল। সকলেই সদাই সন্ত্রস্ত ও সশঙ্ক— যেন কখন কি হয়। নিষ্ঠুর কাল কখন আসিয়া তাঁহাদের অলক্ষিতে, তাহাদের বড়ো আদরের রজনীকান্তের দেহ হইতে প্রাণপুষ্পটিকে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে।

অনন্তের তীরে দাঁড়াইয়া রজনীকান্তকে লিখিতে দেখি—'হে আমার মঙ্গলকর্তা। আমার পরম বন্ধু, তোমার জয় হউক।' পরপারের যাত্রী, যাত্রা আরম্ভের পূর্বে তাঁহারই জয় ঘোষণা আরম্ভ করিলেন— অন্তপারের সেই অভয়-নগরে পাড়ি দিবার জন্য— তাঁহার দয়ালের কাছে পৌছিবার জন্য পারের কড়ি সম্বল করিয়া লইলেন। রজনীকান্ত জানিতেন, সেই দয়াল ছাড়া তাঁহার আর কোনও গতি নাই, আর কেহ তাঁহার আপনার নাই, আর কেহ তাঁহাকে তাঁহার 'নিজ হাতে গড়া' বিপদসমুদ্রের মাঝে কোলে করিয়া বসিয়া থাকে না। চন্দন-চর্চিত ভক্তিপুষ্পে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাঁহার দয়ালের চরণে উপহার দিতে দিতে তিনি কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন— 'ভগবান শীঘ্র নাও। শীঘ্র তোমার কাছে ডেকে নাও, তোমার কোলে ডেকে নাও। আর তো পারি না দয়াল!'

পতির এই অরুন্তুদ যন্ত্রণা দেখিয়া সাধ্বী পত্নীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল;

মরণোন্মুখ পতির আসন্ন অবস্থা বুঝিয়া মর্মভেদী কাতরকণ্ঠে তিনি পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাদের ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?' অকম্পিতহস্তে রজনীকান্ত উত্তর লিখিলেন— 'আমাকে দয়াল ডাকচে, তাই আমি যাচ্ছি।'

২৪ ভাদ্র ১৩১৭ শুক্রবার রাত্রিতে তিনি একবার কি দুইবার 'সুপ্' পান করেন। এই আহারই তাঁহার শেষ আহার। শনিবার হইতে তাঁহার আহার বন্ধ হইয়া যায়। কণ্ঠনালী দিয়া একবিন্দু জলও গ্রহণের শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। রোগের প্রারম্ভে তিনি একদিন লিখিযাছিলেন, 'আমার বোধ হয় আহারের সমস্ত আয়োজন সম্মুখে নিয়ে আমি অনাহারে মরব'। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল, সত্য সত্যই আহার বন্ধ করিয়া নিষ্ঠুর কাল তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত করিবার আয়োজন করিল।

যথার্থই আহার্য সম্মুখে উপস্থিত, কান্ত ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর, কিন্তু গলাধঃকরণ করিবার কোনও উপায় নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, সুশীতল জল সম্মুখে আনা হইল— কিন্তু পান করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। ক্রমে কান্তের আহারনালী একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে প্রাণরক্ষার জন্য জলীয় আকারে আহার্য রজনীকান্তের পাকস্থলীতে প্রবেশ করানো হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হইল না। ক্ষুধায় ও পিপাসায় তিনি আকুলিব্যাকুলি করিতে লাগিলেন। তখন আর তাঁহার লিখিবার সামর্থ্য নাই। শুক্রবার হইতেই তাঁহার লেখা বন্ধ হইয়া গেল— মনোভাব জানাইবার যে একমাত্র উপায়— তাহাও লুপ্ত হইল! এই সময় তিনি কেবল নিজের ডান হাতখানি মুখে স্পর্শ করাইয়া জানাইতে লাগিলেন— দারুণ পিপাসা।

রবিবার সকাল হইতে ক্ষুধার যাতনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। একবার উদরের উপর তাঁহার শীর্ণ হাতখানি রাখেন, আবার পরক্ষণেই উহা ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া ইঙ্গিতে পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেন। মুমূর্ষু রজনীকান্ত নীরব ভাষায় যেন বলিতে লাগিলেন— 'পেটে ক্ষুধা, কিন্তু খাবার ক্ষমতা নাই, দয়াল আমার সে ক্ষমতা হরণ করিয়া লইয়াছেন।'

তাঁহার আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবর্গ তখন আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় সন্ত্রস্ত। তাহাদের সে সময়ের অবস্থা অবর্ণনীয়। চোখের সামনে রজনীকান্তের সে অবস্থা আর দেখা যায় না, প্রাণ বাহির হইয়া আসে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়! বাক্যহারা, কণ্ঠহারা কবির সঙ্গে সকলেরই কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। সমস্ত নীরব ও নিস্তব্ধ!

সোমবার রজনীকান্তের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। রাত্রিতে যাতনায়—গায়ের জ্বালায় রজনীকান্ত এত কাতর হইয়া উঠিলেন যে, তিনি ছুটিযা বাহিরে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু হায়। চলচ্ছক্তিরহিত, ক্ষীণ, দুর্বল রজনীকান্তের তখন উঠিবার শক্তি কোথায়? জীর্ণ ও কঙ্কালসার দেহকেও বহন করিবার শক্তি তখন তাঁহাব স্ফীত পদদ্বয়ে আব নাই।

মঙ্গলবার সকালে রজনীকান্ত একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন সকলেই লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার শরীরে যেন অবসাদের ভাব আসিযাছে। সকালে ৭টা ও ৮টার সময় উপর্যুপরি ইনজেকশন দেওযা হইল, দশটাব সময তাহাব অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইযা পডায, আবার ইনজেকশন দেওযা হইল। মধ্যাহ্নে তিনি কেমন যেন অভিভূত হইযা পডিয়া রহিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাব সময তিনি বিছানায় আব শুইয়া থাকিতে চাহেন না। সকলে বুঝিল আব দেরি নাই, রজনীকান্তেব শেষ ডাক আসিয়াছে—

শেষ আজ সব গান ওবে গানহারা পাখি,
অশেষ গানের দেশে করে তোমা ডাকাকাকি।

রজনীকান্ত ছটফট করিতে লাগিলেন। পিপাসায প্রাণ যায়। মুখ নাড়িয়া কত রকমে কান্ত তাঁহার দারুণ পিপাসার কথা ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিলেন। হায বিধাতা, তুমি কি নিষ্ঠুর। সংসারেব সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করিযা যে তোমার অভয়চরণে শরণ লইবার জন্য মহাযাত্রা করিযাছে, যাত্রার পূর্বে নিদারুণ পিপাসায় একবিন্দু জলও তাহাকে পান করিতে দিলে না। সত্য সত্যই তাহাকে 'সকল রকমে কাঙাল' করিযা নিজের কাছে টানিযা লইলে! তাহার সুখ, সম্পদ, আশা, ভরসা, স্বাস্থ্য, আহার, এমনকি তৃষ্ণার জলটুকুও হরণ করিয়া লইয়া তবে তাহাকে আশ্রয দান করিলে। এ কি লীলা লীলাময়!

রাত্রি আটটা বাজিল, তখনও বজনীকান্তের বেশ জ্ঞান রহিয়াছে; অল্পে অল্পে তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইতেছে। কিন্তু একি? পনর মিনিট পরে দেখা গেল, নাড়ি পাওয়া যায় না। আটটা-পঁচিশ মিনিটের সময় রজনীকান্তের শ্বাসটান আরম্ভ হইল। তারপর? তারপর সাড়ে-আটটার সময় সব ফুরাইল! ভাবময়, স্নেহময, কৌতুকময়, হাস্যময়, সংগীতময় রজনীকান্ত চারিদিনের অনাহারে নির্জীব অবস্থায় ইহজগৎ হইতে বিদায লইলেন। অকালে, মাত্র পঁয়তাল্লিশ

বৎসর বয়সে বৃদ্ধা জননী,[১] গুণবতী সহধর্মিণী, চারি পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ, শৈলেন্দ্রনাথ) এবং তিনটি কন্যাকে (শান্তি তৃপ্তিবালা) অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া কান্তের জীবনদীপ হাসাইয়া যাহার পরিচয়, কাঁদাইয়া সে চলিয়া গেল। মায়ের আনন্দময়ী মায়ের কোলে চিরশান্তি লাভ করিল।

আনন্দের যে নিত্যনিকেতনে উপস্থিত হইবার জন্য রোগশয্যায় পড়িয়া তাঁ অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, হৃদয়ের অতৃপ্ত পিপাসা মিটাইবার জন্য বাক্যহারা কবি কবিতার মধ্য দিয়া—ভাষার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ আটমাস কাল যে মর্মকাতরতা ব্যক্ত করিতেছিলেন, নীরবে নয়নধারায় বক্ষতল সিক্ত করিয়া শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে যে অকুণ্ঠিত আত্মনিবেদন জানাইতেছিলেন— আজ সে সমস্ত সার্থক হইল। মৃত্যুযন্ত্রণাজয়ী, অমর কবি কীর্তির অক্ষয় কিরীট ধারণ করিয়া মহালোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন। বঙ্গে রজনীকান্তের মধুমাখা বীণার অমৃতঝংকার চিরতরে থামিয়া গেল। কান্তকবির প্রতিভার কনক-কিরণে ভারতীর মন্দিরপ্রাঙ্গণ সবেমাত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল— কিন্তু অকালে কাল-মেঘে সেই প্রতিভার জ্যোতি চিরতমসাবৃত হইল। উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর চাঁদের আলো খেলা করিতে লাগিল, কিন্তু আমাদের বুকের ভিতর আঁধার হইয়া গেল।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া মুহূর্তমধ্যে হাসপাতালে বহুলোক আসিয়া সমবেত হইল। ভক্ত কবির পূতদেহ ফুল দিয়া সাজানো হইল, তাঁহাকে ধীরে ধীরে কটেজের বাহিরে লইয়া আসা হইল।

বহুদিন পূর্বে একদিন রজনীকান্ত ফুল্লকণ্ঠে যে গান গাহিয়া শত শত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যে গানের প্রতি মূর্ছনায় নব নব উন্মাদনার সৃষ্টি হইত, সেই মধুর প্রাণস্পর্শী গান—

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল-নন্দনে,
কবে, তাপিত এ চিত কবিব শীতল,
তোমারই করুণা-চন্দনে।

---

১ রজনীকান্তের ন্যায় একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত সন্তানকে হারাইয়া মনোমোহিনী দেবী বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ১৩১৭ সালের ৪ কার্তিক (রজনীকান্তের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে) কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কবে, তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম দিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে।
কবে, ভবের সুখ-দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না—
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

গাহিয়া রজনীকান্তকে লইয়া সকলে শ্মশানে যাত্রা করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। কলিকাতা নগরীর বিরাট জনকোলাহল কমিয়া আসিলেও, তখনও একেবারে থামিয়া যায় নাই। শতকণ্ঠের করুণ ঝংকার কলিকাতার বিশাল রাজপথকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল—

শতকণ্ঠে উৎসারিয়া সংগীতের দিব্য সুধাধারা
কবি হরিধ্বনি,
শ্মশানের মুক্ত বক্ষে রাখিল সে অমূল্যসম্ভার
বহি লয়ে আনি।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।

—মধুসূদন

১

কবি · বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে

আমরা বাঙালি। বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে হৃদয় ভরিয়া যায়, বাস্তবিকই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তবু স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইতেছে যে, বাঙালির স্মরণশক্তি— বাঙালি জাতির স্মরণশক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে, ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। পুরাণের কথা ধরি না, ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, সে সকল কথা মনে রাখিবার ক্ষমতা আমাদের একেবারেই নাই— কাল যাহা হইয়া গিয়াছে, আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, সেদিন চক্ষুর সম্মুখে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, দুই দিন পরে তাহা বিস্মৃত হইতেছি, এটা আমাদের জাতির দোষ।

রাজনীতিক্ষেত্রে রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাসকে ভুলিয়া গিয়াছি, সমাজ-সংস্কারক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দকে ভুলিয়া গিয়াছি, সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথিকে ভুলিয়া গিয়াছি, কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, বিহারীলালকে ভুলিয়া গিয়াছি, ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণপ্রসন্ন, শশধরকে ভুলিয়া গিয়াছি। আর কত নাম করিব? যাঁহাদের লইয়া বাঙালি জাতি নব-ভাবে, নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, যাঁহারা শিক্ষায় দীক্ষায়, আচারে ব্যবহারে, ধর্মে কর্মে, সংগীতে কবিতায়, ব্যাখ্যায় বিবৃতিতে বাঙালির জীবন নূতন ভাবে, নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ধরণে গঠন করিয়া নবযুগের বোধন করিয়া গিয়াছেন— আমরা বাঙালি তাঁহাদের সকলকেই, সেই মনস্বী, তেজস্বী, বরেণ্য সকলকেই একে একে ভুলিতে বসিয়াছি— দুঃখ হয় না?

আমাদের এই প্রখর স্মরণশক্তির পরিচয় সাহিত্যক্ষেত্রে যেন কিছু বেশিমাত্রায় পাওয়া যায়। শেকসপিয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়া গেলেন একজন, আর প্রজার নিকট খ্যাতি পাইলেন এবং রাজার নিকট খেতাব পাইলেন আর একজন। মধুর সুললিত সংগীত রচনা করিলেন একজন, সেই গান প্রচারিত হইল, প্রসিদ্ধি লাভ করিল আর-একজনের নামে। নাটক লিখিলেন একজন, সেই নাটক যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল স্পষ্টাক্ষরে অন্যের নাম পুস্তকের প্রচ্ছদপটে জ্বলজ্বল্ করিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে কি, এখন শুনিতেছি— 'যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী' গানটি কোনও ক্ষণজন্মা নিজের নামে চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 'পরিব্রাজক বলে চরণতলে

লুটাই চির দিনযামিনী'—এই শেষ চরণের ভণিতা তুলিয়া দিলেই আপদের শান্তি। আর কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী যে গানের ভণিতায় 'পরিব্রাজক' লিখিতেন, তাহাই বা আজ কয়জন লোকে অবগত আছেন ?

তাই যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বা ডি. এল. রায় 'হাসির গান' গাহিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বাঙালি, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই, তাঁহার গানে আত্মহারা হইয়াছিল, বিভোব হইয়াছিল, আনন্দে আটখানা হইয়াছিল। শিক্ষিত বাঙালি, ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালি ইংরাজদিগের দেখাদেখি ঘোরতর আত্মম্ভর হইয়াছিল, দুঃখবাদের 'গেল গেল' ববে, 'নেই নেই' ধ্বনিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল—পবস্পরেব সহিত, প্রতিবেশীর সহিত, আত্মীয়স্বজনের সহিত বাক্যালাপ করিতেই তাহার কুণ্ঠা বোধ হইত, তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত, লজ্জা বোধ হইত, হাসির গান গাহিবার বা শুনিবার বা স্মরণ রাখিবার তখন তাহার অবসর ছিল না, সে তখন গ্যানো পড়িয়া বৈজ্ঞানিক, কোঁৎ-তন্ত্রের আলোচনা কবিযা নবতান্ত্রিক, মিল পড়িয়া দার্শনিক, শেক্‌স্‌পিয়র পড়িয়া কবি—তখন সে হাস্যবসেব ধার ধাবে না, হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলে ; কেবল দুঃখ দুঃখ দুঃখ আর টাকা, টাকা টাকা—কেবল লাভ-লোকসানের খতিয়ান, আর জমা-খরচের কৈফিয়ত। আচার্য অক্ষয়চন্দ্রেব ভাষায় বলি, 'ঐ যে অভিনব কাসেলে মর্মর-হর্ম্যতলে সোফাধিষ্ঠিত সট্‌কা-নল-হস্ত স্বয়ং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, আব এই যে কদমতলাব পুকুরপাড়ে, ছিন্নবাস, শীর্ণবপু, জীর্ণপ্রাণ, তরঙ্গদৃষ্টি দরিদ্র যুবা, উভয়ের অবস্থাব মধ্যে সুমেরু কুমেরু ভেদ থাকিলেও, উভয়েই জানেন, তাঁহারা বড়ো দুঃখী অতি দুঃখী। কলেজে দুঃখ, কোর্টে দুঃখ, ট্রেনে দুঃখের আলাপ, নদীতীবে দুঃখের বিলাপ, দুঃখ নাই কোথায় ? সকলই দুঃখ। দুঃখ আর দুঃখ, শিক্ষিত বাঙালি সকল অবিশ্বাস করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন দুঃখে।'

তাই যখন শিক্ষিত বাঙালি দেখিল যে, ইংরাজিশিক্ষিত ডি. এল. রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী ডি. এল. রায়, বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডি. এল. রায়, হ্যাট-কোট-বুট-পরা ডি. এল- রায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এল. রায় হাসির গান রচনা করিতেছেন, আর সভাসমিতিতে, বৈঠকখানার বৈঠকে, বন্ধুবান্ধবের মজলিশে স্বরচিত হাসির গান নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে সুললিতকণ্ঠে গাহিতেছেন তখন তাহারা অবাক হইয়া গেল, স্তম্ভিত হইয়া গেল, একেবারে হতভম্ব ! এ যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অবাক কাণ্ড ! তখন তাহাদের প্রাণ খুলিয়া হাসিবার ক্ষমতা নাই, হাততালি দিয়া বাহবা দিবারও শক্তি নাই।

ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের অশ্লীলতাশূন্য, বিশুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ হাসির গান বাঙালিকে—শিক্ষিত বাঙালিকে—হাসাইয়া নাচাইয়া মাতাইয়া তুলিল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের কথা বাঙালি বহু পূর্বেই বিস্মৃত হইয়াছিল—তাহার হাসির গানগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল। বাঙালি ঈশ্বর গুপ্তকেও ভুলিতে বসিয়াছিল, তিনিও যে বহুতর হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বিস্মৃতি-সলিলে ভাসাইয়া দিয়াছিল—যে দুই একটি গান তখনও কোনও রকমে মনে করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের পাশে বসিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না—উৎকট অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইল, প্যারীমোহন কবিরত্নের হাসির গান, পরিব্রাজকের হাসির গান, 'বিঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা',

মা, এবার ম'লে সাহেব হব,
বাঙাচুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিভ নাম ঘোচাব।
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব।
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।

প্রভৃতি আধুনিক হাসির গান—সমস্তই শিক্ষিত বাঙালি ইতিপূর্বে ভুলিয়া গিয়াছিল। হেমচন্দ্র হাসির গান লেখেন নাই, তাঁহার জাতীয় সংগীত তাহার ব্যঙ্গ-কবিতাকে চাপা দিয়াছিল—তিনি 'জাতীয' কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র ব্যঙ্গ-রঙ্গ, রস-রসিকতার দিক দিয়া যান নাই। রবীন্দ্রনাথ রসরচনায় সিদ্ধহস্ত—তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা—তাঁহার 'বঙ্গবীর', তাঁহার 'হিং টিং ছট্' ব্যঙ্গ-কাব্যসাহিত্যের অলংকার, কিন্তু তিনি কখন হাসির গান লেখেন নাই। 'গানাৎ পরতরং ন হি'—সংগীত যে স্বর্গের সামগ্রী, তাহার সাধনা করিতে হয়, আরাধনা করিতে হয়, পূজা করিতে হয়। সংগীত তো হাসিতামাসার বিষয় নয়, ব্যঙ্গ-রঙ্গের বস্তু নয়, ছেলেখেলার জিনিস নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ হাসির গান লেখেন নাই, একটিও নয়। তাই শিক্ষিত বাঙালি দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়া তাঁহাকে মাথায় করিয়া নাচিয়াছিল।

তাহার পর, দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই হাসির গান লিখিলেন, রাজশাহির রজনীকান্ত। দ্বিজেন্দ্র-ভক্তগণ বলিয়া উঠিলেন, 'রজনীকান্ত রাজশাহির ডি. এল. রায়'। সংবাদপত্রে, মাসিক পত্রিকায় এই উক্তির সমর্থন ও প্রতিবাদ হইয়াছিল। রজনীকান্তের ভক্তগণ ও শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন, যেন ইহাতে রজনীকান্তকে খাটো করা হইয়াছে, আর দ্বিজেন্দ্রলালকে বাড়ানো

হইয়াছে। আমরা এই উক্তির একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই। প্রথমে এই সম্বন্ধে দুইজন আধুনিক কবির মত উদ্ধৃত করিব। কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিয়াছেন, 'কেহ কেহ বলেন, ইহার [রজনীকান্তের] কৌতুক-সংগীত-গুলি দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনুকরণে রচিত। অনুকরণের অর্থ যদি সুর বা ছন্দের অনুকরণ হয়—তাহা হইলে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গ্রন্থের অন্তরঙ্গ অংশের সহিত কোনও মিল নাই। রজনীবাবুর রচনা দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনুকরণে তো নয়ই, পরন্তু রজনীবাবুর কৌতুক-রচনা অধিকতর সদিচ্ছাপ্রণোদিত।' আর সুকবি রমণীমোহন ঘোষ লিখিয়াছেন, 'রজনীকান্তের হাসির গানে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাকে 'রাজশাহির ডি. এল. রায়' বলিতেন। বস্তুত বঙ্গ-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যতীত অন্য কোনও কবি হাসির গান রচনায় তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রজনীকান্তের কোনও কোনও হাসির গান রায়-কবির অনুসরণে রচিত হইয়া থাকিলেও ঐ সকল রচনায় তাঁহার নিজস্বতা যথেষ্ট আছে। তাঁহার রচনা ছায়া অথবা প্রতিধ্বনি মাত্র নহে। একজন প্রবীণ সমালোচক লিখিয়াছেন, "পরবর্তী লেখকদিগকে পূর্ববর্তী প্রতিভাশালী লেখকদের কতকটা অনুবর্তী হইতেই হইবে, ইহা অপরিহার্য। তাহাতে ক্ষমতার অভাব বুঝায় না, পৌর্বাপর্য মাত্র বুঝায়।" রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী—এই হিসাবেই তাঁহাকে হাস্যরসের রচনায় দ্বিজেন্দ্র-লালের অনুবর্তী বলা যাইতে পারে।'

আমরা কিন্তু উভয় কবি-সমালোচকেরই উক্তি সমর্থন করিতে পারি না, আমরা অন্য রকম বুঝি। স্পষ্ট করিয়াই বলি, আমরা বুঝি, 'রজনীকান্ত রাজশাহির ডি. এল. রায়' বলিলে ডি. এল. রায়কে খেলো করা হয়, খাটো করা হয়। যাঁহারা ঐ কথা বলেন, তাঁহারা রায় মহাশয়ের ভক্ত হইলেও, তাঁহারা গোঁড়ামি করিতে গিয়া তাঁহাকে খেলো করিয়া বসেন। যিনি ডি এল. রায়ের প্রকৃত ভক্ত অর্থাৎ যিনি ডি. এল রায়কে বুঝিয়াছেন, ভালোরূপে তাঁহার নাটকগুলি পাঠ করিয়াছেন—তিনি কখনোই ঐ কথা বলিতে পারেন না। ঐ কথা ভণ্ড ভক্তের উক্তি, যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত, না জানিয়া সমালোচক—তাঁহাদের উক্তি।

দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার অনুকরণে বলি, দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব সাজাহান, দুর্গাদাস ও রানাপ্রতাপে, বিরহ, পাষাণী ও কল্কি অবতারে, সীতা-কাব্যে ও কালিদাসের সমালোচনায়—দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব আমার

দেশে, আমার জন্মভূমিতে ও ভারতবর্ষে, দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, অনাবিল হাস্যরসের অবতারণায়—যাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম বটতলা হইতে সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া বাবুর বৈঠকখানার আসরে এবং ঠাকুরঘরে নৈবেদ্যের পার্শ্বে সগর্বে বসাইয়াছিলেন। এক হাসির গান ও স্বদেশ সংগীত ভিন্ন এই সকল কোনও বিষয়েই তো রজনীকান্তের গৌরবের কিছুই নাই। তবে কিসে রজনীকান্ত 'রাজশাহির ডি. এল. রায়'? আবার রজনীকান্তের যাহা আছে তাহা তো ডি. এল রায়ের সাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। রজনীকান্তের গৌরব—তত্ত্ব-সংগীতে, বৈরাগ্যসংগীতে ও সাধনসংগীতে—ডি. এল. রায় সে পথ কখনো মাড়ান নাই। তবে কিরূপে রজনীকান্ত 'রাজশাহির ডি. এল রায়'? না, ওভাবে কোনও দুইজন ব্যক্তিকে সমপর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না, দুইজন কবি তো কখনোই একশ্রেণীর হইতে পারেন না। 'রবীন্দ্রনাথ বাংলার শেলী', 'মধুসূদন বাংলার মিল্টন' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক পরিচয়ের ন্যায় 'রজনীকান্ত রাজশাহির ডি. এল. রায়' অবিবেচকের উক্তি।

আর একটি কথা। অনেকে বলেন, রজনীকান্ত হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের শিষ্য। ঠিক কথা, আমরাও এ কথা স্বীকার করি। পূর্বেই লিখিয়াছি—রাজশাহিতে ওকালতি আরম্ভ করিবার পর কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রজনীকান্তের পরিচয় হয়। দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত মুগ্ধ হন। তাহার পর হইতেই তিনি হাসির গান লিখিতে আরম্ভ করেন। মুগ্ধ হইবার যে যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তখন যৌবনের ভরা জোয়ারে আবাল্য-সংগীতসেবী রজনীকান্তের বুকের ভিতর সংগীত থৈ-থৈ করিতেছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাহাতে বান ডাকাইল। রজনীকান্ত দেখিলেন, হাসির গানে শ্রোতা মোহিত হয়, অনায়াসে, অল্প পরিশ্রমে লোককে হাসাইতে পারা যায়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হাসির গান উপভোগ করে, তাহাতে আনন্দ পায়, মাতিয়া উঠে। কাজেই যৌবনে রজনীকান্ত হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের একান্ত অনুগত শিষ্য। এ শিষ্যত্বে অগৌরব তো নাই, অবমাননাও হয় না। রজনীকান্ত স্বয়ং বিনয়ের অবতার ছিলেন, তিনি এই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন, আর আমরা এ কথা লিখিয়া যে রজনীকান্তের অগৌরব করিলাম—এমনও মনে করি না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ফাদার লাফোঁর শিষ্য, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-

ক্ষেত্রে আজীবন সাহিত্যসেবক অক্ষয়চন্দ্রের শিষ্য। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, 'রামেন্দ্রসুন্দর এক সময়ে আমার সাহিত্যশিষ্য ছিলেন, কিন্তু "বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে"— তিনি জ্ঞানবলে গরীয়ান, সুতরাং আমার গুরু।' তাই বলিতেছিলাম, হাসির গানের রজনীকান্তকে দ্বিজেন্দ্রলালের শিষ্য বলিলে রজনীকান্তের অগৌরব করা হয না, তবে আমরা দেখিতে পাই, এই হাসির গানে অনেক স্থলে শিষ্য গুরুকে হাবাইযা দিযাছেন, 'জ্ঞানবলে গরীয়ান' হইযা, অধিকতর সূক্ষ্মদৃষ্টি-সাহায্যে, বিদ্রূপবাণে ও কৌতুকের কশাঘাতে তিনি গুরুকে পরাস্ত করিযা স্বযং গুরুব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবলাভ করিয়াছেন। শিষ্যেব নিকট গুরুব পরাজয— সে তো গুরুর পরম গৌরবের কথা। তবু অতি ভযে ভয়ে, অতি সন্তর্পণে এই সকল কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। এখন বাংলায় সাহিত্যরাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা, স্বস্ব-প্রধান ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, এখন আমবা সকলেই ঐতিহাসিক, সকলেই প্রত্নতাত্ত্বিক, সকলেই দার্শনিক, সকলেই কবি, সকলেই সম্পাদক। আর সমালোচক? সে কথার উত্থাপন না করিলেই ভালো ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র গিয়াছেন, অক্ষয়চন্দ্র গিযাছেন, চন্দ্রনাথ গিযাছেন, ইন্দ্রনাথ গিয়াছেন, বিশারদ গিযাছেন, সমাজপতি গিয়াছেন. চন্দ্রশেখর যাওয়ার সামিল হইযাছেন। কাজেই হাসিও পায়, কান্নাও আসে, আব ভবানন্দের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা কবে, 'আরে ম'ল। সুযো— সে হল সেনাপতি। সুযি্যি গুহ— সুয্যে— যাকে আমরা ক্যাবলা বলতুম। যা বাবা, সব মাটি।' রজনীকান্তের হাসির গান ও কবিতার আলোচনা করিতে বসিয়া রসচূড়ামণি কানহাইয়ালাল দ্বিজেন্দ্রলালকে বাদ দেওয়াও যায় না, আবার রায়-কবি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে গেলেই সমালোচক ফোঁস করিয়া উঠেন। আমাদেব উভয়সংকট—

না ধরিলে বাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ,
সীতার হরণে যেন মারীচ-কুরঙ্গ।

হাস্যরসসৃষ্টিতে রজনীকান্ত বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড়ো শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু এবং মেকি ধর্মের শত্রু।' অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত কেবল কেন, মনীষী মাত্রেই মেকির শত্রু। হেমবাবুও মেকির শত্রু। মেকির উপর কশাঘাত করিতে হেমবাবু ছাড়েন নাই।··· তিনি সমানে গাড়ি চালাইয়া চলিয়া গিয়াছেন; আর তাইনে মেকি, বাঁয়ে "হুবগ" উভযের পৃষ্ঠেই সমানে চাবুক চালাইয়াছেন।' বাস্তবিকই মনীষী মাত্রই

মেকির শত্রু— দ্বিজেন্দ্রলালও মেকির শত্রু, আর আমাদের রজনীকান্তও মেকির শত্রু। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত— এই চারিজন মনীষীর মধ্যে মেকির শত্রুতা সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। প্রথমত ঈশ্বর গুপ্ত অধিকাংশ স্থলেই পদ্যের ভিতর দিয়া কশাঘাত করিয়াছেন, গানের ভিতর দিয়া কম। আর সেই সকল পদ্য তাঁহার সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইলেও, আধুনিক পাঠক অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলিয়া সেগুলিকে তেমন আদর করেন না। হেমচন্দ্র একটিও হাসির গান লেখেন নাই। তাঁহার যাবতীয় ব্যঙ্গ ও কৌতুক কবিতার মধ্যে লিপিবদ্ধ। হেমচন্দ্রের কৌতুক-কবিতাগুলির মধ্যে অধিকাংশই তৎসাময়িক বিশেষ বিশেষ সামাজিক ঘটনা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল, সুতরাং এখনকার সমাজে সে সকলের আর তেমন কদর নাই। 'টেম্পল চাচা' কে ছিলেন তাহাই জানি না, মিউনিসিপ্যাল বিলের কথা, ইলবার্ট বিলের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই হেমচন্দ্রের রসাস্বাদ করিতে পারি না, 'মুখুজ্জের বাজিমাৎ' উপাদেয় ব্যঙ্গ-কবিতা হইলেও—

আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে,
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে?

ইহার শ্লেষ, ইহার দ্যোতনা বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর গুপ্তে 'কেবল ঘোর ইয়ারকি'। তিনি ঈশ্বরের নিকটে ইয়ারকি করিয়া বলিতেছেন—

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা॥
কহিতে না পার কথা— কি রাখিব নাম।
তুমি হে, আমার বাবা, 'হাবা আত্মারাম'॥

আবার পাঁটার সঙ্গে ইয়ারকি করিয়া বলিতেছেন—

এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়বংশ বোকা॥

আর ঈশ্বর গুপ্তের হাতে নারী নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। পাঠক। 'ভয়ানক শীত' শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া দেখুন— উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার উপায় নাই।

হেমচন্দ্রের আক্রোশ বা আক্রমণ অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তি-বিশেষের উপর, অনেক সময়েই personal attack, কেমন একটু বিদ্বেষপ্রসূত। তখনকার

দিনে অনেকেই ব্যক্তি-বিশেষের উপর চাবুক চালাইতে ভালোবাসিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ফতোয়া দিয়া গিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ।' কিন্তু অতি বিনীতভাবে বলিতেছি, বঙ্গসাহিত্যের শাহেনশা বাদশার এই ফতোয়া আমরা আভূমি কুর্নিশ করিয়া মানিয়া লইতে পারিলাম না। মার্শম্যান সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া গুপ্ত-কবি যে 'বাবাজান্ বুড়া-শিবের স্তোত্র' লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে মাত্র চারিছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠ করিয়া দেখুন বিদ্বেষ-ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না—

ধর্মতলা ধর্মহীন— গোহত্যার ধাম।
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সেরূপ তব নাম॥
বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর।
ফ্রেণ্ড হয়ে ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি R ॥[১]

তাহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানের রাজা, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার গানে ও কবিতায় ব্যঙ্গ অপেক্ষা কৌতুক বেশি, মেকির উপর কশাঘাত অপেক্ষা তাহাকে লইয়া রসিকতা করার ভাবটা বেশি, কেবল হাসির জন্য লোককে হাসাইবার চেষ্টা অধিক, বেশির ভাগ ভাঁড়ামি বা fun বা রঙ্গ, humour বা satire কম।

পুরাকালে ছিল শুনি,
দুর্বাসা নামেতে মুনি—
আজানুলম্বিত জটা মেজাজ বেজায় চটা,
দাড়িগুলো ভারি কটা।

ইত্যাদি ধরণের পদ্য বা গান প্রচুর, আর সেই সকল পদ্যে ভাঁড়ামিই বেশি। দ্বিজেন্দ্রলালের চেষ্টা ছিল কেবল লোককে হাসাইবার। তবে সমাজের ত্রুটি, বিচ্যুতি, ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়া তিনি স্থানে স্থানে ঘা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার তত বেশি লক্ষ্য ছিল না। আর তিনিও personal attack-এর, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আক্রমণের ঝোঁক এড়াইতে পারেন নাই। তিনি শশধর ও হাক্সলির খিচুড়ি রাঁধিয়া গিয়াছেন—

১ Friend-এর 'r' বাদ দিলে 'Fiend' থাকে। Fiend মানে শয়তান, দুশমন।

'আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
Of শশধর, Huxley and goose.'

আর তাঁহার 'শ্রীহরি গোস্বামী' ('চূড়ামণির অভিশাপ') শ্রদ্ধাস্পদ শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়েব উপর আক্রমণ। পূর্বে বলিয়াছি 'হিং টিং ছট' ব্যঙ্গ কাব্য-সাহিত্যের অলংকার, কিন্তু সকলেই জানেন, ইহাও ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল।

রজনীকান্তের সমগ্র হাসির গান ও কবিতার মধ্যে কোথাও কোনও ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আক্রোশ বা আক্রমণ নাই। ইহা তাঁহাব রস-রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব। বিনয়েব অবতাব রজনীকান্ত, ভাবুক রজনীকান্ত, জনপ্রিয় রজনীকান্ত, সাধক রজনীকান্ত কখনো কোনও দলাদলিব মধ্যে ছিলেন না, কখনো কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে বা অবজ্ঞাভরে দেখেন নাই, কখনো কাহাকেও ছোটো বলিয়া, নীচ বলিয়া তাচ্ছিল্য কবেন নাই। তিনি সকলকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতেন, আত্মজন ভাবিয়া স্নেহ করিতেন, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনগণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন, জ্ঞানগরীয়ান্ ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন—তাই রজনীকান্ত ছিলেন সকলের—সকলের ছিলেন রজনীকান্ত। তাঁহাতে কোনও সমাজ-বিশেষের পক্ষপাতিত্বজনক অন্য সমাজ সম্বন্ধে বিদ্বেষ ছিল না, তিনি কোনও ধর্মেব নিন্দা কবিতেন না—সকল সমাজকে, সকল জাতিকে, সকল ধর্মকে সমানভাবে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। আর তিনি ছিলেন আধুনিক সাহিত্যিক দলাদলির ঘোঁটের বাহিরে, সংকীর্ণতার লেশমাত্র তাঁহার চবিত্রে কখনো দেখি নাই। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিত, আপনার বলিয়া ভাবিত। তাই তাঁহার বোগশয্যার পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকেও দেখিয়া-ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলালকেও দেখিয়াছিলাম—সুরেশচন্দ্রকেও দেখিয়াছিলাম, কৃষ্ণ-কুমারকেও দেখিয়াছিলাম—শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকেও দেখিযাছিলাম, আবার বিদ্যালয়ের অপোগণ্ড ছাত্রমণ্ডলীকেও দেখিয়াছিলাম। এ-হেন রজনীকান্তের লেখনীমুখে কখনোই personal attack বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আক্রমণ বাহিব হইতে পারে না। তিনি কখনো কোনও ব্যক্তিকে কশাঘাত করেন নাই।

রজনীকান্তের আর-একটি বিশেষত্বের কথা বলিতেছি। ইহা তাঁহার হাস্য-কাব্যের বিশেষত্ব না হইলেও, ইহা হইতে হাস্যকাব্যে তাঁহার সংযমের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। আধুনিক হাস্যকাব্যে parody বা বিকৃতানুকৃতি ব্যঙ্গ-কবিতা বা নকলের অভাব নাই। কে এই প্যারডি প্রথম বঙ্গসাহিত্যে চালাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে তিনি যিনিই

হউন, তিনি বঙ্গসাহিত্যরসের কালাপাহাড়— হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে গিয়া ন্যক্কারজনক বিকৃত বীভৎসরসের আমদানি করিয়া গিয়াছেন— সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া সৌন্দর্যের স্থানে কদর্য-কুৎসিতকে স্থানদান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কোনও কোনও কুৎসিত কদাকার মূর্তি দেখিলে মনে একটু ক্ষণিক হাসি আসে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদে ও ঘৃণায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। প্রস্ফুটিত কুসুম-উদ্যান যদি কোনও কারিগবের রচনানৈপুণ্যে বিকট বীভৎস শ্মশানে পরিণত হয়, তবে সে দৃশ্য দেখিয়া যে হাসিতে পারে হাসুক, আমরা কিন্তু হাসিতে পারি না, কাঁদিয়া ফেলি। হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ'— গভীর বিষাদময় করুণরসের কবিতা। রসরাজ অমৃতলালের হাতে পড়িয়া এই কবিতা—

আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে।
জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
জঠর-মাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে।

বিকৃত হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গে পবিণত হইয়াছে। পড়িলে হাসি পায় না, দুঃখ হয়। রবীন্দ্রনাথের সেই মধুর কীর্তন—

এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিবে এস।
আমাব ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে ফিরে এস।
ওহে নিঠুর ফিরে এস, আমার করুণ-কোমল এস,
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্ত সুন্দর ফিরে এস।—

দ্বিজেন্দ্রলালের হস্তে কিরূপ নির্যাতিত হইযাছে দেখুন—

এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরন এসো হে,
ওহে দন্তমানিক এসো হে;
এসো সরিষার-তৈল-স্নিগ্ধকান্তি, পমেটম চুলে এসো হে।
ওহে লম্পটবর এসো হে,
ওহে বঙ্কেশ্বর এসো হে;
ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে···
ওহে অঞ্চল-দড়ি-বন্ধন গোরু, গোয়ালেতে ফিরে এসো হে।

আপনাদের হাসিতে ইচ্ছা হয় হাসিতে পারেন, আমরা অরসিক, ইহার রসিকতা পরিপাক করিতে পারিলাম না। দুঃখ কিছু নাই, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'জন্মভূমি'র বিচিত্র প্যারডি শুনিয়া গিয়াছেন—'আমি এই আপিসে চাকরিটি যেন বজায়

রেখে মরি!' দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার রহস্য 'পরিপাক' করিতে পারিয়াছিলেন, কিংবা ইহার মিষ্টরস অম্ল হইয়া বমন হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এইবার কবিশেখরের কীর্তি দেখুন। ভগবৎকৃপা-বিশ্বাসী ভক্ত রজনীকান্তের সেই সর্বজনপ্রিয় সংগীত—

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে, না হয় মরণে!
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে না লবে গো,
হয়ে, পথের ধুলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে, পারে বসে, 'পার করো' বলে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে?...

কবিশেখর কালিদাসের কলানৈপুণ্যে লাঞ্ছিত হইয়া কি বিকট বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে—

কেন বঞ্চিত হব ভোজনে,
মোরা কত আশা করে, নিজ বাসা ছেড়ে,
খেতে এসেছি এখানে ক-জনে।
ওগো তাই যদি নাহি হবে গো,
এত কি গরজ বাড়িতে তোমার
ছুটিয়া এসেছি কবে গো?
হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে দেখিব কি খাওয়া বন্ধ?
তবে 'তাড়াতাড়ি পাত করো' বলে ডাকো
তব আত্মীয়-স্বজনে।...

রজনীকান্তের 'দীন ভক্ত' এই ভাবে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। আমরা কবিশেখর মহাশয়কে মহাকবি কালিদাসের প্রতি কর্ণাট-রাজপ্রিয়ার সেই সর্বজনবিদিত উক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

রহস্যবিদ্ রবীন্দ্রনাথ কখনো প্যারডি রচনা করেন নাই। ইচ্ছা করিলে একটা

কেন, তিনি শতসহস্র প্যারডি লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে রসের সৃষ্টি হয় না, রসেব সংহার হয়, তাই তিনি এই রচনায় কখনো হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর রজনীকান্ত— তিনিও 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অবলম্বন করিয়াছিলেন—. কখনো কোনও পদ্যকে বিকৃত করিয়া, তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া, তাহার রুধির-পানে অট্টহাস্য করেন নাই। ইহাই তাঁহার হাস্যকাব্যের সংযম। তিনি যে প্রকৃত রসজ্ঞ ও রসবিদ্ ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি।

রজনীকান্তের হাস্যরসের বিশদভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে, হাস্যরস বা ব্যঙ্গ ও রঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত রোজনামচা ইহাতে উদ্ধৃত করিতেছি;

…'that splendid sort of comic with an exceptionally serious vein like the ফল্গুনদী ; comic element is not altogether useless in this world, provided it is covertly instructive'.

'বাণী', 'কল্যাণী', 'বিশ্রাম' এবং 'অভয়া'তে রজনীকান্ত বহুতর হাসির গান ও কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কবিতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম শ্রেণীর কথা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিতেছি— সেই হাসির সহিত উপদেশমিশ্রিত গান। রজনীকান্তের তত্ত্ব- ও বৈরাগ্য-সংগীত-সমূহে এইরূপ হাসির সহিত উপদেশের সুন্দর সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। অবশ্য রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কাঙাল হরিনাথ প্রভৃতি অনেকে ঐ প্রকার সংগীত রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রজনীকান্ত-কৃত এইরূপ হাসির গানের তীব্রতা অধিকতর বলিয়া অনুমিত হয়, অথচ তিনি কখনো গুরুর আসনে উপবেশন করিয়া পাঠককে গুরুগম্ভীর বচনে উপদেশ দেন নাই, উপদেশ যাহা দিয়াছেন তাহা পাঠকের উপদেশ বলিয়াই বোধ হয় না— এমনিই ঠারেঠোরে, এমনই মুনশিয়ানার সহিত তিনি সংগীতগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা দুই-চারি স্থল উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শেষ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কবি বলিতেছেন—

মল-মূত্রে, কফে, জড়ে' পড়ে রবে
এই সোনার শরীর পরিপুষ্ট।
'ধনে প্রাণে বিনাশ করে গেলে' বলে
কাঁদবেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ ;
আর, আমরণ বৈধব্যের ক্লেশ ভেবে পত্নী
কাঁদবেন পার্শ্ব-উপবিষ্ট।

পণ্ডিতেরা বলবেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করাও,
একটু বক্তু হয়েছিল দুষ্ট ;
একটা গাভী এনে ত্বরা করাও বৈতরণী,
বাঁচা-মরা সব অদৃষ্ট।'

এই সংগীত শুনিলে প্রকৃতই মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয। বাস্তবিকই মনে হয়, আমি গেলে পত্নী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিবেন— 'আমার এমন দশা কেন করে গেলে গো', পুত্র কাঁদিবেন, 'ধনেপ্রাণে বিনাশ করে গেলে'। সকলেই তো তাহার নিজের নিজের অবস্থা ভাবিয়া শোক করিবে, আমার জন্য তো কেহ শোক করিবে না। ব্রাহ্মণপণ্ডিত আমার মৃত্যুতে সন্তপ্ত না হইযা, নিজের প্রাপ্য, নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝি ফসকাইয়া যায এই ভাবিয়া তাডাতাডি প্রায়শ্চিত্ত করাইবার ব্যবস্থা দিবেন। এই তো সংসাবের অবস্থা। কবি স্বল্প ভাষায, অল্প কথায় শেষ দিনের ছবি চক্ষের সম্মুখে ধবিয়াছেন, কিন্তু ঐ কয় ছত্রই যথেষ্ট, ঐ কয় ছত্রেই সকল কথা পবিস্ফুট হইযাছে , ভণ্ডামির উপব, স্বার্থপরতার উপর বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে, পাঠক হাসিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন।

কবি কিন্তু পরক্ষণেই আবার 'পরিণাম' চিন্তা করিতে পরামর্শ দিলেন, সেই যখন—

বসবে ঘিরে মাগ-ছেলে ,
বলবে, 'বলে যাও গো, কোন্ সিন্দুকে কি বেখে গেলে,
শুনবি 'টাকা', কানে কেউ দিবে না তারকব্রহ্ম বাণী রে।

সেই এক কথা— টাকা, টাকা, টাকা। তুমি মর তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু কোথায় কি রেখে গেলে তা বলে যাও! কবি বলিতেছেন, ইহাতেও কি তোমার চৈতন্য হবে না? চৈতন্য একটু হইল বই কি—আধুনিক শিক্ষিত কবি রজনীকান্তও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। ঐ কথাটা লিখিতে গিয়া তাঁহার লেখনী কাঁপিয়া উঠিল না? কি আশ্চর্য! বজনীকান্ত কি জানিতেন না যে, এখন 'মা' কথাটাও ঘোরতর অশ্লীল হইয়া পডিয়াছে, ও কথাটা তো মুখে আনাই যায় না, তিনি লিখিলেন কি করিয়া? শিক্ষিত নব্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, কদিন তাঁহাকে দেখেন নাই কেন? তিনি উত্তরে বলিবেন— 'কি করে আসি বলুন— আমার মাদারের আর সিস্টারের ভারি অসুখ।'

তাহার পর 'ভিজে বেড়ালের ছানা, ভালোমানুষ-মুখে' লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

আছ তো বেশ মনের সুখে !
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে।
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আনলে টাকা গাড়ি গাড়ি
প্রেয়সীর গয়না-শাড়ি হল, গেল লেঠা চুকে !
... ...
সবই টের পাবে দাদা, সে রাখছে বেবাক টুকে ;
... ...
এর মজা বুঝবে সেদিন, যেদিন যাবে শিঙে ফুঁকে।

এই পদ্য পাঠ করিলে পাপীর মন, ভণ্ডের মন বিচলিত হয় না কি ? তাহার বুকের ভিতর গুরু গুরু করিয়া উঠে না কি ? ভণ্ডকে ভণ্ড বলিলে, চোরকে চোর বলিলে, তাহাদের রাগ হয় বটে কিন্তু বলিবার মতো করিয়া বলিলে, মিষ্ট কথায় বলিলে, মোলায়েম করিযা বলিলে সে গোলাম হইয়া যায়, নিজের চরিত্র সংশোধন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়। রজনীকান্ত যখন চোরকে চোর বলিয়াছেন, ভণ্ডকে ভণ্ড বলিয়াছেন, আত্মগর্বীকে হামবড়াই বলিয়াছেন, তখন এইরূপই মিষ্টমুখে মোলায়েম করিয়া বলিয়াছেন। অঙ্কশায়িনীর সহোদরকেও চোখ রাঙাইয়া 'দূর শালা' বলিলে সে-ও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঘুষি পাকাইয়া 'দূর শালা' বলে, অথবা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে— এ কথাটা রজনীকান্ত ভালোরূপই জানিতেন ও বুঝিতেন ; তাই শ্যালককে শাসাইতে হইলেও তিনি যেন মিষ্টমুখে বলিতেন, 'ওহে সম্বন্ধি, বলি ও বড়কুটুম, বলি ও দাদা ! রোজ রোজ এত রাত করে বাড়ি ফের কেন ? ওটা ভালো নয়।'— এই ভাব। এই ভাবে কথা বলিলে, এইরূপ উপদেশ দিলে, তবে সে উপদেশে ফল হয়। রজনীকান্তের উপদেশ সর্বত্রই এইরূপ, তাই সেগুলি ফলপ্রদ ও চিত্তরঞ্জক।

'হবে, হলে কায়া বদল' গানে সমাজের ভালোমন্দ, আলো-আঁধার, স্বর্গ-নরক — দুইদিক দেখাইয়া কবি ভণ্ডের সম্মুখে দুইখানি ছবি পাশাপাশি ধরিয়াছেন ; তাহাতেও যদি ভণ্ডের চক্ষু ফুটে।

যে-পথে বিষয়ত্যাগী, প্রেম বিরাগী আসছে কাঁধে
ফেলে কম্বল !
সেই পথে টেড়ি কেটে, চেন ঝুলিয়ে যাচ্ছে হাতে
মদের বোতল !

ওরে, গীতাপাঠের সভায় কার কি করবে চুরি
ভাবছ কেবল,
কান্ত কয়, আর বোলো না, আর হল না, হবে হলে
কায়া-বদল।

তাহার পর রজনীকান্ত সাধনার ধনকে অন্বেষণ করিবার পন্থা নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

সে কি তোমার মতো, আমার মতো, রামার মতো, শ্যামার মতো,
ডালা কুলো ধামার মতো— যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে ?

সে কিরে মন, মুড়কি মুড়ি— মণ্ডা জিলাপি কচুরি,
যে, তাম্রখণ্ডে খরিদ হয়ে উদরস্থ হয়ে যাবে ?

মন নিয়ে আয় কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ' তার অন্বেষণে,
প্রেমনয়নে সংগোপনে দেখবে, যেমন দেখতে চাবে।

হাসিতে হাসিতে এবং হাসাইতে হাসাইতে, সোজা কথায় এবং সোজা ভাষায় এমন গুরুগম্ভীর উপদেশ, সাধনার ধন লাভ করিবার জন্য আকুল হইয়া ব্যাকুল হইবার এরূপ ইঙ্গিত আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এইরূপ অনেক গানে রজনীকান্ত হাস্যরসের সহিত শান্তরস মিশাইয়া দিয়াছেন। এই সকল গানের মধ্য দিয়া সত্যই শান্তরসের বিমল, স্নিগ্ধ, শীতল স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো ধীরে ধীরে চিরদিন প্রবাহিত হইতেছে।

এইবার রজনীকান্তের সমাজ-সম্পর্কীয় হাসির গান এবং বিশুদ্ধ আমোদের জন্য হাসির গানের কথা বলিব।

রজনীকান্তের রোজনামচা হইতে আর-একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি 'আমার একটা চেষ্টা ছিল যে, poetry আর গানে সব class of reader-দের মনস্তুষ্টি করব। এইজন্য average reader-দের জন্য serio-comic করেছিলাম, একটু higher circle-এর জন্য serious করেছিলাম, আর-একটু বিশুদ্ধ আমোদের জন্য comic করেছিলাম।

এই শেষোক্ত রঙ্গ-সংগীত বা Comic songs-কে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করিয়া বুঝিতে চাই। কতকগুলিতে কেবল হাসির জন্য— বিশুদ্ধ আমোদের জন্য হাসাইবার চেষ্টা। অন্য সকলগুলিতে দেশের, সমাজের এবং সমাজের অন্তর্গত

ব্যক্তিবর্গের ত্রুটিবিচ্যুতি, গ্লানি-ভণ্ডামি, হামবড়াই, মেকি-ঝুটা, জাল-জুয়াচুরি প্রভৃতি ছোটো-বড়ো সকল প্রকার ব্যভিচার ও কদাচারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ-পূর্বক সেই সকল দোষের প্রতি সমাজবাসী, তথা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রঙ্গ ও রসিকতা এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিবার চেষ্টা, সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়াস। এই প্রয়াস যে সফল ও সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিতেই হইবে।

রজনীকান্তের হাসির গানের বিশেষত্ব, তিনি কখনো কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ করেন নাই, বিদ্বেষভাবে ভরা কোনও গান বা কবিতা লেখেন নাই, তীব্র কশাঘাত করিয়া কাহাকেও কাঁদাইয়া আনন্দ উপভোগ করেন নাই। বরং শাসন করিবার জন্য, সৎপথে আনিবার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিতে গিয়া তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিতে গিয়া, কান মলিয়া দিতে গিয়া, নিজেই অনেক স্থলে কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। এ কিসের ক্রন্দন জানেন? কোনও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিয়াছেন, এ যেন 'বুক ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরম বেদনা!' কোনও সমালোচক কমলাকান্তের ভাবে বলিয়াছেন, এ যেন 'হাসির ছলনা করে কাঁদি!' আমরা কিন্তু এই কান্নাকে একটু অন্য ভাবে দেখি। মাতা হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সন্তান একান্ত নিরিবিলিতে গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম দ্রব্যসম্ভার নষ্ট করিয়াছে, অপচয় করিয়াছে, আর্শি ভাঙ্গিয়াছে, সেটার কাচগুলা ভাঙাচুরা হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিন্দুর-কৌটা খুলিয়া খানিকটা সিন্দুর চারিদিকে ছড়াইয়াছে, আর খানিকটা 'আপনার নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিয়াছে, বিছানার উপর দোয়াত উপুড় করিয়া দিয়াছে, শাদা চাদর কালিতে ভাসিতেছে, খানিকটা কালি হাতে ও মুখে মাখিয়াছে, আর তাহার পূজা করিবার গরদের শাড়িখানিতে কালিঝুলি মাখাইয়া নিজের মাথায় বাঁধিয়া, এক বিচিত্র বীভৎস সঙ সাজিয়া দুলালচাঁদ হাসিমুখে একখানা কেদারায় বসিয়া আছেন—চাঁদের মুখে হাসি আর ধরে না! এই কিম্ভূতকিমাকার জীবটিকে দেখিয়া মা কি করিলেন? চাঁদের সেই অবস্থা, সেই হাব-ভাব, রকম-সকম দেখিয়া তিনিও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না বটে কিন্তু পরক্ষণেই 'ও আমার পোড়া কপাল, এ সব কি হয়েছে রে বাঁদর'— বলিয়াই সজোরে সোনার চাঁদের গোলাপি গণ্ডে চপেটাঘাত। কিন্তু সে আঘাত চাঁদের গালে যত না বাজিল, তাহার শতগুণ বাজিল মায়ের প্রাণে, মায়ের বুকে। দুষ্ট ছেলেকে শাসন না করিয়াও মা থাকিতে পারেন না, আবার শাসন করিতে গেলে, মারিতে গেলে, সে ঘা নিজেরই বুকে বাজে। এই আমাদের বাঙালি মা! তাই

চপেটাঘাত খাইয়া দুলালচাঁদও যেই ভ্যাঁ করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতারও চক্ষু হইতে অলক্ষিতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তারপর ছেলেও যত কাঁদে, আর ছেলেকে কোলে লইয়া গণেশ-জননীও তত কাঁদেন। রজনীকান্ত যখন কাঁদিয়া ফেলেন, এইভাবেই কাঁদিয়া ফেলেন। তাঁহার প্রাণটি যে বাঙালি মায়ের মতোই কোমল ও সবল ছিল।

সমাজের সকল খুঁটিনাটি এবং সামাজিক সকল প্রকার ব্যক্তিগণের ভণ্ডামি, জ্যাঠামি ও গ্লানি— কিছুই রজনীকান্তের তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিলাতি হাওয়ার গুণে অকালপক্ব, অজাতশ্মশ্রু জ্যাঠা ছেলে, সহুরে সভ্যতা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য যুবক, পল্লীগ্রামের বর্ণশুদ্ধিবিহীন বুড়ো বাপ, বিবাহে পণগ্রহণ, বালিকা বিধবার নির্জলা একাদশী, বুড়ো বরকে গৌরীদান, অখাদ্য-ভোজন প্রভৃতি ম্লেচ্ছাচার এবং দুর্গোৎসবে অশুদ্ধ মন্ত্র, বিলাতি কাপড় ও তেলেভাজা লুচি পর্যন্ত যাবতীয় সামাজিক ছোটো-বড়ো আচার, ব্যবহার ও অনুষ্ঠান এবং ডাক্তার-মোক্তার, হাকিম-উকিল, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, পুলিশ-প্রহরী, কবি-বৈজ্ঞানিক, কেরানি-নব্যনারী প্রভৃতি সমুদয় সামাজিক ব্যক্তিগণের ভিতরে যেখানে যেটুকু ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়াছেন, সেইখানেই রজনীকান্ত খড়্গহস্ত, যেন মারমুখী।

পতিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অনেক কবিই যথেষ্ট আক্ষেপ করিয়াছেন। বাস্তবিকই—

যবে গণ্ডুষে সাগর জল করিলাম পান,
যবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগরসন্তান,
যবে দ্বিজ-পদাঘাত-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হতেন শ্রীহরি।

তাঁহাদের অধঃপতন দেখিলে অতিবড় পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হয়, কোমলপ্রাণ কবির তো কথাই নাই। তাই গুপ্তকবি ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

কেবল মুখেতে জাঁক, ভিতরে সকলি ফাঁক
মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে।
ফেঁদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল,
গোলেমালে হরিবোল পাড়ে॥

... ...

কালী কালী মুখে ডাকি, যতদিন বেঁচে থাকি—
আশীর্বাদ করিব তোমায়।

কোরো এই উপকার, যেন কটা পরিবার
অন্ন বিনা মারা নাহি যায়॥

গুপ্তকবি কখন তাঁহাদিগকে 'মণ্ডালোষা দধিচোষা' বলিতেছেন, কখন 'নস্তলোসা' বলিযা ঠাট্টা করিতেছেন, আবার কখনো বা 'কোষাভরা গোঁসাভরা' বলিয়া ইয়াবকি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের লইযা ইযাবকিই ঈশ্বরগুপ্তে অধিক। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন—

শাস্ত্রীবর্গ কোনোই শাস্ত্রের ধারেন না এক বর্ণ ধার।
... .
তোমবা বিপ্র হয়ে ভৃত্যকার্য করে বাড়ি ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি করে শুধু বাখবে সমাজটিরে ?
—তা সে হবে কেন!

তাহার পব টিকির উপব তাঁহার আরও আক্রমণ দেখুন—

আহা! কি মধুর টিকি আর্য ঋষি কি
(এই) বানিয়েছিলেনই কল গো!
সে যে আপনাব ঘাড়ে আপনিই বাড়ে
(অথচ) চতুর্বর্গ ফল গো।
আহা এমন কম্র এমন নম্র
(আছে) গোপনে পিছনে ঝুলিযে,
অথচ সে-সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজমি গুলি এ!

এইবার রজনীকান্ত কি লিখিয়াছেন শুনুন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সর্বস্ব হারাইয়াছেন, কিন্তু নিজের জাত্যভিমান, নিজের অহংকার হারাইতে না পারিয়া বরং তাহার মাত্রা বাডাইয়া দিয়াছেন। কথাটা সত্য বটে। তাই 'পতিত ব্রাহ্মণ' বলিতেছেন—

আমরা ব্রাহ্মণ বলে নোয়ায় না মাথা কে আছে এমন হিন্দু ?
আমাদেরই কোনও পূর্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
গিরিগোবর্ধন ধরেছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংসে,
তার বক্ষে যে লাথি মারে, সে যে জন্মেছিল এ বংশে।
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে,
তোমরা মোদের সম্মান করিবে— সে কথা আবার কইতে ?

ইত্যাদি ক্রমাগত অতীতের বাজে বড়াই, আর সঙ্গে সঙ্গে অহংকার ও দর্প। তাহার পর তাঁহারা নরক হইতে দু-হাত তুলিয়া স্বর্গের সিঁড়ি দেখান, চটির দোকান করেন, হাতা ও বেড়ি ঠেলেন, কিন্তু 'টিকিটি সুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা'। তাঁহারা মদটা আসটা খান, খানাতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা সন্ধ্যা ও গায়ত্রী এবং জপতপ, ধ্যানধারণা— সকলই ভুলিয়াছেন, '(কিন্তু) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে ? সোজা কথাটা বুঝিতে পার না ?' আবার—

আমরা হচ্ছি জেতের কর্তা, আমাদের জাত নিবে কে ?
(এই) স্বার্থের পাকা বেদির উপরে গলা টিপে মারি বিবেকে।
বাবা, এখনো ঝুলছে ব্রহ্মণ্য-তেজের Leyden jar-এ পৈতে,
তোমরা মোদের সম্মান করিবে— সে কথা আবার কইতে ?

এতদ্‌ভিন্ন যখন যে পদ্য বা গানের ভিতর সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই রজনীকান্ত এই ভণ্ড ব্রাহ্মণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন—

বাবা দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
'মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ' অবধি
পʼড়ে আসিয়াছি চলে।
...
মা-সকল বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি ?
এই কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পানতোয়া ঠুকি।

তাহার পর কান্ত টিকির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন। এই টিকিও কান্তের হাতে বা ভণ্ডের কাছে 'হজমি গুলি'। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই হজমি গুলির প্রথম আমদানি করেন দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত কেবল বিজ্ঞাপনের চটকে বেশি গুলি বিক্রয় করিয়াছেন মাত্র—

ফেলো না পৈতে, কেটো না টিকিটে
সর্ব বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে
মেলেও তো ন্যাকা বুঝিয়ে।

রজনীকান্ত ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী, মন্ত্রবিশ্বাসী, একটু অধিক মাত্রায় গোঁড়া হিন্দু।

তাই অশুদ্ধ মন্ত্র, অশুদ্ধ শাস্ত্রপাঠ তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না; মনে করিতেন, এইসব অনধীতশাস্ত্র, মূর্খ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম সকলই পণ্ড হইতেছে। তাই তাঁহাকে অতি দুঃখের সহিত লিখিতে দেখি—

কোন্ পূজকের মুখে মন্ত্র, মন রয়েছে লুচির থালে—
আব কিছু বলুক না-বলুক, 'ভ্যো নমঃ'টা বললেই চলে।
... .
'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে, সেই দশকর্মান্বিত।
..
অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূর্খ পূজক,
পুরুত সঙ্গে টিকি এল, বিশুদ্ধাচার-সূচক।
রেশমি নামাবলী এল— নিষ্ঠাবত্তাব সাক্ষী,
'ইদং ধুপ'— এবংপ্রকাব এল শুদ্ধ বাক্যি।
... .
ঐ 'সিন্দূবশোভাকরং'
আর 'কাশ্যপেয় দিবাকরং'—
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়াযে,
বলি, 'দক্ষিণাবাক্য করং।'

লক্ষ্মীব এই স্তোত্র পডিযা আমাদেব সরস্বতীর স্তব মনে পড়ে— 'বিদ্যাস্থানে ভ্যএ বচ'[১]— আর হাসিতে গিয়া কান্তেব মতো কাঁদিয়া ফেলি। ভণ্ডামিতে ক্রমেই দেশ ভরিয়া উঠিতেছে, ধর্মের নামে ঘোরতর অধর্ম চলিতেছে, পূজার্চনা পর্যন্ত ভণ্ডামিতে পবিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই কান্তের সহিত বলিতে ইচ্ছা করে—

কান্ত বলে, শোন মা তাবা। আসছে বছর আবাব এলে,
নাও যদি মারিস প্রাণে— এই অসুরগুলো পুরিস জেলে।

আবার যখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রায়বাহাদুর রামমোহনের কাছে গলাধাক্কা খাইয়া—

ঐ মধুময় ধমকানি খেয়ে পাছে হয় তার জোলাপ,
থতমত খেয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া বাঁচে ব্রাহ্মণ,

তখন এই রজনীকান্তই রায়বাহাদুরের প্রতি রোষরক্তিম নয়নে বজ্রদৃষ্টিপাত করিলেন, গর্জন করিয়া ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিলেন—

১ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ

সে যে তোমা হতে কত মিতাচারী, সংযমী সে যে কতটা,
সে যে তোমা হতে তত বোকা নয়, তুমি মনে কর যতটা,
বিলাসিতা তারে মজায় নি, কত সামান্য অভাব,
একটি পয়সা দাও না তাহারে, তুমি তো মস্ত নবাব।
কথাটি বলিলে খেঁকি মেরে ওঠে, যেন এক খ্যাপা কুকুর,
'দোসরা জায়গা দেখে নাও হেথা কিছু হবে না ঠাকুর।'

এই সঙ্গে গুপ্তকবির নিম্নলিখিত চারি ছত্র পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—

যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসি ধরে ওঠেন তবে।
বলে, 'গতর আছে— খেটে খে গে,
তোর পেটের ভার কেটা ব'বে?'

যাহার যেটুকু ভালো, তাহার প্রতিও রজনীকান্ত অন্ধ ছিলেন না। তিনি গুণের গৌরব করিতে জানিতেন।

চাকুরিজীবী বাঙালির কেরানি জীবন দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত উভয়েই চিত্রিত করিয়াছেন, গানে নহে, কবিতায়। কান্তের 'কেরানি-জীবন' ব্রিটিশ-রাজের অদ্ভুত সৃষ্টি কেরানি-জীবনের নিখুঁত ছবি— অবিকল ফটো. দীর্ঘ পদ্যে কেরানির দৈনিক জীবনযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত তিনি নিপুণ হস্তে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঠাট্টাবিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ-রঙ্গ বেশি নাই। কেরানির জীবনটাই যে রঙ্গময়! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্যে মাঝে মাঝে বেশ ব্যঙ্গ আছে, সমাজের উপর ঘা আছে।—

…আর না খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটি আইবুড়ো মেয়ে,
বেছে বুড়ো বরে
ভালো কুলীন ঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও বিষম কষ্ট করে,
স্ত্রী হলেন গতাসু, কি করি? শোকতপ্ত অমনি—
আমি কল্লাম বিয়ে একটি ন-বর্ষীয়া রমণী।

রজনীকান্তের 'কেরানি-জীবন'-এর শেষ চারি ছত্রের মধ্যে যে শ্লেষ ও দ্যোতনা আছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

এত গিরি তুমি চূর্ণ করেছ,
কেরানি'গিরি'টে রাখিবে?

হে বিধি! তোমার শক্তির সুযশে
কলঙ্কের কালি মাখিবে?

যাঁহারা বিজ্ঞানের ক-খ পড়িয়া বৈজ্ঞানিক, দুই পাতা গ্যানো পড়িয়া বিজ্ঞানী, আর দেড় পাতা বস্কো পড়িয়া দার্শনিক— সেই ইংরাজি-শিক্ষিত আধুনিক নব্য যুবকেরা, যাঁহারা কথায় কথায় 'কেন' জিজ্ঞাসা করেন, নিজে যাহা বুঝেন তাহাই ঠিক, বাকি সব ভুয়া বলিয়া মনে করেন, যেটা তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারেন না সেটা পুরামাত্রায় গাঁজাখুরি— এইরূপ যাঁহাদের শিক্ষা, বিশ্বাস ও ধারণা, সেই সকল লোকের উপর রজনীকান্ত বেজায় চটা। তাঁহারা যেন তাঁহার চক্ষুঃশূল—

ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে
দেখব সে উপাধি নিলে
কটা 'কেন'র জবাব শিখে।

কোকিল কেন কুহু বলে,
জোনাকিটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে
কেন ফুটায় কুসুমটিকে?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে,
চাতক কেন বৃষ্টি মাগে,
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
কমল কেন চায় রবিকে?
... ...
গোটাদুই ভেদ বুঝে তুই গর্বে অধীর
বৈজ্ঞানিক বীর।
... ...
কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ,
'গ্যানো' খুলে পড়ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ'
মাপছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচছে।
... ...

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধরে,
বাইরের আঁখি দুটো ফুটোচ্ছি বেশ করে ;
মনশ্চক্ষু অন্ধ, তার খবর কে করে ?
সে বেচারি আঁধারে ঘুরছে।

… …

তোর ভারি পক্ক মাথা
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
করেছিস প্রশস্ত !

… …

দুদিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস তো অশ্বডিম্ব ;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ !

… …

বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ !
বীর কি বীভৎস, হাস্য কি করুণ ;
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুন',
তর্কে পঞ্চানন, এয়ার্কিতে জ্যাঠা !

দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত উভয়েই 'ডেপুটি'র চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ডেপুটি-কাহিনী দীর্ঘ পদ্য হইলেও ডেপুটির চরিত্র চিত্রিত হয় নাই, যে-সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিই আধুনিক যে-কোনও হাকিম বা উচ্চ কর্মচারীর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য, পদ্যের নাম ডেপুটি-কাহিনীর পরিবর্তে 'হাকিম' বা 'হুজুর' হইলেও কোনও ক্ষতি হইত না, ডেপুটির চরিত্রের বিশেষত্ব ইহাতে আদৌ ফুটে নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং ডেপুটি ছিলেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের—

…অষ্টমাস পর্যটন,
দুর্ভিক্ষ কোথায় কিছু নাই ;
উপরে রিপোর্ট গেল— বলিহারি যাই !

এই তিন ছত্র এবং রজনীকান্তের—

খালাসটা বেশি হলে
উঠেন কর্তাটি ভারি জ্বলে ?
আর শাস্তি ভিন্ন promotion নাই,
কানে কানে দেন বলে।

এই চারি ছত্র পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি। রজনীকান্তের 'ডেপুটি' উৎকট ঝালে ভরা, আস্বাদনে চোখ দিয়া জল বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল ডেপুটিগিরি করিয়াও কড়া হাকিম হইতে পারেন নাই, রজনীকান্ত অল্প কয়েক-বৎসর ওকালতি করিয়াই জবর উকিল সাজিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, প্রথম প্রথম ওকালতিতে ভালো পসার জমাইতে পারেন নাই বলিয়া রজনীকান্ত গাত্র-জ্বালায় ঐরূপ তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক গান রচনা করিয়াছেন। আমরা ইহা স্বীকার করি না। ওকালতির উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল, মনুষ্যত্বহীন না হইলে ভালো উকিল হওয়া যায় না। রোজনামচা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—'কত লোককে যে ঠকিয়ে ওকালতিতে পয়সা নিয়েছি, তা কেমন করে লিখি ? তা আমিই জানি, আর জানেন ওই ভগবান, মাগ-ছেলে পর্যন্ত জানে না। 'একে অনর্থক ওকালতি পড়াচ্ছেন। ওকালতি করতে পারবে না। ওর প্রাণ আছে উজ্জ্বল, আর ও তেজস্বী। ও কি ওকালতি করতে পারে?' তাই রজনীকান্ত অত্যন্ত জোরের সহিত লিখিয়াছেন—

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত public movement-এ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing,
(which) we sell to the highest bidder.

এইবার মোক্তারের পালা—

পরি চাপকান-তলে ধুতি,
যেন যাত্রার বৃন্দে দূতী।
দুটো ইংরেজি কথাও জানি,
শুধু ভুলেছি grammar-খানি—
এই 'I goes' 'he come' 'they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।

তাহার পরেই রজনীকান্ত ডাক্তারকে লইয়া টানাটানি করিয়াছেন।

Medical certificate-এর জন্যে
এলে ধনী কেহ,
ঐ জলপানি কিঞ্চিৎ হাতিযে, বলে দেই—
'অতি রুগ্ন দেহ,
আমার চিকিৎসার নীচে আছেন,
জানি নে মরেন কিম্বা বাঁচেন।
এর ব্যারাম ভারি শক্ত, ইনি
হাই তোলেন আর হাঁচেন,
আর কষ্ট হলেই কাঁদেন, আর
আহ্লাদ হলেই নাচেন।'

ইহার উপরে কোনরূপ টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। ট্রাভেলিং বিল আর মেডিকেল সার্টিফিকেট না থাকিলে ইংরাজ রাজত্বে অনেক গরিব কেরানির অন্ন মারা যাইত এবং অনেক মোটা মাহিনার চাকুরের নবাবি করা চলিত না, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই দুইটি জিনিসই ইংরাজ-রাজের অশেষ অনুকম্পার ফল, আর উভয় জিনিসেই সত্যের মর্যাদা জলজ্বল করিতেছে।

অন্তঃপুর মধ্যেও রজনীকান্তের গতিবিধি ছিল, তবে সে 'নব্যা নারী'র কক্ষেই বেশি, গিন্নির রান্নাঘরে একটু উঁকি মারিয়াছেন এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করিয়া তাঁহার মাথায় 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' করিয়াছেন। আর একবার সখার কনেবউয়ের সঙ্গে পরিহাস করিয়াছেন। কিন্তু নব্যা নারীর নিকটে কান্ত যেন কেমন জড়সড়, তাঁহাদের দুই কথা শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু অতি ভয়ে ভয়ে, তাঁহারা যে, 'রাগিয়া মলিতে মোদের কর্ণ' বেশ পটু। গিন্নির আগুন ছুঁলেই গোল, তাই—

খেয়ে বামুনের রান্না, ভাই আমার আসে কান্না,
তবু পাকঘরে যান না, গিন্নির আগুন ছুঁলেই গোল।
(আবার) ডালের সঙ্গে জল মেশে না,
বেগুন-পোড়া, নিম-পটোল।
(হায় দু-বেলা)

—

স্বামী— কেমন হল পয়লা কাঁঠি, কাটাবাজু, এ চন্দ্রহার ?
(আর) হীরের সাতলহরী মালা, ঝল্‌কে নাশে অন্ধকার।
জরির বডি, পার্শি শাড়ি— বড্ড বেশি দামি এ।
স্ত্রী— (আহা) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বড্ড গেছ ঘামিয়ে।
স্বামী— এ-সব এনেছি বড় বোয়েব তবে, তোমার তবে আনি নি।
ও কি ও ? আবে, কাঁদ কেন ? ছি। রাগ কোবো না মানিনী।
তোমাব সব গহনা আছে, বড়ো বোয়েবই নাই গো।
স্ত্রী— হায কি হল। ধব গো ধব, পড়িযা বুঝি যাই গো।

এ তো বাঙালির ঘবেব প্রতিদিনেব ঘটনা। পুবাতত্ত্ববিদ্‌ও রজনীকান্তেব হাতে নাস্তানাবুদ হইযাছেন। এখন তো সকলেই ঐতিহাসিক, সকলেই পুরাতত্ত্ব-বিদ, সকলেই প্রত্নতাত্ত্বিক। সুতবাং এই সম্বন্ধে, আমবা সাহিত্যিক—আমাদেব কোনও কথা না বলাই ভালো। কবির লেখা হইতে একটু উদ্ধৃত কবিতেছি—

বাজা অশোকেব কটা ছিল হাতি,
টোডরমল্লেব কটা ছিল নাতি,
কালাপাহাডেব কটা ছিল ছাতি—
এ সব কবিযা বাহিব, বড বিদ্যে করেছি জাহির।

ক-আঙুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিডেতে ছিল কটা টিকটিকি,
গৌতমস্থত্রে রেশম-স্থত্রে প্রভেদ কি কি—
এ-সব কবিযা বাহিব, বড বিদ্যে করেছি জাহির।

তাহাব পব 'ডেঁপো ছেলে'ব উপর ভীষণ আক্রমণ, কিন্তু কোথাও একটুও অতিরঞ্জন নাই—

এখন দশ বছরেব ডেঁপো ছেলে চশমা ধরেছে,
আর টেডি নইলে চুলেব গোডায
যায় না মলয হাওযা,
আব রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না জাহুর খাওযা।
চব্বিশ ঘণ্টা চুবোট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর এক পেযালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই।

একটু চুটকি ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ,
Football ভিন্ন হাড পাকে না, হয না কষ্টসহ।
গজটেক কালো ফিতে নইলে পায না
পোডাব চোখে কান্না,
একটু পলাণ্ডুর সদগন্ধ ভিন্ন হয় না মাংস রান্না।

রজনীকান্তেব 'মৌতাত'-এব মাত্রা অতিশয চডিযা গিযাছে বটে, কিন্তু তবু প্রত্যেক পাঠককে আমবা ঐ গানটি পাঠ কবিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। এমন সুন্দব ও সুললিত হাসির গান বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। মৌতাত যখন আমাদের ভরপুব নেশা হইযাছিল, তখন প্যাবীমোহন কবিবত্নের সেই 'যাদের আঁতুড়ে-গন্ধ গাযে পাওযা যায, / (তাদের) চশমা নাকেব ডগে'— এ বডো বেজায গানটি মনে পডিযাছিল। তাহাব পব 'জাতীয উন্নতি' নামক গানেব মধ্যে আবাব নব্য যুবককে লক্ষ্য কবিযা কান্ত কি লিখিযাছেন দেখুন—

(আব) যে হেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকাবী,
প্রাণপণে জোগাই গহনা,
আর বাপ বে! তাঁর রুষ্ট আঁখি-তাপে
শুকায প্রেমনদীব মোহনা।
(সে যে) মাকে বলে 'বেটি— হেসে দেই উডিয়ে
(তাব) পিতৃবংশ নিযে আসি সব কুডিযে,
(মোদেব) চিনিযে দিতে হয়, 'এ মাসি, খুডি এ'—
ভুলে প্রণাম করি না পূজ্যে।

আর 'বরের দব' বাৎলাইবার সমযেও ববেব বাপ বলিতেছেন—

হ্যাদ্যাখো ধবি নি 'চশমা'— কেমন ভুলো মন!
ছেলে ঠুসি পেলে খুশি, একটু খাটো দবশন।

রজনীকান্ত প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার দেশহিতৈষণাব মধ্যে ভণ্ডামি ছিল না, জাল ছিল না, হুজুগ ছিল না, বাহবা লইবার আগ্রহ ছিল না। তাই তিনি ভণ্ড, মেকি দেশহিতৈষিগণের প্রতি সদাই খড়্গহস্ত, যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই তাহাদের বহিবাবরণ উন্মোচন করিয়া, মুখোশ খুলিয়া দিয়া আসল মূর্তি দেখাইয়া দিয়াছেন।

ভদ্র সেই, যার ফরসা ধুতি, ফুটফুটে যার জামা ;
দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে 'ডসনে'র বিনামা।
... ...
(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট ক্যারেক্টার দেখো না ;
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না।

তাহার পর রজনীকান্ত 'উঠে পড়ে লাগ্' গানে ভণ্ড স্বদেশী নেতাদের বুকে মিছরির ছুরি বসাইয়া দিয়াছেন—

আরো এক উপায় হতে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস'
বিলিতি যা কিছু সবি nonsense bosh—
(জোরে) লিখে বা lecture এ ক'।
কান্ত বলে, একবার জাগ তোরা জাগ্,
ভারত'মাটা'র জন্যে উঠে পড়ে লাগ্
বসে বিছানাতে ধরলে গিঁঠে বাতে ;
(দেখ না) হলি হাঁটুভাঙা দ।

তখন স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে যত বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টারই হইয়াছিলেন, আমাদের নেতা বা লীডার— সেই যাঁহারা মাকে 'মাতা' বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন অথবা ইচ্ছা করিয়া সাহেবি অনুকরণে বিকৃত বিজাতীয় স্বরে 'মাটা' বলিতেন। বাঙালি হইলে কি হয়, 'মাতা'কে 'মাটা' উচ্চারণ না করিলে যে তাঁহাদের ইন্-এর, তাঁহাদের টেম্পল-এর, তাহাদের উচ্চ শিক্ষার, তাঁহাদের সাহেবিয়ানার মুখে চুনকালি পড়ে! এই সব বাঙালি-সাহেবই হইয়াছিলেন তখন আমাদের জাতির নেতা! রবীন্দ্রনাথও ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

এঁরা সব বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি বলে গণ্য ;
কোট-পরা কায় সঁপেছেন হায়,
শুধু স্বজাতির জন্য!

কিন্তু রজনীকান্ত এত খোলাখুলি বলেন নাই, একটি মাত্র 'ভারতমাটা' শব্দে বোড়ের কিস্তিতে বাজি মাৎ করিয়াছেন। 'Brevity is the soul of wit'— স্বল্পতাই

রসের জান্। রজনীকান্ত এক বুঁদ মিছরির দানা ফেলিয়া দিয়া সমস্ত রসটাকে দানা বাঁধিয়াছেন।

পুঁথি ক্রমেই বাড়িযা উঠিতেছে, আব পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হইতেছে। কাজেই বাণী-র 'জেনে রাখ' 'বরের দর' 'বেহায়া বেহাই' ও ইহার শেষ গান 'বিদায়' আগাগোড়া পাঠ করিবার ভার পাঠকের উপর দিতে বাধ্য হইতেছি। তবে এই সুযোগে একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে— সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্যার আশুতোষ সরস্বতী মহাশযের নিকটে। অমৃতবাজারের হেমন্তকুমার 'নয়শো রূপেয়া' লিখিযা, রসরাজ অমৃতলাল 'বিবাহ-বিভ্রাট' লিখিযা, নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র 'বলিদান' লিখিযা এবং কান্তকবি রজনীকান্ত 'বরের দর' ও 'বেহায়া বেহাই' রচনা করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, সরস্বতী মহাশয় সারদা-সদনের দ্বার অবারিত উন্মুক্ত করিযা দিয়া, সারা বাঙলায় শস্তায় ডিগ্রি ছড়াইযা দিযা তাহা সুসম্পন্ন করিযাছেন—পাশ-করা বরের দর, পাশ-করা চাকুরের মাহিনার অনুপাতে যথেষ্ট কমিযা গিযাছে। তাই কত মেয়ের বাপ দুই হাত তুলিযা সরস্বতীর মহিমা গান করিতেছেন। ভবিষ্য রজনীকান্ত আর তো লিখিতে পারিবেন না—

যদি দিতেন একটি 'পাশ', তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল্ ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠল কম্পন ?

সরস্বতীর কৃপায় এখন মুড়ি-মিছরির এক দর—পাশ-করা ছেলের আর কোনও কদর নাই।

'সমাজ' শীর্ষক গানে এবং অন্যান্য নানা গানে ও কবিতার মধ্যে রজনীকান্ত আধুনিক সমাজের দুর্দশা-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিযাছেন। আমাদের কিন্তু সকলগুলি আলোচনা করিবার সময় নাই। 'সমাজ' হইতে তিনটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

তোরা ঘরের পানে তাকা,
এটা কফ-ভরা রুমালের মতো,
বাইরে একটু আতর-মাখা।

এমন সহজ, সরল, শাদাসিধা উপমা সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ। বাস্তবিকই আজকাল আমাদের সমাজের 'বাহিরে চাকন-চিকন, ভিতরে ছুঁচার কীর্তন'— এই বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে জোর-কলমে, নানা দৃষ্টান্ত দিয়া কান্তকবি বুঝাইয়া দিয়াছেন।

একটি কথাও বাজে বকেন নাই, কোনও বিষয়ই অতিরঞ্জিত করেন নাই— তিনি এই অধঃপতিত সমাজের হুবহু নকশা আঁকিয়াছেন। 'অভয়া' হইতে এই গানটি পাঠ করিবার জন্য আমরা সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। ছোটর ভিতরে, অতি সংক্ষেপে সমাজের এমন নিখুঁত ছবি বঙ্গসাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য।

এইবার যেগুলি কেবল হাসির গান— যেগুলির উদ্দেশ্য কেবল হাসানো, সেই গানগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। 'বুড়ো বাঙাল' 'বৈয়াকরণ-দম্পতির বিরহ' এবং 'ঔদরিক' এই তিনটি গান এই শ্রেণীর সংগীতের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'বুড়ো বাঙাল' ও 'ঔদরিক' যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, লোকের মুখে মুখে, গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে যেরূপ প্রসারতা পাইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল' ভিন্ন আজকালকার অন্য কোনও হাসির গানের ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। তবে নন্দলালের পিছনে খুঁটির জোর ছিল— তাহার মুরুব্বি ফোনোগ্রাফ ও গ্রামোফোন তাঁহার এই পদবৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। 'বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায, / তোমার লগে কেমতে পারুম, হৈয্যা উঠচে দায' এই গানটি এমন অনেকের মুখে শুনিয়াছি যাঁহারা জানেন না যে রজনীকান্তই ইহার রচয়িতা। 'দম্পতির বিরহ' আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলেই ভালো হয়, তাহার আগাগোড়া রসে ভরা, কেবল হাসি, বেদম হাসি, কিন্তু উপায় নাই, দুইচারি চরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

(পত্র)

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি,
যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ যোগ,
দ্বন্দ্বসমাসে হইব বন্দী।
তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়,
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়,
কবে 'স্তুতি, স্তুতঃ স্তুন্তি'র ঘুচে যাবে ভয়,
হবে বর্তমানের 'তিপ, তস্, অন্তি'!

(উত্তর)

প্রিয়ে! হয়ে আছি বিরহে হসন্ত,
শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ যোগ,
জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত!

এই শেষ দুই ছত্রের উপর টিপ্পনী করিবার উপায় নাই, 'বুঝ ভাব ভাবুক যে হও!'

মনোহরসাঁই সুরে 'ঔদরিক' গান গাহিয়া কান্তকবি 'কল্যাণী' সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা যদিও আজকাল সবাই গানে তানসেন, এই গানটি গাহিতে পারিব না, তবুও ইহার আবৃত্তি করিয়া, ইহার রসাস্বাদ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিব। হরিনাথ কাঙাল, তাঁহার পক্ষে লুচিমোণ্ডার লোভ সংবরণ করা অসাধ্যসাধন, তাঁহাকে বরং ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু বিলাত-ফেরতা ডি. এল. রায়, যাঁহারা 'স্ত্রীকে ছুরি-কাঁটা ধরান'— সেই বিলাত-ফেরতা ডি. এল. রায়েরও 'সন্দেশ' দেখিয়া মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইয়াছিল। তাই দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনমতেই ক্ষমা করিতে পারি না। কিন্তু রজনীকান্তের মতো ঔদরিক বা পেটুক আমাদের জ্ঞানে আমরা কখনও দেখি নাই। জানি না কেন, এই পেটুক গণেশটিকে তাঁহার মা আঁতুড়ে গলায় পানতোয়া দিয়া মারিয়া ফেলেন নাই, তাহা হইলে আপদ-বালাই দূর হইত। এমন পেটুক সমাজের কলঙ্ক!

প্রথমে লুচিমোণ্ডা খাইতে গিয়া কাঙালের নাকাল দেখুন—

লুচিমোণ্ডা খেয়ে মনটা তুষ্ট— কিন্তু প্রাণটা গেল,
কুঁচকি-কণ্ঠা এক হয়েছে (বাপ) বুঝি দফা ঠাণ্ডা হল।
জল রাখিবার স্থল রাখি নাই— উপায় কি বল?
উঠতে উদর ফাটে (ও বাবা) শীঘ্র আমায় ধরে তোল।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু— তাই আমার ঘটিল,
পুরি দিয়া উদর পূরি (ও বাবা) যমের পুরী দেখতে হল।

তাহার পর ডি. এল. রায়ের লালা-নিঃসরণ লক্ষ্য করুন—

উহু, সন্দেশ বুঁদেগজা মোতিচুর, রসকরা সরপুরিয়া,
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি! কত-না বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও তাহা খালি— আঃ
মদীয় বদনে ঢালিয়া—
উহু, কোথায় লাগে বা কুর্মা-কাবাব, কোথায় পোলাও-কালিয়া;
উহু, খাই তাহা হলে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
আহা, ক্ষীর যদি হত ভারত-জলধি, ছানা হত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়তো মহাশয়।
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুনগুনিয়া,

আহা, ময়রা-দোকানে মাছি হয়ে যদি— কি মজারই হত দুনিয়া ;
আহা, বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে 'মরিয়া'।
... .
ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়া ;
ওহো, মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চোখে বহে যায় দরিয়া।

এইবার 'ঔদরিকে'র উক্তি শুনুন—

যদি কুমড়োর মতো চালে ধরে র'ত
পানতোয়া শত শত ;
আর, সরষের মতো, হত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মতো।
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম না হে ,)
(গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম, বেচতাম না হে।)
যদি তালের মতন হত ছ্যানাবড়া,
ধানের মতন চষি ,
আর, তরমুজ যদি রসগোল্লা হত,
দেখে প্রাণ হত খুশি।
(আমি পাহারা দিতাম , কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম ,)
(সারারাত তামাক খেতাম, আর পাহারা দিতাম।)
যেমন, সরোবর-মাঝে, কমলের বনে
শত শত পদ্মপাতা—
তেমনি, ক্ষীরসরসীতে শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা !
(আমি নেমে যে যেতাম , গামছা পরে নেমে যে যেতাম।)
যদি, বিলিতি কুমড়ো হত লেডিকিনি
পটোলের মতো পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা বয়ে যেত, পান
করতাম দু-হাতে তুলি।
(আমি ডুবে যে যেতাম) (সেই সুধাতরঙ্গে ডুবে যে যেতাম)
(আর, বেশি কি বলব, গিন্নির কথা ভুলে ডুবে যে যেতাম ;)

সকলি তো হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম ,
শুধু এই খেদ, কান্ত আগে ম'রে যাবে,
(আর) হবে না মানবজন্ম ।

(কান্ত আব খেতে পাবে না) (মানবজন্ম আব হবে না, খেতে পাবে না,) (হযতো শিযাল কি কুকুব হবে, আব খেতে পাবে না) (ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিযে বইবে, খেতে পাবে না) (সবাই তাডাহুডো করে খেদিযে দেবে গো, খেতে পাবে না ।')

রঙ্গ করিতে গিযা রজনীকান্ত কল্যাণীব শেষে শৃগাল-কুকুরের জন্যও অশ্রুবর্ষণ করিষা গিযাছেন। পেটুক কান্ত কেবল 'নিজের পেটটা জানেন সাব' নয—শৃগাল-কুকুব তাঁহাব মতো রসনার তৃপ্তি সাধন করিযা উদব পূর্তি কবিতে পারে না বলিয়া, তিনি তাহাদেব জন্যও বেদনা অনুভব কবেন। তাই বলিতেছিলাম, কৃষ্ণনগরেব সরপুরিযা—দ্বিজেন্দ্রলালেব 'সন্দেশ' ভীমনাগের সন্দেশ হইলেও বাঙালদেশের কাঁচাগোল্লা অধিকতব উপাদেয হইযাছে। '৺ভীমচন্দ্র নাগ—তস্য ভ্রাতা' ভীমচন্দ্রেব নিকটেই সন্দেশেব পাক শিখিযা যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে 'তুযো' দিযাছেন, শিষ্যের নিকট গুরু হাবিযা গিযাছেন।

রজনীকান্তেব বোজনামচা হইতে কযেক ছত্র উদ্ধৃত কবিযা হাস্যরসের আলোচনা শেষ করিতেছি· 'প্রকৃত humour তাই, যাতে সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের weakness দেখিযে, তাব ridiculous side expose করে সাধাবণ ভাবে শিক্ষা দেয। আমি যে-সব humour-এর অবতারণা কবেছিলাম, তার একটাও নিষ্ফল বাজে লিখি নি।' এই উক্তির মধ্যে একটুও অতিবঞ্জন নাই, ইহাতে একটুও অত্যুক্তি হয় নাই। রজনীকান্ত কখনও 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাহেন নাই, তিনি কখনো আমাদেব মতো শিব গডিতে বানর গডেন নাই। তাঁহার সমগ্র হাসির গান ও কবিতার মধ্যে এমন একটিও ছত্র নাই, এমন একটিও কথা নাই, যাহা বাজে কথা, নিরর্থক প্রযোগ অথবা যাহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল বা ব্যর্থ হইযাছে। তাঁহার ব্যঙ্গ, তাঁহার রঙ্গ, তাঁহার রহস্য স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, শরতের আকাশের ন্যায় নির্মল, শিশুর হাসির মতো সুন্দব, মাতাব স্নেহেব মতো পবিত্র , ঔজ্জ্বল্যে মনের আঁধার ঘুচিয়া যায়, সুনীল, নির্মল স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়াইযা আসে, আর সুন্দর, সরল ও পবিত্র স্নেহে ও হাসিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। তাঁহার ব্যঙ্গে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই, সংকীর্ণতার সংকোচন নাই, অশ্লীলতার স্থান নাই, অনর্থক খোঁচা মারিয়া

রক্তপাতের চেষ্টা নাই, তাঁহার ব্যঙ্গে যাহা আছে তাহা খাঁটি সোনা, তাহার সবটুকু সুন্দর, মনোহর ও পবিত্র।

২

দেশাত্মবোধ

রজনীকান্ত দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, তিনি ছিলেন খাঁটি দেশভক্ত। তিনি 'হুজুগে' মাতিয়া দেশভক্ত, বৃথা আন্দোলনকারী দেশপ্রেমিক বা হাততালির প্রলোভনে ছদ্মবেশী স্বদেশী ছিলেন না। ভাবপ্রবণ কবি হইলেও তিনি ভাবের স্রোতে গা-ভাসান দিয়া হঠাৎ কবির মতো কেবল কবিত্বের উচ্ছ্বাসে এবং ভাষার উদ্দীপনায় মায়ের আবাহন করেন নাই বা দেশবাসীর মোহনিদ্রা ভাঙান নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গানের মধ্য দিয়া, সুরের ভিতর দিয়া আমাদের জাতিগত অনেক জটিল সমস্যার সমাধান তিনি করিয়া গিয়াছেন, ঘুমঘোরে অচেতন বাঙালির চেতনাকে উদবুদ্ধ করিয়া, বাঙালিকে সৎপথে চালিত করিবার উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশবাসীকে তাহার অবস্থার স্বরূপভাব বুঝাইয়া দিবার এই চেষ্টা এক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ভিন্ন আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

অন্য সকলের দেশভক্তি হইতে রজনীকান্তের দেশভক্তি বা স্বদেশপ্রাণতা একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। দেশ বলিতে, বাঙালি হইলেও, তিনি কেবল বঙ্গদেশকেই বুঝিতেন না, তিনি বুঝিতেন সমগ্র ভারতবর্ষকে। তাই প্রথমেই তিনি 'সুমঙ্গলময়ী মাকে' জাগাইয়াছেন—'ভারতকাব্যনিকুঞ্জে', বঙ্গকাব্যনিকুঞ্জে নহে, তিনি দেখিয়াছেন, 'চিরদুখশয়নবিলীনা ভারতকে', দুঃখিনী বঙ্গজননীকে নহে। তিনি কেবল সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গজননীর শ্যামল সৌন্দর্যমুগ্ধ হন নাই, তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন 'যমুনা সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত' ভারতকে দেখিয়া, যাহার কণ্ঠ—'সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,' আর যাহার কিরীট— 'ধূর্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত', যে দেশ 'রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলংকৃত' এবং 'অর্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টংকৃত'। সেই দেশের গৌরব গাথা গাহিয়া, তাহাকেই জননী-জন্মভূমি বলিয়া প্রণাম করিয়া রজনীকান্ত দেশবন্দনা করিয়াছেন।

স্বদেশী-আন্দোলনের বহুপূর্ব হইতে রজনীকান্ত কাঁদিয়াছেন— ভারতের দুঃখে।

তাহারই অতীত ও লুপ্ত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দারুণ হতাশে তাঁহার লেখনী-মুখে বাহির হইয়াছে—

আর কি ভাবতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

হিন্দু তিনি—সমগ্র হিন্দুস্থানের জন্য বহু পূর্বেই তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশী-আন্দোলনের হলহলাধ্বনি শুনিয়া, সপ্তমীপূজার বাজনা শুনিয়া তিনি মায়ের প্রতিমা দেখিতে ছুটিয়া বাহির হন নাই—বোধনের প্রথম দিন হইতেই তিনি নিভৃতে ভারতমাতার পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন, আর ধর্মবিশ্বাসী রজনীকান্ত কোনদিন ধর্মহীন দেশাত্মবোধের প্রশ্রয় দেন নাই।

কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। বাঙালি আমরা সত্য সত্যই কি কেবল বাংলা দেশ লইয়া তৃপ্ত থাকিব? বাংলার তীর্থ, বাংলার শোভা সৌন্দর্য, বাংলার কলানৈপুণ্য, বাংলার বিদ্যাবুদ্ধি, বাংলার জ্ঞানগবেষণা—মাত্র এইগুলিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিব? তাহাই কি বাঙলির উচিত? তবে বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তীর্থ—গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, দ্বারকা, অবন্তী, কাঞ্চী, প্রয়াগ, পুরী, রামেশ্বর, এ সকল তীর্থের সহিত কি বাঙালির সম্বন্ধ নাই ? তবে এই ধর্মবিপ্লবের দিনেও শত শত ধর্মপ্রাণ নরনারী ঐ সকল পবিত্র স্থানে ছুটিয়া যায় কেন ? গঙ্গোত্তরীর নয়নমনোহর গঙ্গাবতরণ, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নয়নাভিরাম শোভাসম্পদ হিমালয়ের সৌম্য-প্রশান্ত-অটল মূর্তি, লবণাম্বুর উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছ্বসিত আবেগ দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙালি এখনও ব্যাকুল কেন ? আগ্রার তাজ, অজন্তার গিরিগুম্ফ, লখনৌয়ের ইমামবারা দেখিতে আজিও বাঙালি ব্যগ্র কেন ? পার্শ্বনাথ-বুদ্ধদেব, কালিদাস-ভবভূতি, নানক-কবির—ইঁহারা কি আমাদের কেহ নহেন ? এই সকল মহাপ্রাণকে কি বাঙালি প্রাণের ভিতর আপনার বলিয়া বোধ করে না? নিশ্চয় করে—করাই কর্তব্য। তাই ভারতধর্মী রজনীকান্ত বঙ্গবিভাগের বহু-পূর্ব হইতেই ভারতের গৌরবগান গাহিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভারতের বন্দনা গাহিবার পর ভারতীর প্রিয় সন্তান রজনীকান্ত বঙ্গমাতার সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন—

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,

অমৃতবারি সিঞ্চে কোটি
তটিনী—মত্ত, খরতরঙ্গ ;
নমো নমো নমো জননী বঙ্গ !

দেশের কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে রজনীকান্তকে রোজনামচায় লিখিতে দেখি: 'আর কি সে দিন ফিরে পাব ? কি শান্তি, কি সুখ, কি প্রতিভা ! সমস্ত জগৎ অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন, যাবা সভ্য বলে আজ খ্যাত তারা তখন কাঁচা মাংস খেত। তখন বিলাস-বিমুখ, গলিত-পত্রভোজী মুনি অরণ্যের অন্ধকারময় নির্জনতা ভেদ করে বলে উঠলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ ব্রহ্ম ॥

সেদিন কি আর ফিরে আসবে ? ধর্মপ্রাণ ভারত কি ধর্ম মাথায় নিয়ে আবার জাগবে ?'

রজনীকান্ত ভারতমাতাব সৌন্দর্যের উপাসক, তাঁহাব রূপের পূজক। তিনি মায়ের দুঃখে মিয়মাণ হইয়া মায়েব লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সদাই উন্মুখ। ইহাই রজনীকান্তের দেশাত্মবোধের প্রথম পরিচয়।

রজনীকান্তের দেশভক্তির দ্বিতীয় পরিচয় স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাঙালির দুঃখদারিদ্র্য দূর করিবার, তাহার অন্নবস্ত্রসমস্যার সমাধান চেষ্টায়। এই চেষ্টায় তাঁহার বিশেষত্ব যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অপূর্ব। আত্মবিস্মৃত বাঙালির চোখে আঙুল দিয়া তিনিই বলিয়া দিলেন, 'তোরা একবার ঘরের পানে তাকা, দীনদুখিনীর ছেলে তোরা, তোরা প্রথমে তোদের মোটা ভাতকাপড়ের সংস্থানটা করিয়া নে। বিলাসের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তোরা বিপথে ছুটিয়া চলিয়াছিস বলিয়া তোদের পেটের ভাত আর পরনের কাপড় পর্যন্ত হারাইয়াছিস।'

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে একা রজনীকান্তই বিলাসোন্মত্ত বাঙালিকে সংযত হইয়া দেশের জিনিসগুলিকে আদর করিবার জন্য উপদেশ দিলেন—করজোড়ে মিনতি করিলেন। পেটের ভাত ও পরনের কাপড়—তা যতই কেন মোটা হউক না, তাহাই লইয়া বাঙালিকে নিজের পায়ের উপর ভর দিতে শিখিতে হইবে, এই কথাটা রজনীকান্ত তাঁহার সংগীতের ভিতর দিয়া নানা ভাবে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে বলিয়া দিলেন। এখন আর তাঁহার গানে ভারতমাতার অতীত গৌরবের

কীর্তন নাই, বঙ্গজননীর অপার্থিব শ্যামসৌন্দর্যের বর্ণন নাই, এখন তিনি সময়োচিত কাজের কথাগুলি একে একে তাঁহার গানের ভিতর দিয়া বাঙালির কানে ও প্রাণে ঢালিয়া দিলেন। যে-সকল কথা অবহিত চিত্তে শুনিয়া সেই মতো কাজ করিতে না পারিলে, বাঙালির অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইবে, সেই কথাগুলিই সেই সময়ে রজনীকান্ত দেশের জনসাধারণকে নানা ছন্দে শুনাইয়াছিলেন। তাহার রচিত 'সংকল্প', 'তাই ভালো', 'আমরা', ও 'তাঁতি ভাই'—এই চারিখানি গানে তিনি বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-সমস্যার অপূর্ব সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশী সংগীত-সাহিত্যের ইতিহাসে এই চারিখানি গান চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

যখন বাঙালির ধন, মান, প্রাণ, সবই যাইতে বসিয়াছিল, আপাতমধুর চাকচিক্যের মোহে যখন বাঙালি উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত, যখন বাঙালি অন্নসংস্থানের জন্য, লজ্জানিবারণের জন্য সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী তখন রজনীকান্তই তাহাকে দেখাইয়া দিলেন, এই নাও তোমাদের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'। এতদিন তোমরা মিহি বিলাতি বস্ত্র পরিধান করিয়া বিলাসী হইয়াছ, বাবু বনিয়াছ—এখন আর বাবুগিরির সময় নাই। এখন এই মায়ের দেওয়া কাপড় তোমরা মাথায় তুলিয়া লও। কি বলিতে যাইতেছ, মোটা? তা হইলই বা মোটা, ও যে মায়ের দেওয়া, তুমি যত্ন করিয়া গ্রহণ কর, ও যে তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী-জন্মভূমির আশীর্বাদনির্মাল্য—মাথায় করিয়া লও। আশার একটা অভয় বাণী বাঙালির হৃদয়কে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ করিল। রোমাঞ্চিত দেহে, ভক্তিনম্র হৃদয়ে বাঙালি বরেণ্য কবির এই মহান উপদেশ পালন করিল, প্রাণে প্রাণে বুঝিল—এ ভিন্ন আর তাহার অন্য গতি নাই—দ্বিতীয় পন্থা নাই।

শ্রোতার হৃদয়ের সুরে সুর বাঁধিতে পারিলে, সেই সুর অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সেই সুরে তাহার হৃদয় তোলপাড় করিয়া দেয়, তখন সেই মথিত-হৃদয়-মধ্য হইতে হৃদয়ের সারবস্তু, প্রাণের প্রাণ নবনীতবৎ ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে। তখন যাহা পূত, যাহা শ্রেয়, যাহা ইষ্ট, যাহা কল্যাণ ও মঙ্গল, যাহা তাহার অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র অবলম্বন, তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিবার তাহার কতই না আগ্রহ। তাই রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' বাঙালির প্রাণে প্রাণে শত ছন্দে ঝংকৃত হইয়াছিল। এই গানের মধ্যে যেমন পবিত্র আদেশ ও করুণ মিনতি নিহিত আছে, তেমনই বাংলার চিরন্তন শাকান্ন ও মোটা কাপড়ের গরিমা পরিস্ফুট রহিয়াছে, আর ইহার ভাব ও ভাষা অতি সহজ ও সরল, তাই পণ্ডিত-মূর্খ, বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী, ইতর-ভদ্র—বাংলার সকলেই

প্রাণে প্রাণে ইহার প্রকৃত মর্ম অনুভব করিল। বাঙালির প্রাণ জুড়াইল, তাহার মনের সুর মিলিল, বাংলা ভাষায় বাঙালি মনের আশা শুনিতে পাইল। খাঁটি বাংলা কথায় রজনীকান্ত বাঙালিকে তাহার ঘরের খাঁটি জিনিসটি দেখাইয়া দিলেন। স্বাদেশিকতায় রজনীকান্তের বৈশিষ্ট্য এইরূপে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিতে পরামর্শ দিয়াই কান্তকবি অন্নের সংস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিতেছেন—

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।

বাস্তবিকই মায়ের ঘরের ভাতের চাইতে, তা সে শুধু ভাতই হউক-না কেন, জগতে আর কি অধিক মিষ্ট ও মধুর খাদ্য থাকিতে পারে? আর মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব ও মার বাগানের কলাব পাত, এগুলিও যে মায়ের প্রসাদী জিনিস। এগুলির মধ্যেই তো বাঙালিব বাঙালিত্বের, বাঙালির আত্মমর্যাদার, বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার নির্যাস নিহিত রহিয়াছে। এ বিষয়ে তো তর্কবিতর্ক নাই, বাদবিসংবাদ নাই, মতদ্বৈধ নাই, এমন কি চিন্তার প্রয়োজন পর্যন্ত নাই। এ যে সর্ববাদিসম্মত সত্য। সেই জন্য কবি এই গানের নাম দিলেন, 'তাই ভালো' এবং গানের গোড়াতেই জোরে 'তাই ভালো' বলিয়া জংলা সুরে আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিও সমস্বরে 'তাই ভালো' বলিয়া কবির মতে মত দিয়াছিল।

তাহার পর কান্তকবি তাঁহার স্বদেশবাসীকে আত্মমর্যাদার মূলসূত্র 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' বাক্য দৃষ্টান্ত দ্বারা, সুরসংযোগে বুঝাইয়া বলিলেন—

ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক, সে সোনা মোদের মায়ের খেতের ধান !
সে যে মায়ের খেতের ধান।
মিহি কাপড় পরব না, আর যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পরলে কেমন সাজে ;
দেখ তো পরলে কেমন সাজে !

তখন বাঙালি বলিল আর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া 'ভিক্ষা দাও গো পরবাসি!' বলিয়া আত্মমর্যাদা নষ্ট করিব না, স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিব, আত্মনির্ভর হইব,

নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিতে শিক্ষা করিব, নতুবা জগতের সম্মুখে বাঙালি বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। আমরা এতদিন 'মহাযন্ত্রিতাড়িত জড়যন্ত্রবৎ নিয়ামকের সঙ্কল্পসাধন-জন্য পরিচালিত হইতেছিলাম। আমাদের গমনে লক্ষ্য নাই, আসনে স্থৈর্য নাই, কার্যে সংকল্প নাই, বচনে নিষ্ঠা নাই, হৃদয়ে আবেগ নাই, যোগে একপ্রাণতা নাই।' মোহমুগ্ধ আমরা বিলাস-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া নিজেদের জীবন পর্যন্ত হারাইতে বসিয়াছিলাম—তবু বিলাসকেই, এই ভোগ-স্পৃহাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান কবিতেছিলাম। তাই কবি হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্য-সভ্যতার মূলমন্ত্র, সুখ-দুঃখ-সমস্যাব চূড়ান্ত মীমাংসা, 'সর্বং পরবশং দুঃখং সর্ব-মাত্মবশং সুখম' সুরেব মধ্য দিয়া, ভাষাব ভিতর দিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

পরিশেষে স্বদেশভক্ত কবিকে, 'আমবা' কাহাবা এই প্রশ্নের বিচার করিতে দেখি। কবি বলিলেন, 'আমবা নেহাৎ গরিব', বাঙালি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল, 'ইহ বাহ্য আগে কহ আর'। কবি বলিলেন, 'আমরা নেহাৎ ছোট', বাঙালি বলিল, 'ইহ বাহ্য আগে কহ আব'। কবি কহিলেন, 'তবু আছি সাত কোটি ভাই', বাঙালি কহিল, 'ইহোত্তম আগে কহ আব'। তখন বাঙালিব কবি দুইটি ছোটো শব্দ বলিয়া উঠিলেন, 'জেগে ওঠ', আব সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিব ঘুম ভাঙিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল! তাবপব সকলে মিলিয়া মহাকোলাহলে ও কুতূহলে গাহিতে লাগিল—

> আমরা নেহাৎ গরিব, আমবা নেহাৎ ছোট—
> তবু আছি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ!

তবু সাত কোটি লোক জিজ্ঞাসা কবিল, এ আমাদেব কিসের জাগরণ? আমরা এই কোটি লোক জাগিয়া উঠিয়াছি, এখন কি করিব? কবি বলিলেন, এই কর্ম-ভূমি ভারতবর্ষে তোমাদের জন্ম। কি করিবে, তা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কাজ কর। তোমরা অভয়ার সন্তান—কাজের নামে ভয় পাও কেন? তোমাদের সম্মুখে অনন্ত কর্মক্ষেত্র পড়িয়া বহিয়াছে, কর্মযোগীর সেই বজ্রনির্ঘোষ বাণী—

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

> পেয়ো না ক্লীবত্ব, পার্থ!
> নহে তব যোগ্য কদাচন;

হৃদয়দৌর্বল্য ক্ষুদ্র
ত্যজি, উঠ—উঠ অরিন্দম।

স্মরণ করিয়া ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর—দেহ হইতে অলসতা ঝাড়িয়া ফেল, তারপর কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া যাও। এই কর্মভূমি ভারতে কাজের অভাব কি?

জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই গোলারই ধান,
আমরা মোটা খাব, ভাই রে পরব মোটা,
মাখব না ল্যাভেণ্ডার চাই নে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা রব কি উপোসি—ঘরে শুয়ে?
হারাস নে ভাই রে আর এমন সুদিন,
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।

তখন আবার সকলে মিলিয়া সমস্বরে গাহিল—

আমরা নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট—
তবু আছি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ।

মোহান্ধ বাঙালি যেন এত দিন—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,—
পর কৈনু আপন—আপন কৈনু পর।

এই ভাবে তাহার জাতীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল, স্বদেশপ্রেমী রজনীকান্ত তাহাকে বাহির হইতে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মস্থ করিয়া দিলেন, নিজের কাজে লাগাইয়া দিলেন।

একজনের একটি কদাকার কুৎসিত কালো কুচকুচে ছেলে জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ছেলেটির মা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—'আমার চাঁদপানা ছেলে জলে ডুবে গেল গো'। ভালোবাসিতে হইলে এমনি করিয়া ভালোবাসিতে হইবে। যত কুৎসিত হউক না কেন, যত দোষই কেন থাকুক না, আমার যাহা, তাহার সবটুকুই ভালো 'আমার যা তা বড়োই মিঠে'—নিশ্চয়ই।

এই দেশের দেবতাই একদিকে শ্যাম, অন্যদিকে শ্যামা। এই দেশের জনসাধারণ এই কালো ঠাকুর ও কালী ঠাকুরানীকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছে, কত যুগ যুগ হইতে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছে। আর এইরূপে

ভালোবাসিয়া ও ভক্তি করিয়াই তাহারা শ্যামসুন্দরের মদনমোহন রূপ এবং শ্যামা মায়ের ভুবন-আলো-করা রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আছে।

আমরা সবাই তো মায়ের ছেলে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন রজনীকান্তের মতো মাকে প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিয়া প্রণাম করিতে পারে? ভারতসন্তান আমরা যদি এই ভারতভূমিকে মা বলিয়া ডাকিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে পারি, তবেই আমরা রজনীকান্তের ন্যায় প্রকৃত দেশভক্ত হইতে পারিব। যেদিন এই দেশের নদনদী গিরিগুহা তরুলতা ঘাটমাঠ—ইহার প্রত্যেকের অণুতে পরমাণুতে আমার মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী মূর্তির স্বরূপ দেখিতে পাইব, সেই দিন আমরা 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি' মাথায় লইয়া বাঙালি জন্ম সার্থক করিতে পারিব। মাতৃভক্ত রজনীকান্ত আমাদের দেশকে—আমাদের মাটিকে 'মা'-টি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি একান্ত ভক্তিভরে এই মাটিকে পূজা করিয়া দেশাত্মবোধের প্রকৃত পরিচয় দানে দেশ ও দেশবাসীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

এজন্যই একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বর্তমান যুগের স্বদেশী সংগীতের কথায় বলিয়াছিলেন, 'যদি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে কাহারও সংগীত অত্যধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে তাহা কবি রজনীকান্তের।' ('নব্যভারত' শ্রাবণ ১৩১৭, ২১৪ পৃষ্ঠা)।

৩

সাধনতত্ত্ব

রজনীকান্তের কাব্যের ধারা ভগবৎপ্রেমসিন্ধুনীরে ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্দাম ও উন্মত্তভাবে প্রবাহিত হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত বাধাবিঘ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া কিরূপ আকুলভাবে ছুটিয়া চলিয়াছিল এবং তাহার পরিণতিই বা কি হইয়াছিল, এইবার তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। যখন তাঁহার সাধনার ধারা হাস্যরস ও দেশাত্মবোধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, আপন ভুলিয়া, জগৎ ছাড়িয়া ভগবৎপ্রেমসিন্ধুর পানে ছুটিয়াছিল, তখন রজনীকান্ত বুঝিয়াছিলেন, 'যাঁরে মন দিলে মন ফিরে আসে না'—এ মন তাঁহারই রাতুল চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। ভগবৎপ্রেমভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি সেই রূপময় ও গুণময়ের গলে বরমাল্য দিবার জন্য

ব্যগ্র হইযা উঠিযাছিলেন। মনের এই ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া রজনীকান্ত লিখিযাছেন—

বাবার কাছে সাগরের, রূপগুণ শুনেছি ঢের,
তাইতে স্বযম্বরা হতে
সে প্রশান্ত সাগর পানে ছুটে যাই।
আমায় ধরে রাখবি কেউ?
কি টানে টেনেছে আমায়, উঠছে বুকে প্রেমের ঢেউ,
(আমার) প্রাণের গানে সুধা ঢেলে
প্রাণের ময়লা নীচে ফেলে,
বাধা ভেঙে চুরে ঠেলে,
কেমন করে যাচ্চি চলে, দেখ না তাই।

এইরূপে যাহা রজনীকান্তের প্রাণের গান, সেই গানের সুধাতরঙ্গ ঢালিতে ঢালিতে তাঁহার ভাবধারা প্রেমময়ের অপার ও অপরিমেয় প্রেমসাগরে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে, নৃত্যপুলকে তাঁহার বক্ষ চঞ্চল, গীতিস্বরে তাঁহার সুধাস্রাবী কলকণ্ঠ হইতে প্রেমগীতি নিরন্তর ঝংকৃত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাগরসংগমের যাত্রী দশ দিক মুখরিত করিয়া গাহিয়া চলিয়াছে—

ফেলে দে মন প্রেমসাগরে,
হারিয়ে যাক রে চিরতরে,
একবার, পড়লে সে আনন্দনীরে
ডুবে যায়, আর ভাসে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে কান্তকবিকে বুঝিতে হইলে, তাহার সাধনসংগীতগুলি ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, অবহিতচিত্তে পাঠ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুরে বলিতে পারি, সেগুলি কষ্টকল্পিত, যশোলালসা বা কবি-গৌরবপ্রাপ্তির জন্য রচিত হয় নাই। হৃদয়ের অন্তস্তলবাহী ভক্তিনির্ঝরিণী হইতে এগুলি স্বতউৎসারিত। আর এইগুলিতে কবির প্রাণের কথা সরলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সে প্রাণের কথা পাঠ করিযা আমাদের ন্যায় অনেককেই চোখের জল ফেলিতে হইয়াছে।

রজনীকান্তের এই সাধনসংগীতগুলির ভাষাও যেমন সরল ও প্রাঞ্জল, ভাবও তেমনই মর্মস্পর্শী ও প্রাণারাম, অথচ এগুলি প্রসাদগুণে ভরপুর। একবার পাঠ করিলেই বা গায়ককণ্ঠে শুনিলেই কান ও প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

সাধনসংগীত-রচনায় রজনীকান্ত যে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কবি গুরুপ্রসাদ সেন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, তিনি সাধক কবি—ভক্তকবি ছিলেন। তাঁহার এই শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁহার রচিত 'পদচিন্তামণিমালা' ও 'অভয়াবিহার' কাব্য দুইখানির ভিতরে পাই। তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিলে, রজনীকান্তকে বুঝা সহজ হইবে। এইখানে তাই আমরা গুরুপ্রসাদের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছি। একটিতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বরাগের বর্ণনা কবি কি সুন্দরভাবে করিয়াছেন—

কাঞ্চন বরণ, বয়ন শচীনন্দন,
মলিন মলিন পরকাশ।
অবনত মাথে, অবনী অবলোকই,
ঢল ঢল নয়নবিলাস॥
সহগণ সঙ্গ, গরল অনুমানত,
চিতহুঁ উচাটন ভেল।
শ্রবণযুগল পুন, কাহে চকিত রহু
না বুঝি মরমকি কেল॥

গগন-বিহারী জলদ ঘন হেরি।
লুবধ নয়ন জনু, নিমিখ নিবারত,
লোর ঝুরত বেরি বেরি॥
হরি হরি নাম, গুণহু চরিতামৃত,
পিই পিই রহত উদাস।
প্রেম পরম ধন, জগতে ভসায়ল,
বঞ্চিত পরসাদ দাস॥

মদনমোহনের মধুর মুরলীধ্বনি শুনিয়া শ্রীমতী রাধিকা প্রিয়সখীকে যাহা বলিয়াছিলেন, অপরটিতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—

কহ কহ শুনি, তুয়া মুখে শুনি,
মুরলি নামের মালা।
মধুর বয়নে, শুনিলে এ সখি,
ঘুচব হামারি জ্বালা॥

কেবা আলাপয়ে, ললিত মুরলি,
দেব কি কিন্নর সেহ।
কিবা অপরাধে, বিঁধয়ে পরাণ,
আকুল হামারি দেহ॥

অলপ বিবর, কহসি এ সখি,
অপরূপ তুয়া বাক্‌।
শবদ পরশে, হামারি হৃদয়ে,
বিরবহি লাখে লাখ্‌।

সখি, হামে পুন হাম নহিয়ে।
বহ কি যায়ব এ পাঁচ পরাণ
সংশয় নাহি ছুটিয়ে॥

মিনতি করিয়ে, কহ কহ সখি,
কেবা সে করয়ে নাদ।
প্রসাদ ভণয়ে, শুনিলে এ ধনি,
দ্বিগুণ বাঢ়ব সাধ॥

পিতার এই অপরূপ কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণভাবে পুত্রে বর্তিয়াছিল। রজনীকান্তের অধিকাংশ সাধনসংগীতের ভিতরেই ঐকান্তিক নির্ভরতা ও গভীর বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়। যে ভাষায় সেগুলি রচিত, যে ছন্দে সেগুলি গ্রথিত, যে ভাবে সেগুলি মণ্ডিত, তাহাতে অতি সহজেই সেগুলি প্রাণের তারে গিয়া ঝংকার দেয়। তাঁহার সমস্ত সাধনসংগীতগুলির ভিতরেই আমাদের সনাতন ভাবধারার সরল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর এগুলির ভিতরে বেশ একটি সুন্দর ও সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা বর্তমান। এখানে সেই ভাবধারার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

আত্মীয়স্বজনপরিবৃত— পুত্রপরিবারবর্গের আনন্দকোলাহল-মুখরিত গৃহেও রজনীকান্তের মনে মাঝে মাঝে গভীর অতৃপ্তি আসিত— নির্বেদ উপস্থিত হইত। তাই নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়া তাঁহার 'হৃদয়ে বহ্নিজ্বালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ' দেখা দিল। জীবন তাঁহার কাছে তখন দুর্বিষহ, তখন—

পাপচিত্ত, সদা তাপলিপ্ত রহি,
এনেছে ডুবপনেয় মৃত্যু বিকার বহি,
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি।

তার পর তিনি তাহার সাধের সাজান বাগানের শ্যামশীতল ছায়ায় বসিয়াও কি নিদারুণ মর্মকাতরতা প্রকাশ করিতেছেন—

আগুনে পুড়িয়া হয়ে গেছি ছাই,
ধূলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাই ?
একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ,
দুখে পাপে তাপে জলে।

আর এইরূপে পাপে তাপে জলিয়া, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া তিনি বলিতেছেন—

মাগো, আমার সকলি ভ্রান্তি।
মিথ্যা জগৎ, মিথ্যা মমতা,
মরুভূমি শুধু, করিতেছে ধূ ধূ
হেথা, কেবলি পিয়াসা, কেবলি শ্রান্তি।

তিনি দেখিলেন, এই ভ্রান্তির মোহে তাহার পথের সম্বল, তাঁহার বিবেক, তাহার ধর্ম সকলই তিনি হারাইতে বসিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে কে যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল —

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথযাত্রি।

'বেলা যে ফুরায়ে যায়'—সত্যই তো রজনীকান্ত দেখিলেন, বিষয়কূপে নিমগ্ন হইয়া তিনি হাবুডুবু খাইতেছেন, আর তাহার চারিদিকের বিভীষিকার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ক্রমশই তিনি নিমজ্জিত হইতেছেন। এই অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া উদ্ধারের আশায় কাতরকণ্ঠে রজনীকান্ত ডাকিলেন—

ধরে তোল, কোথা আছ কে আমার।
এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার।
কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন রূপে,
ভুলায়ে আনিয়া মোরে ফেলে গেল মহাকূপে!
শ্রমে অবসন্ন কায়, কণ্টক বিঁধিছে তায়,
বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার।

তাঁহার দেহ কর্দমলিপ্ত, কণ্টকাঘাতে রুধিরাক্ত ও বলহীন, মন নিরাশায় পরিপূর্ণ

ও দারুণ অবসাদে অবসন্ন, স্বার্থময় পৃথিবীব নিষ্ঠুবতাভরা প্রবঞ্চনা দেখিয়া তিনি মর্মাহত। এই ভাবে বিপন্ন ও নিরুপায় হইযা তিনি জীবনে হতাশ্বাস হইলেন। রজনীকান্তের সাধনসংগীতেব মধ্যে ভাবেব এই প্রথম স্তর বা ধাবা দেখিতে পাই।

ইহার পরের স্তরে আমরা দেখিতে পাই, গতজীবনের কৃতকর্মের জন্য বজনীকান্তেব মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইযাছে। তিনি দেখিতেছেন, 'কুটিল কুপথ ধবিযা' তিনি তাঁহার গন্তব্য পথ হইতে বহু দূবে সবিযা পড়িযাছেন। অনুতপ্ত বজনীকান্তকে তাই আক্ষেপ কবিযা বলিতে দেখি –

কি মোহ-মদিবা-পানে বৃথা এ জনম গেল,
নযন মেলিয়া দেখি শমন নিকটে এল।

অনুশোচনার এই মর্মদাহী তাপে তাপিত হইযা বজনীকান্ত শ্রীভগবানেব উদ্দেশে বলিতেছেন—

আজীবন পাপলিপ্ত, লযে এ তাপিত চিত,
দূরে বব দাঁড়াইযা, লজ্জিত কম্পিত ভীত,
সব হাবাইযা প্রভু, হযেছি ভিখারী দীন,
তোমাবে ভুলিযা, হায়, নিবানন্দ কি মলিন।
কোন লাজে দিব পায? এ হৃদি কি দেওযা যায়?
সে দিন আমাব গতি কি হবে, হে দীনগতি?

তিনি জানিতেন, 'মূলের কড়ি সব খোযাযে, কল্লেম মিছে দাদন'। তাই তাঁহার অন্তবেব অন্তব হইতে মর্মব্যথা গুমবিযা উঠিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমাব—

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গবল পাথারে।

হায হায়, আমি কি করিয়াছি। আমি যে 'নযনে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিযা'! আমি যে কিছুই দেখি নাই, কিছুই বুঝি নাই—

লোকে যখন বলিত তুমি আছ, তখন
ভেবে দেখি নি আছ কি না,
তখন আমি বুঝিনি, প্রভু
আমার নাস্তি গতি তোমা বিনা।

তোমারি দেওয়া এই যে আমার মন—এও তো তোমারি গুণগরিমা ভুলিয়া রহিয়াছে। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি বসিয়াছিলাম, আমার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তুমি মাতৃরূপে আসিয়া কত ডাকিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমার সে ডাকে সাড়া দিই নাই, 'আমায়, ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা; আমি শুনেও জবাব দিলাম না!' তখন যে আমি মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম।

যখন রজনীকান্তের এই নিদ্রাঘোর কাটিয়া গেল, যখন আবার তিনি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই অসময়ের বন্ধুর চরণে কাতরে নিবেদন করিলেন—

নিবিড় মোহের আঁধারে আমার,
হৃদয় ডুবিয়া আছে,
কত পাপ, কত দুরভিসন্ধি,
আঁধারে লুকায়ে বাঁচে।

হে আমার প্রাণনাথ, হে আমার দিব্য আলোক, তুমি আমার এই অন্ধকার হৃদয়ে উদয় হও, তোমার উদয়ে—

হউক আমার মঙ্গল প্রভাত,
তাদের লুকাবার স্থান, ভাঙো, ভগবান,
তারা লাজে হোক মরমর।

"কল্যাণী"তে প্রকাশিত 'ভেসে যাই' সংগীতের মধ্যেও এই প্রকার গভীর অনুশোচনার সুর শুনা যায়। ইহাই রজনীকান্তের সাধনসংগীতের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে দেখি, অনুতপ্ত রজনীকান্ত এই দুঃখ, বিপদ, মোহ ও ভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। তিনি ভাবিতেছেন—

কার নাম স্মরি, দুখে পাই শান্তি?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি?
কার মুখকান্তি, হরে ভবভ্রান্তি?

সেই পরিত্রাতার অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হইলেন—অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—

আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,
আছে মাত্র একজন চিরবন্ধু সুখে দুখে!
বিপন্নের ত্রাণকর্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,...
কাঁদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ করে।

তখন আশার অভিনব আলোকে তাঁহার হৃদয় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, এই বিপজ্জাল হইতে রক্ষা করিতে একজনই পারেন, 'সেই যদি করে গো উদ্ধার'। সেই বিপন্নের ত্রাণকতার সন্ধান পাইয়া রজনীকান্ত দেখিলেন, তাহার সেই চিরবন্ধুর—

বিপুল প্রেমাচল চড়ে, বিশ্বজয়কেতু উড়ে
পুণ্যপবন-হিল্লোলে, মন্দ মৃদু মৃদু দোলে
দিয়ে শান্তিকিরণ রেখা, মহিমা-অক্ষরে লেখা—
'ক্লিষ্ট কেবা আর রে চলে, চিরশীতল স্নেহকোলে।'

সেই চিরশীতল স্নেহকোলে উঠিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করিবার জন্য রজনীকান্ত ব্যাকুল হইলেন। ইহার পরের স্তরের সংগীতগুলি মনঃশিক্ষামূলক। বিপন্নের বন্ধুর সন্ধান পাইয়া রজনীকান্ত মনঃশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, মনকে বলিলেন—

যা খেলে আর হয় না খেতে,
যা পেলে আর হয় না পেতে,
তাই ফেলে দিনে রেতে,
মরিস কিসের পিপাসায়?

তাই বলি—

আর কেন মন মিছে ঘুরিস
হিমে মরিস, রোদে পুড়িস
প্রেমগাছের তলায় বোস মন
যাবে হৃদয় জুড়ায়ে।

তোর গণা দিন যে ফুরাইয়া আসিল, তুই যে

পার হলি পঞ্চাশের কোঠা
আর দুদিন বাদে মন রে আমার
ফুল ঝরে যাবে, থাকবে বোঁটা।

এখন সময় থাকিতে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—

তোর, মিছের জন্য সত্যি গেল, এই তো হল লাভ,
সার যেটা তাই সার ভাব না,
সার ভাব এই শরীরটাই।

আর এই শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তির জন্য কত অসার জিনিসের খোঁজে তোর সারাজীবন কাটিয়া গেল; কিন্তু একবারও—

তুই কি খুঁজে দেখেছিস তাকে ?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক
পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে।
বসে কোন বিজন দেশে
তোর ভাবনা ভাবছে যে সে,
আছিস কি গেছিস ভেসে
সেখান থেকে খবর রাখে।

এখন আসলে মন দাও, এ ক্ষণভঙ্গুর অসার শরীরের সেবা ছাড়িয়া, সেই সকল সারের যিনি সারনিধি, তাহারই ভাবনা কর। বৃথা মায়ায় জড়িত হইয়া এতদিন তুই করলি কি ? তোর —

কবে হবে মায়ার ছেদন
কবে বাধবি প্রাণের বেদন ?
ইহপরকালের গতি, সে
দয়াল হরির চরণে জানা।

তাই বলি, 'যদি, বেলাবেলি ঘাটে যাবি, হালকা হয়ে চলবি'। তবে 'খুলে ফেল তোর পায়ের বেড়ি, ফেলে দে তোর তলপি'। তুই যে মস্ত ভুল করেছিস— এ তো তোর বাড়ি নয়, এ যে তোর বাসা—

ওরে, এ পারে তোর বাসারে ভাই
ও পারে তোর বাড়ি,
এই, কথাগুলো খেয়াল রেখে
জমিয়ে দে রে পাড়ি।

যখন ও পারের সেই নিজের বাড়ির, অভয়দাতার সেই অভয়নগরের সন্ধান রজনীকান্ত পাইলেন, তখন তিনি মনকে বলিলেন—

ভাসা রে জীবনতরণী ভবের সাগরে
ও তুই, যাবি যদি ওপারের সেই অভয়নগরে।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলেন—

কাজ কি রে তোর সের-ছটাকে
বেঁধে নে তোর দেহের ছ-টাকে
শিখে নে রে পরিমিতির নিয়মটাকে
রাখ চতুর্ভুজের গুণটি জেনে।

উদ্ধৃত স্থলগুলি ব্যতীত "বাণী"র 'শেষদিন' 'পরিণাম' 'শুদ্ধপ্রেম' "কল্যাণী"র 'নশ্বরত্ব' 'কত বাকী' 'এখনও' 'বৃথাদর্প' 'ধরবি কেমন করে' 'অসময়' 'মূলে ভুল' এবং "অভয়া"র 'রিপু' 'অকৃতজ্ঞ' 'অরণ্যে রোদন' ও 'খেয়া' প্রভৃতি গানগুলিতে মনঃশিক্ষার বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়।

এইবার সেই অভয়নগরের মালিকের সন্ধানে যাইতে যাইতে রজনীকান্তের মনে সেই করুণাময় ভগবানের, তাঁহার সেই চিরসখার অযাচিত করুণার, অপরিমেয় স্নেহের মনমাতান ছবি সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই আমরা তাঁহাকে প্রথমেই গাহিতে শুনি—

(আমি) অকৃতি অধম বলেও তো, কিছু
কম করে মোরে দাও নি।
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তো কিছু নাও নি।
(তব) আশিস-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাও নি।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শত বার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ— ফিরে চেয়ে দেখি,
এক পাও ছেড়ে যাও নি।

ভগবানের করুণাময়ত্বের এমন প্রকৃত ও মধুর পরিচয় আধুনিক কবিতার মধ্যে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। আমি শতবার তোমার বাঁধন কাটিয়া পলাইয়া যাই, আর মনে করি তুমিও ক্লান্ত বিরক্ত হইয়া আমায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু এ কি করুণাময়, তুমি যে আমার সান্নিধ্য ছাড়িয়া এক পাও যাও নাই। আমার এই সারা জীবনে আমি তো তোমাকে চাহি নাই, একবারও তোমাকে ডাকি নাই, তবু তুমি আমার ডাকার অপেক্ষা রাখ নাই, আমি না ডাকিতেই আমার অনাদৃত হৃদয়দেবতা, তুমি—

(আমার) হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।···
(আমি) দূরে ছুটে যেতে দু-হাত পসারি।
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।

জীব যে ভগবানের কত আপনার, কত প্রিয়; তাহাকে তাঁহার প্রেমময় স্নেহময় কোলে তুলিয়া লইবার জন্য সেই জীবসখা যে ব্যাকুলভাবে অহরহ ছুটিতেছেন—ইহা বুঝিতে পারিলে জীবের আর দুঃখ থাকে কি? 'ওপথে যেও না ফিরে এস' বলে তুমি আমার কানে ধরিয়া কতবার নিষেধ করিয়াছ; তোমার নিষেধ না মানিয়া আমি তবুও সেই বিপথে ছুটিয়াছি, আর তুমি— আমার সদা-মঙ্গলকামী সখা, আমাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিছু পিছু ছুটিয়াছ—

এই, চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসিমুখে তুমি বয়েছ;
আমার, নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে করে নিয়ে রয়েছ;

ভগবানের অশ্রান্ত করুণার এই মধুর পরিচয়ে পাষাণহৃদয়ও গলিয়া গিয়া, তাহার ভিতর হইতে প্রেম-মন্দাকিনীর ধারা সহস্রধারে বাহির হইয়া পড়ে। অন্য দিকে রজনীকান্ত কি সুন্দরভাবে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর প্রাণারাম মাতৃমূর্তি আঁকিয়াছেন দেখুন— অবোধ ও অবাধ্য পুত্রের দুঃখে ব্যথিত হইয়া মা—

এল ব্যাকুল হয়ে, 'আয় বাছা' বলে—
'বাছা, তোর দুঃখ আর দেখতে নারি,
আয় করি কোলে;
আয় রে মুছায়ে দিই তোর মলিন বদন
আয় রে ঘুচায়ে দিই তোর বেদনা।'
আমি দেখলাম মায়ের দু-নয়নে নীর
মায়ের স্নেহে গলে, ঝর-ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর।

অন্য স্থলে অনুতপ্ত অপরাধী পুত্রের স্বীকারোক্তির মধ্যেও এই ক্ষমাময়ী স্নেহময়ী মায়ের ছবি আরও কত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—

আহা, কত অপরাধ করেছি আমি
তোমারি চরণে মাগো!
তবু কোলছাড়া মোরে করো নি, আমায়
ফেলে চলে গেলে না গো।

আমি চলিয়া গিয়াছি 'আসি' বলে
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখিজলে
কত, আশিস করেছ বলেছ, 'বাছা রে
যেন সাবধানে থেকো,
আর পড়িলে বিপদে যেন প্রাণভরে
মা মা বলে ডেকো।'
ওমা, আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি
তুমি সতত শিয়রে জাগো।

মায়ের এই করুণার ছবি দেখিয়া রজনীকান্তের মনে ধিক্কার জন্মিল—তাঁহার দারুণ লজ্জা হইল। তাহার মনে হইল, এই এমন আমার মা, আর তাঁর ছেলে আমি। অনুতাপে তাঁর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এমন যে মা, সেই মাকে তুই অবহেলা করিয়াছিস, আর এখন দেখ—

যে মাকে তুই হেলা করে বলতিস কুবচন,
সেই ক্ষমার ছবি বলছে কানে 'জাগ রে জাদুধন'।
তোর একই কাতে রাত পোহালো ভাঙলো না স্বপন
তোর জীবনরাত্রি পোহায় এখন উষার আগমন।

তোর সেই 'ক্ষমার ছবি' মা ই তোকে এখন সাবধান করিয়া তোর মঙ্গল-উষার আগমন-বার্তা জানাইয়া দিতেছে।

এই স্তবের কবিতাগুলিতে জীবের প্রতি শ্রীভগবানের মমতার ও অযাচিত করুণার পরিচয় কি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে শ্রীভগবানের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য রজনীকান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মনের এই অবস্থায় রজনীকান্ত তাঁহার সেই করুণাময় দেবতার উদ্দেশে বলিলেন—

কত দূরে আছ প্রভু প্রেম-পারাবার?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার?
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ-দীন ক্ষীণ জলধার।
ওহে মায়া-মোহহারি! নিগড় ভাঙিতে নারি,
নিরুপায় বন্দী ডাকে, অধীর আকুল প্রাণে।

যখন তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহার প্রাণের দেবতাকে এইরূপে ডাকিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই সদয় ঠাকুর নিদয় হইয়া একেবারে দূরে পলাইয়া গেলেন। দেবদর্শন-বঞ্চিত রজনীকান্তের প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইল—

দেবতা আমার, কেন দুঃখ দাও,
দাঁড়াও বলিতে দূরে চলে যাও,
ডেকে ডেকে মরি, ফিরে নাহি চাও,
দয়াময়, কেন নিদয় এমন ?

এত ডাকেও যখন তিনি দেখা দিলেন না, তখন তাঁহার দেবতার উপর রজনীকান্তের নিদারুণ অভিমান হইল, সেই অভিমানে তিনি বলিলেন—

যদি মরমে লুকাযে রবে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
যদি পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন-পতি,
পতিতপাবন নাম নিলে গো ?
জীবনে কখন আমি, ডাকি নি হৃদয়স্বামী,
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

করুণাময়ের কাছে করুণা না পাইয়া, রজনীকান্ত করুণাময়ী মায়ের করুণার উদ্রেক করিবার জন্য কি করুণ সুরের রোল তুলিলেন দেখুন—

কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস নে মা, ধুলো-কাদা মেখেছি বলে।···
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) পড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দলে।

রজনীকান্ত মনে স্থির জানিতেন, তাঁহার এই অধীর ব্যাকুলতা সেই করুণাময় শ্রীভগবান ও করুণাময়ী জগজ্জননীর শ্রীচরণলাভ ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিবে না ; তাই তিনি একান্তমনে প্রার্থনা করিলেন—

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল-নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

মনের এই নিদারুণ ব্যাকুল অবস্থায় রজনীকান্ত সার বুঝিলেন, তাঁহার কৃপা না হইলে, তিনি নিজে করুণা না করিলে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ সম্ভবপর নয়।

তাই তাঁহার করুণার ভিখারি হইয়া রজনীকান্ত শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রজনীকান্তের এই করুণাভিক্ষা ও প্রার্থনা কি অকপট, কি কুণ্ঠাহীন, কি নির্মল! অন্তরের অন্তর হইতে এগুলি স্বতউৎসারিত—

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক, মোর
মোহকালিমা ঘুচায়ে।...
প্রভু, বিশ্ববিপদ-হন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।

আমার কিছু শক্তি নাই, তুমি দয়া করিয়া আসিয়া 'হে বিশ্ববিপদ-হন্তা' আমার ভক্তিপথবিরোধী পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াও। আমি যে দুর্বল, আমি যে অক্ষম, আমি যে পতিত, তাই হে পতিতপাবন 'দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে, অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়।' আমার যে—

দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন,
দীনতারা, ঘুচাও দীনের দুর্দিন,
আশা রূপে মাগো, নিরাশ প্রাণে জাগো,
দিয়ে ও চরণ অক্ষয় শান্তি।

মায়ের নিকট শান্তি-ভিক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার প্রাণে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল না, তখন তিনি তাঁহার চিরসাথীকে বলিতেছেন—

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে!
ভ্রান্ত চিত, শ্রান্ত পদ, ঘিরিল দুখরাতি হে।..
ক্ষেমময়! প্রেমময়! তার নিরুপায়ে হে ;
মরণদুখহরণ! চিরশরণ দেহ পায়ে হে।

ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার প্রার্থনার সুর কি উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে দেখুন। রজনীকান্ত জানিতেন যে, সুখের মাঝে তিনি ভগবানকে ভুলিয়া থাকেন —সম্পদের কোলে বসিয়া গর্বে তিনি আত্মহারা হইয়া যান, তাই আত্মজয় করিবার জন্য তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, বিপদকে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

ভগবানকে কিভাবে পাইলে রজনীকান্তের প্রাণ তৃপ্ত হইবে, তাহা একবার তাঁহার ভাষায় পাঠ করুন—

হেরিতে চাহি চোখে শুনিতে চাহি কানে,
কর-পরশ চাহি, যেন তুমি স্থূল।

তোমার ভুবন-ভুলানো রূপ দেখিতে চাই, তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর স্বকর্ণে শুনিতে ইচ্ছা করি, তোমার শান্ত-শীতল করযুগলেব সুকোমল স্পর্শলাভ করিবার জন্য এ প্রাণ ব্যাকুল। কিন্তু এই যে দেখা, পার্থিব দুইটি চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিয়া তো সাধ মিটে না, আমাদেব এই দুইটি কান দিয়া তাঁহার সেই মধুব কণ্ঠসংগীত-সুধা পানের পুর্ণ তৃপ্তি পাওযা যায় না, এই একটি মাত্র কণ্ঠ দিয়া সেই চিরদয়িতের যশঃকীর্তন কবা অসম্ভব তাই রজনীকান্ত প্রার্থনা কবিতেছেন—

কোটি নয়ন দেহ কোটি শ্রবণ প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সংগীত
তুলিতে তোমারি যশবোল !

পৃথিবীর নানা পাপ-তাপ, আশঙ্কা-ভয়ের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য রজনীকান্ত প্রার্থনা করিলেন—

ভীতি-সংকুল এ ভবে, সদা তব
সাথে থাকি যেন, সাথে গো,
অভয়-বিতরণ চরণবেণু,
মাথে রাখি যেন মাথে গো।

"কল্যাণী"-র 'প্রাণপাখি' গানে তাঁহার প্রাণের প্রার্থনার সুরের বেশ একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে,
উধাও করে লয়ে যাও এ মন।...
(প্রভু) বাঁধ তব প্রেম-সূত্র (এই) অবশ পাখায় হে;
(আর) ধীরে ধীরে তব পানে টেনে তোল তায় হে।...
(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে;
(যেন) সব ভুলি, ওই বুলি, বলে অবিরাম হে।

ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া ও তাঁহার চরণে প্রাণের প্রার্থনা জানাইয়া রজনীকান্ত তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতে বসিলেন। তাঁহার এই সরল

আত্মনিবেদনের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা বা লুকোচুরি নাই। কপটতা তিনি কোনদিনই ভালোবাসিতেন না। ভণ্ডামিকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেন নাই। বাড়াবাড়ি তাঁহার জীবনে কোনদিনই ছিল না, তাই তাঁহার কবিতায় এই আত্মনিবেদনের ভিতরে তাহার প্রাণের সরল কথাই দেখিতে পাই—

কবি নে তোমার আজ্ঞা পালন,
মানি নে তোমার মঙ্গল শাসন,
তোমার, সেবা নাহি করি তবু কেন, হরি
লোকে বলে মোরে 'হরিদাস'।
তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাবতে প্রভু, আমি লাজে মরি।
আমি দশের চোখে ধুলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি।

.. ...

যেমন পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার-কোণে রাখি,
অমনি চমকে উঠে দেখি, পাশে জ্বলছে তোমার আঁখি!
তখন লাজে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চরণতলে পড়ি—
বলি 'বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি'।

আমি সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাই নে,
আমি, চাহি দারাসুত-সুখসম্মিলন,
তব সঙ্গসুখ চাহি নে।
আমি কার তরে দিই আপনা বিলায়ে
ও পদতলে বিকাই নে,
আমি, সবারে শিখাই কত নীতিকথা,
মনেরে শুধু শিখাই নে।

"অভয়া"-র 'পাগল ছেলে' নামক গানে 'আমার প্রাণ রবে তোর চরণতলে, দেহ রবে ভবে' ছত্র হইতে রজনীকান্তের আত্মনিবেদনের গতি কোন্ দিকে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উত্তরকালে হাসপাতালের রোজনামচায় এই ভাবের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

ইহার পরে রজনীকান্ত সর্বভূতে শ্রীভগবানের সত্তানুভব করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন—এই যে গৃহ যাহার মধ্যে আমি বাস করিতেছি, এ যে তোমার, যে অন্ন খাইয়া আমি প্রাণধারণ করিতেছি, ইহাও যে তোমারি দান, যে বায়ু সেবন করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, তাহাও যে তোমার, আর—

তোমারি মেঘে শস্য আনে,
ঢালি পীযূষ জলধারা,
অবিরত দিতেছে আলো,
তোমারি রবি-শশি-তারা,
শীতল তব বৃক্ষছায়া
সেবে নিয়ত ক্লান্ত কায়া।

এই জ্ঞান হইতে রজনীকান্ত যে অভিনব দৃষ্টি লাভ করিলেন, তাহার দ্বারা সর্বভূতে ভগবানের সত্তানুভব করিয়া গাহিলেন—

আছ, অনলে-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ, বিটপি-লতায়, জলদের গায়,
শশী-তারকায় তপনে।

ভগবানের বিশ্বরচনার মধ্যেও রজনীকান্ত তাঁহার সত্তা কি ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন, তাহা দেখিলে আনন্দে অভিভূত হইতে হয়—

চিরপ্রেম-নির্ঝরের একটি বুদ্‌বুদ লয়ে
ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত বয়ে,

অমনি—

জননী করিল স্নেহ, সতীপ্রেমে পূর্ণ গেহ,
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ।

"কল্যাণী"-র, 'তুমি মূল' নামক কবিতায় সেই চিরসুন্দরের অক্ষয় সৌন্দর্য, তাঁহার অপার ও অপরিমেয় প্রেম, তাঁহার অকথিত ও অগণিত মহিমার পরিচয় কি সরলভাবে ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখুন—

তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময়
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।...
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে,

তাই মধু মমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি প্রেমকথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয় !

এইভাবে সর্বভূতে, স্থাবর-জঙ্গমে শ্রীভগবানের সত্তানুভব করিয়া রজনীকান্ত তাঁহাকে হৃদয় ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আর এই ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন, কে যেন তাহার আঁখি-তারকার উপরে 'মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়'। আর তাহাব ফলে তিনি চিবসুন্দরের সৃষ্টিব সকলই সুন্দর, সকলই নয়ন-মনোহর দেখিতে লাগিলেন, 'সুন্দর তব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি'।

গভীব বিশ্বাসের সুবে বজনীকান্তের হৃদয়বীণার তার বাঁধা ছিল। তাঁহার সাধনসংগীতগুলিতেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সমস্ত বাধাবিঘ্ন, তাঁহার বিশ্বাসের কাছে বাতবিক্ষুব্ধ তৃণের ন্যায় দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহার এই বিশ্বাস কি অগাধ ও অপবিমেয় ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েক পঙক্তি পাঠে জানিতে পারা যায়—

তুমি কি মহান, বিভু, আমি কি মলিন ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র,
তবু, তুমি মোরে ভালোবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস।

ভগবানের অসীম করুণা উপলব্ধি করিয়া উঁহাকে লাভ করিবার জন্য যখন তাহার প্রাণে দারুণ পিপাসা জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি বুঝিলেন, তিনি ভিন্ন এ পিপাসা কেহই দূর করিতে পাবিবে না। তাই অটল বিশ্বাসে তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে শান্তিসুখসুধা ;
পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব সনে অমৃতযোগ।

ভগবানের করুণা ও ভালোবাসা লাভ করিয়া রজনীকান্ত গভীর বিশ্বাসের সুরে গাহিতেছেন—

কোন্ অজানা দেশে আছ কোন্ ঠিকানায়,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাস যে আমায় ;
গোপনে যাওয়া আসা, ভালোবাসা, চোখের আড়াল সব,
লোক-দেখানো নয় হে, তোমার করুণা নীরব

"কল্যাণী"-র 'বিশ্বাস' নামক কবিতায় এই বিশ্বাসের স্থর একেবারে চরমে পৌঁছিয়াছে—

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি,
পাবো জীবনে না হয় মরণে।

আশার কি অভয়বাণী। তোমাকে পাবোই, তুমি দেখা দেবেই, শুধু দেখা দিয়াই তুমি তো ক্ষান্ত হও না—

আমি শুনেছি হে তৃষাহারি।
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি।

তারপর শ্রীভগবানই যে অগতির গতি, অশরণের শরণ, অনাথের নাথ তাহার বার্তা কবি নিম্নের দুই ছত্রে কি স্থন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার।

এই পরিচয় পাইয়াই রজনীকান্ত জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন—

তব, করুণামৃত পানে, হবে
কঠিন চিত দ্রব হে,
আমি, পাইব তব, আশিস-ভরা,
জীবন অভিনব হে।

এই বিশ্বাসের সাহায্যে রজনীকান্ত বুঝিলেন, তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইবে—

সে যে যোগিঋষির সাধনের ধন ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, 'সর্বং সমর্পিতমস্তু' বলে যে-জন ডাকে।

সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে একান্তভাবে নির্ভর করিতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তাই রজনীকান্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া লিখিলেন—

আমি দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত;
তুমি, আমারে যা দাও সবি তোমারি মতো।

আকুল হইয়া আমি যে কতই কি চাহি। চাওয়ার আমার তো অন্ত নাই—শত নিষ্ফল বাসনা তবুও যে কাঁদিয়া মরে। আমি জানি না, কিন্তু 'কিসে মোর ভালো হয়, তুমি জান দয়াময়'। আর কেনই বা কি সংকল্প সাধনের জন্য আমি এত

চাহিয়া মরি, তাহাও তো জানি না, কিন্তু— 'তুমি জান কিসে হরি, সফল হইবে মম জীবন-ব্রত।' এই ভাব প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া রজনীকান্ত বলিলেন—

চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল, সদা মম কুশলরত।

এই প্রকারে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া ভগবৎকরুণা-বিশ্বাসী রজনীকান্ত শ্রীভগবানকে বলিলেন—

কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব ?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা
তাই আনি হৃদে বরি হে।
তাই বলে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়।
যখন যে রূপে প্রাণ ভরে যায়
তাই দেখি প্রাণ ভরি হে।

কি মর্মস্পর্শী ভাষায় কি সুন্দর প্রাণারাম কথা রজনীকান্তের অমর লেখনীমুখে বাহির হইয়াছে— তোমায় ডাকিতে ডাকিতে আমার এই দগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া যায়, আর হে অনন্ত রূপময়, তোমার যেরূপে যখন আমার প্রাণ ভরিয়া যাইবে, তখন আমি প্রাণ ভরিয়া সেই রূপই দর্শন করিব।

নির্ভরতার এই যে অপূর্ব চিত্র, ইহাই রজনীকান্তের সাধনসংগীতের প্রাণ। এই নির্ভরতার ফলেই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—

আর, কাহারো কাছে, যাব না আমি,
তোমারি কাছে রব হে,
আর, কাহারো সাথে কব না কথা
তোমারি সাথে কব হে।
ঐ অভয় পদ হৃদয়ে ধরি
ভুলিব সব দুখ হে;
হেসে তোমারি দেওয়া বেদনাভার,
হৃদয়ে তুলি লব হে।

"বাণী"-র 'তোমারি' নামক গানটি যেন শেষের দুইটি পঙ্‌ক্তির প্রতিধ্বনি : 'তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ, তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।' এই অনুভূতির সাহায্যে তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন— 'আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি তো।'

ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার উপর নির্ভরতার ফলে রজনীকান্ত এই সারকথা বুঝিলেন—আর বুঝিয়া তাঁহার খেয়াঘাটে আসিয়া উদাত্তস্বরে গান ধরিলেন—

বড়ো নাম শুনেছি,
ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছি, নাম শুনেছি,
পারের কড়ি লাগে না,
তোমার ঘাটে পার হতে নাকি কড়ি লাগে না,
'দয়াল' বলে তিন ডাক দিলে কড়ি লাগে না,
'দীনে পার কর' বলে ডাক দিলে আর কড়ি লাগে না,
কাতর হয়ে ডাক দিলে আর কড়ি লাগে না,
চোখের জলে ডাকলে নাকি কড়ি লাগে না।

সত্যসত্যই রজনীকান্ত বুঝিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষের মতো জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, চোখের জলে না ডাকিলে তাঁহার দয়া হইবে না—তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। আর-একটি কথা রজনীকান্তের মনে হইল, সেই অন্তরের ধনকে অন্তরের মাঝে আনিতে হইলে, সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়কে লুপ্ত করিতে হইবে—

তারে, দেখবি যদি নয়ন ভরে,
এ দুটো চোখ কর রে কানা,
যদি শুনবি রে তার মধুর বুলি,
বাইরের কানে আঙুল দে না।

সাধনমার্গের এই খাঁটি কথা তিনি কত সহজ ও সরল ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। রজনীকান্তের সাধনসংগীতের শেষ স্তর ভগবানের স্বরূপদর্শন। প্রাচীমূল কনককিরণে কনকিত করিয়া তাঁহার হৃদয়-দেউলের দেবতা তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহারই আনন্দরশ্মিধারায় রজনীকান্তের হৃদয়পদ্ম বিকসিত হইয়া সেই সৌম্যমূর্তির পাদপদ্মেই অর্ঘ্যস্বরূপ সমর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দর্শনের পূর্বেই রজনীকান্ত মনকে একটা বড়ো কথা বলিলেন—

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে
কঠিনে মেশে না সে,
মেশে রে তরল হলে।

প্রেমে গলিয়া গিয়া রজনীকান্ত প্রাণের ভিতর একটা **মধুর স্পন্দন অনুভব** করিলেন, তিনি দেখিলেন—

কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত-শীতল রাগে
মোহ-তিমির নাশে, প্রেম-মলয়া বয়
ললিত-মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি,
আদরে মোরে ডাকি, হেসে হেসে কথা কয়।…

সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর কম,
মুগ্ধমানসে মম, নাশে পাপতাপভয়।

আপনার হৃদয়ের মাঝে তাঁহাকে পাইয়া রজনীকান্ত চারিদিকে তাঁহার নানা ভাবের ছবি দেখিতে লাগিলেন।

যখন, জননী সন্তানের তরে, প্রাণ দিতে যান অকাতরে,
তখন, দেখতে পাই সে মায়ের মুখে তোমার প্রেমের চিত্র আঁকা।

সর্বজীবে ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া রজনীকান্ত কি অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাহার পরিচয় উপরের পঙ্‌ক্তি দুইটিতে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দর্শনলাভ করিয়া রজনীকান্ত দেখিতেছেন—

সাধুর চিতে তুমি আনন্দরূপে রাজ
ভীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে;
প্রেমরূপে জাগ সতীর হিয়া-মাঝে
স্নেহরূপে জাগ জননী-নয়ানে,
প্রীতিরূপে থাক প্রেমিকপ্রাণে সখা
যোগি-চিতে চির উজল আলোক।

এইরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপমূর্তি দেখিতে দেখিতে রজনীকান্ত গাহিলেন—

সে যে, পরম প্রেমসুন্দর'
জ্ঞান-নয়ন-নন্দন;
পুণ্য-মধুর নিরমল
জ্যোতিঃ জগত-বন্দন।
নিত্য পুলক চেতন
শান্তি চিরনিকেতন;
ঢাল চরণে রে মন,
ভকতি-কুসুম-চন্দন।

আর এই ভাবে ভগবানের চরণে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়া রজনীকান্ত মিলনানন্দে বিভোর হইলেন। তাঁহার আনন্দপ্লাবিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এক অপরূপ প্রাণমাতানো স্তব উঠিল--

বিভল প্রাণমন, রূপ নেহারি,
তাত! জননি! সখে! হে গুরো! হে বিভো!
নাথ! পরাৎপর! চিত্তবিহারি!
সফল আজি মম অন্তর-ইন্দ্রিয়!
মনোমোহন! সুন্দর! মরি বলিহারি!

৪

কাব্য-পরিচয়

"বাণী"-র ভূমিকায় ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 'কাহারো বাণী গদ্যে, কাহারো পদ্যে, কাহারো বা সংগীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সংগীত।' এই সংগীতই তাহার জীবনের সাধনা ছিল। সংগীতরচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই তিনি বাংলা দেশে অমর হইয়া গিয়াছেন এবং এই সংগীতসাধনার সিদ্ধিই তাঁহাকে দেশ-কালের অতীত করিয়া সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী জননীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়াছে। সংগীতের সার্থকতা ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?

রজনীকান্তের রচিত সাতখানি পুস্তকের মধ্যে "অমৃত" ও "বিশ্রাম" এ দুইখানি শিশুপাঠ্য নীতিপূর্ণ কবিতায় রচিত। তাহার "বাণী" "কল্যাণী" "আনন্দময়ী" "বিশ্রাম" ও "অভয়া" এই পাঁচখানি পুস্তকের বারো আনাই গান। তিনি প্রায় সর্বত্রই গানের কবি। তিনি কথা কহেন সুরে, কাঁদেন সুরে, হাসেন সুরে, দেশকে জাগান সুরে, ভগবানকে, জগন্মাতাকে ডাকেন— তাও সুরে। তাঁহার প্রায় সকল রচনাই সুরে গাঁথা। রজনীকান্ত ছিলেন, খাঁটি বাঙালি কবি এবং তাঁহার কবিতা খাঁটি বাংলা কবিতা। তাহাতে ইংরেজির গন্ধ বা সম্পর্ক নাই। অতি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় তিনি আমাদের অন্তরের ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের অন্য কবিদিগের অন্য বিষয়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ

থাকিতে পারে, কিন্তু রজনীকান্ত যেদিকে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ।

একদিকে যেমন তিনি আমাদের প্রাণের কথাগুলিকে ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, অন্যদিকে আবার হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ভক্তিবাদের তত্ত্বগুলিও বেশ প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা যে ভাষায় ভাবি, কথা কহি, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভরসা, অনুরাগ বিরক্তি প্রকাশ করি, রজনীকান্ত ঠিক সেই ভাষাতেই কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহার সুর বা ভাষায় যে খুব একটা বাহাদুরি আছে তাহা নহে, তবে তাহা বেশ সহজে পড়া, গাওয়া বা বোঝা যায়। তাঁহার বিশেষত্ব, তিনি উচ্চ ইংরেজি-শিক্ষিত হইয়াও খাঁটি বাঙালিভাবে খাঁটি বাংলা কবিতা বাঙালিকে উপহার দিতে পারিয়াছিলেন।

বঙ্গভূমি কবিমাতৃকা—বহু কবিসন্তানের জননী। গত ষাট বৎসরের মধ্যে বাংলা বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় ষোলো আনাই শিক্ষিত সমাজের কবি। তাঁহাদের কবিতার স্রোত দেশের এক স্তরে প্রবাহিত, কিন্তু দেশের অন্য স্তরে তাঁহাদের কবিতা পৌছিতে পারে নাই। কারণ, এই শিক্ষিতসমাজ লইয়াই দেশ বা দেশের প্রাণ নয়, দেশের বারো আনা প্রাণ দেশের কৃষক, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। দেশের এই অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের অনেকেরই নামও জানে না। একদিন ছিল যখন যাত্রা, পাঁচালি, তরজা, বাউল, কবি, হাফ আখড়াই প্রভৃতির ভিতর দিয়া দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ সাহিত্যানন্দ উপভোগ করিত, সৎশিক্ষা পাইত। সেকালে এই শ্রেণীর সংগীত-সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশের ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন।

ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি, নীলকণ্ঠ, কাঙাল হরিনাথ প্রভৃতি দেশের জনসাধারণের কবি, আর মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি শিক্ষিত সাধারণের কবি। রজনীকান্ত এই দুই শ্রেণীর মধ্যস্থল অধিকার করিয়াছিলেন। সেইজন্য রজনীকান্তের দ্বারা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই উভয় শ্রেণীর উপযোগী কবিতার সমন্বয় হইয়াছে, আর এই সমন্বয়ে তিনি কবিতার ভিতরে এক নূতন রসের প্রবাহ বহাইয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে রজনীকান্তকে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। এই কার্যসাধনের জন্য দুইয়ের মধ্যে যাহা ভালো তিনি তাহা লইয়াছেন এবং যাহা মন্দ তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন কবিদিগের সরল ভাষা

ও অকপট ভাব গ্রহণ করিয়া আদিরসের আতিশয্যটুকু বর্জন করিয়াছেন, অথচ তাঁহার কবিতায় এ যুগের কবিগণের ছন্দোবৈচিত্র্য ও মাধুর্য বর্তমান, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতায় ভাবের যে অস্পষ্টতা ও প্রহেলিকা বিদ্যমান, তাহা তাঁহার কবিতায় একেবারেই নাই।

আমাদের দেশের আধুনিক কবিগণের রচনার মধ্যে অশিক্ষিত জনসাধারণের সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি যে পাই না, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের ভাব কৃত্রিম, ভাষা কষ্টবোধ্য, প্রকাশের ভঙ্গিও জটিল। সে-শ্রেণীর কবিতা এখন পোশাকি কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পোশাকি জিনিসে আর কাজ নাই। বর্তমান জীবনসংগ্রামের দিনে আর বিলাসিতার উপকরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। তাই যখন রজনীকান্তের কবিতার ভিতরে অকৃত্রিম কাব্যরসের সবল উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই, তখন আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। ড্রয়িং-রুম ও পার্লারের কৃত্রিম বাহ্য আড়ম্বর ও শুষ্ক নীরস ভাবের আতিশয্যে আমাদের হৃদয় জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। রজনীকান্তের কাব্যের ভিতর আমরা দেশের মেঠো সুরের পরিচয় পাই, সে-সুর শহরের বৈঠকখানায় পাওয়া যাইবে না। আর সেই মেঠো সুর দেশের অন্তরতম প্রাণের সুরটিকে জাগাইতে পারিয়াছিল বলিয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, যাহা সচরাচর বাংলা কবিতার মধ্যে পাওয়া না। বর্তমান যুগের কবিগণের মধ্যে আমাদের মনে হয়, বাংলার অন্য কোন কবি এমনভাবে একই সঙ্গে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের হৃদয় তোলপাড় করিতে পারেন নাই।

রজনীকান্তের গানের এত প্রসারতা লাভের কারণ, সেগুলি সহজ সরল প্রাঞ্জল প্রসাদগুণে ভরপুর, ভাষার মধ্যে খোঁচখাঁচ নাই, ব্যাকরণের আড়ম্বর নাই, উৎকট সমাসের প্রয়োগ নাই, অলংকারের বাড়াবাড়ি নাই, নির্মল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার। ভাষার জালে পড়িয়া ভাবকে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় নাই, ভাব বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না। এই সমস্ত কারণে সেগুলি জনসাধারণের কাছে বিশেষ আদৃত। আর শিক্ষিত বাঙালির কাছেও সেগুলি এত আদৃত কেন? না, তাহারা পুরানো কথা, পুরানো ভাব নূতন ছন্দে নূতন সুরে নূতন বেশে, নূতন আকারে পাইল। কান্তের গানে তাহারা পাইল অনাবিল হাস্য, বিশুদ্ধ কৌতুক, মধুর ব্যঙ্গ, তীব্র শ্লেষ, পাইল শান্ত, করুণ ও হাস্যরসের অপূর্ব সংযোগ, পাইল স্বাদেশিকতা, দেশাত্মবুদ্ধি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, পাইল বিশ্বসৌন্দর্য, বিচিত্র সৃষ্টিরহস্য, ভগবদ্‌বিশ্বাস, ভগবৎপ্রেম, তাই শিক্ষিত বাঙালি আত্মহারা হইয়া গেল।

রজনীকান্তের কাব্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই, হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি নাই। উৎকট দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা নাই—আছে প্রেম ভক্তি করুণা ভালোবাসা, আছে বিশ্বস্রষ্টা, আছে উপনিষদের ঈশ্বর, গীতার ভগবান। তিনি সকলের কবি, কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা জাতি বা ধর্ম্মবিশেষের কবি নহেন। কাব্য পড়িয়া কবিকে বুঝিতে পাবা যায়, এ কথাটা পুরা সত্য নহে, সব সময়ে এটা খাটে না—বিশেষত আজকালকার দিনে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন :

'কাব্য পড়ে বুঝব যেমন, কবি তেমন নয় গো।' কিন্তু তাঁহার এই উক্তি রজনীকান্ত সম্বন্ধে মোটেই খাটে না। রজনীকান্ত ও রজনীকান্তের কাব্য একেবারে পুবামাত্রায এক জিনিস, একেবারে অভিন্ন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূব অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস্ সাহেব মহাকবি মিল্টন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, There is no divorce between John Milton the man and John Milton the poet. As was the man, so were his works ; his works are an index to his character'—এই উক্তি রজনীকান্তের পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। রজনীকান্ত সেনও যা, আব তাঁহার সমগ্র গান ও কবিতাও তাই। তাঁহার সমগ্র কাব্য নিজের মর্ম্মের কথা, প্রাণের কথা, অন্তরের কথা। তাই অত স্পষ্ট, অত পরিস্ফুট, অত মর্ম্মস্পর্শী—ইহার মধ্যে ধার-করা কথা নাই, কল্পিত কথা নাই, মিথ্যা কথা নাই—তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন, যাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, যাহা বুঝিবার চেষ্টা করিযাছিলেন তাহাই ভাষার ভিতর দিয়া, গানের মধ্য দিয়া সুরসংযোগে গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেই তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিব, আবার তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে, সেই রজনীকান্ত সেন মানুষটিকে বুঝিতে পারিব।

৫

জনপ্রিয় রজনীকান্ত

দোষে গুণে মানুষ। প্রত্যেক মানবের চরিত্রেই কতকগুলি গুণ এবং কতকগুলি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার চরিত্রে দোষের মাত্রা কমিয়া গিয়া ক্রমেই গুণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, দেবত্বের ক্রমবিকাশ হয়, তিনিই মানব নামে পরিচিত হইবার যোগ্য। আপাদমস্তক পাপে জড়িত ব্যক্তিও জগতে

যেরূপ বিরল, সেইরূপ নিরঙ্কুশ পুণ্যপ্রভায় উদ্‌ভাসিত লোকও সংসারে দুর্লভ। আবার যাঁহারা ক্ষণজন্মা পুরুষ, ঈশ্বরানুগ্রহে যাঁহারা সমাজমধ্যে, জাতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের চরিত্রে গুণরাশির মধ্যে কোনও একটি গুণ বিশেষরূপে বিকশিত হয়। সেই গুণের গৌরব, সেই গুণের জ্যোতি অন্য সকল গুণকে ছাপাইয়া দীপ্তি পায়, বিকাশ পায়, চারিদিকে আনন্দ বিতরণ করে।

রজনীকান্তের চরিত্রের বিশেষ গুণ, তিনি জনপ্রিয় ছিলেন— সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে এমন একটি মাধুর্য ছিল, স্বভাবে এমন একটি কমনীয়তা নমনীয়তা ছিল, ব্যবহারে এমন একটি বিনীত ভাব ছিল, আলাপে এমন একটি সরস ভঙ্গি ছিল, ভাষণে এমন মিষ্টতা ছিল, বিবৃতিতে এমন মনোমুগ্ধকর শক্তি ছিল, কণ্ঠে এমন সুললিত সুর ছিল, হৃদয়ে এমন আবেগ ছিল, আর প্রাণে পরকে টানিয়া লইবার এমন আকর্ষণ ছিল যে, দুই দণ্ডের জন্যও যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই রজনীকান্তের গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সরল, সরস সহৃদয়তায় বিমোহিত হইয়া তাহার কেনা হইয়া গিয়াছেন— রজনীকান্ত যেন তাহার চিরপরিচিত, যেন তাহাদের কত কালের বন্ধুত্ব, কত দিনের আলাপ। রজনীকান্ত ছিলেন প্রাণের মানুষ, তাই সর্বজনপ্রিয়। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। অমন হাসিভরা, প্রাণভরা মানুষ আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুঃখ হয়, সেই হাসিহাসি মুখ, সেই গাম্ভীর্য-পূর্ণ বিনয়নম্র ভাব আর তো দেখিতে পাইব না : সে সরস উক্তি, সেই কমনীয় কণ্ঠ, সেই ধীরে ধীরে মিষ্ট মধুর বুলি, সেই প্রাণখোলা হাসি আর তো শুনিতে পাইব না ; সেই দুই হাত বাড়াইয়া বুকে টানিয়া আলিঙ্গন, সেই পরের জন্য হৃদয়ভরা ব্যাকুলতা, সেই প্রাণঢালা ভালোবাসা আর তো উপভোগ করিতে পারিব না। কান্না পায় না? চোখ ফাটিয়া কান্না যে আপনি বাহির হয়।

যে-সকল গুণ থাকিলে লোকে জনপ্রিয় হয়, সকলের আপন জন হয়, সেই সকল গুণেই রজনীকান্তের চরিত্র শোভিত ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামর-সাধারণ সকলেই বলিত 'আমাদের রজনীকান্ত' 'আমাদের রজনীবাবু', 'আমাদের রজনী সেন', 'আমাদের কান্তকবি'। এ সৌভাগ্য, এ গৌরব কদাচিৎ কাহারো ভাগ্যে ঘটে আর যাঁহার ভাগ্যে ঘটে তিনি যে সত্যই অমর, তিনি যে প্রকৃতই সকলের মনের মন্দিরে নিত্য সেবা পাইয়া থাকেন, পূজা পাইয়া থাকেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রজনীকান্ত মিষ্টভাষী, সদালাপী, পরোপকারী। রজনীকান্ত আশ্রিতবৎসল, বন্ধুবৎসল, সমাজবৎসল। রজনীকান্ত আমোদপ্রিয়, রহস্যপ্রিয়, ক্রীড়া-কৌতুক-প্রিয়। গল্প বলিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গের চিত্তবিনোদন করিবার রজনীকান্তের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, গান গাহিয়া হার্মোনিয়াম বাজাইয়া ক্রমান্বয়ে ৭।৮ ঘণ্টা কাল লোককে মুগ্ধ স্তম্ভিত করিবার দক্ষতা ছিল রজনীকান্তের অসীম। তাস খেলায়, দাবা খেলায় রজনীকান্ত সিদ্ধহস্ত। রজনীকান্ত হাসির গানে ফোয়ারা ছুটাইতে পারিতেন, মজলিসে চুটকি গল্পের অবতারণায় হাসির লহর তুলিতে পারিতেন, মুখে মুখে ছড়া কাটিয়া, কবিতা রচনা করিয়া, হেঁয়ালি তৈয়ার করিয়া বন্ধুবর্গকে আনন্দ দিতে পারিতেন। রজনীকান্ত সামান্য কথায়, অতি ক্ষুদ্র ঘটনায় হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারিতেন। ব্যঙ্গে, রঙ্গে ও কৌতুকে সুহৃদ্‌বর্গকে ক্রমাগত হাসাইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া কাঁদাইয়া ছাড়িয়া দিতেন। রজনীকান্তের চরিত্রের এই এক দিক।

আবার সেই রজনীকান্তই ভগবৎসংগীত গাহিয়া অতি বড়ো পাষণ্ডকেও কাঁদাইয়া দিতেন। পুরা মজলিস আসর জমজম করিতেছে, হাসির হর্‌রা উঠিতেছে, হাততালির চটপট ধ্বনি হইতেছে, মুহুর্মুহু বাহবা পড়িতেছে, চারি-দিকে আনন্দ, হাসি আর স্ফূর্তি। ধীরস্থির, গম্ভীর-প্রকৃতি রজনীকান্ত নীরবে আস্তে আস্তে সেই জমাট বৈঠকে প্রবেশ করিলেন, মুখে কথা নাই, কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত নাই, সমান-সটান গিয়া একটা হার্মোনিয়াম টানিয়া লইয়া বৈরাগ্যসংগীত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, পরদায় পরদায় গানের সুর চড়িতে লাগিল, সমস্ত গণ্ডগোল, রঙ-তামাসা সহসা থামিয়া গেল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দ অসাড় হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা উৎকর্ণ হইয়া সেই অপূর্ব সংগীত শুনিতে লাগিলেন।

বন্ধুমহলে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে, রজনীকান্ত অতি বিনীত ভাবে, সংকুচিত হইয়া সেই আলোচনায় যোগ দিলেন, এ যেন তাঁহার অনধিকারচর্চা! কিন্তু দুই-চারি মিনিট পরেই সকলে বুঝিতে পারিলেন—দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তিনি যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রেরই আলোচনায় আজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। সেইরূপ ইতিহাস, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি সকল বিষয়েই তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করিতেন, নিজের অনুসন্ধান, নিজের অভিজ্ঞতা সরল ও সহজ ভাবে পাঁচজনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার গুছাইয়া বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া, তাঁহার গভীর গবেষণার

পরিচয় পাইয়া সকলে আশ্চর্য হইত। তখন কিন্তু রজনীকান্ত আর সেই হাস্য-প্রিয়, রহস্যপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয় রজনীকান্ত নহেন, তখন তিনি ধীব, স্থির, গম্ভীর রজনীকান্ত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্যের মনোভাব বুঝিতেছেন, দৃষ্টি নত করিয়া আস্তে আস্তে নিজের বক্তব্য, নিজের যুক্তি প্রকাশ করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে একদৃষ্টে অপবের মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীবে, অথচ বেশ একটু জোরের সহিত স্বীয় মতামত বলিতেছেন।

তুমি শোকে ম্রিয়মাণ, চোখে আঁধাব দেখিতেছ, উদাস-মনে হতাশ প্রাণে গুম হইয়া বসিয়া আছ, অশ্রু জমাট বাঁধিয়া তোমার বুকের ভিতব চাপিয়া বসিয়াছে। রজনীকান্ত তোমাব বিপদের বার্তা শুনিয়াই তোমাব কাছে ছুটিয়া গেলেন, তাঁহার মুখে কথা নাই, আর তোমাব তো কথা কহিয়া আহ্বান করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। সেই গম্ভীর, উদার, প্রশান্তহৃদয় রজনীকান্ত অতি সন্তর্পণে তোমার পাশে গিয়া বসিলেন। একবাব মাত্র চারি চক্ষুব মিলন হইল, তারপর দুইজনে নিবাক হইয়া দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিলে। তুমি বুঝিলে—হাঁ, আমার ব্যথার ব্যথী বটে, বজনীকান্ত প্রকৃতই দবদী! অত শোকের মধ্যেও তুমি একটু শান্তি পাইলে। বজনীকান্তের চবিত্রের এই আর-এক দিক। এ-হেন রজনীকান্ত যে সর্বজনপ্রিয় হইবেন, তাহা তো বিচিত্র নহে! এই সকল বিষয়ের দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিয়া জনপ্রিয় বজনীকান্তকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'বেঙ্গলি' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সুবিখ্যাত রিপোর্টার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার মহাশয় জনপ্রিয় বজনীকান্তের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা প্রথমেই দেখাইতেছি—

'একদিন রাজশাহিব বাব লাইব্রেরিব এক কোণে বিষণ্ণভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছি। এমন সময় রজনীকান্ত আসিয়া কানে কানে বলিলেন, 'মুখ ভারি কেন? ভারি হইলে আমার ওখানে যেয়ো, হালকা করে দেবো।' বাস্তবিকই রজনীকান্তের নিকট গেলে দুঃখের বোঝা, চিন্তার বোঝা একেবারে হালকা হইয়া যাইত। তাঁহার সংসর্গ যেন কি-এক অপূর্ব জিনিস! তাঁহার কবিতা, তাঁহার গান শুনিয়া একেবারে আত্মহারা হইতাম। অতিরিক্ত ভোজনের পর কুচকি-কণ্ঠা-ভরা, পুরাদমে বোঝাই উদরের বোঝা কমাইয়া উহা পুনর্বার বোঝাই করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে রজনীকান্তের শরণাপন্ন হইতাম। নানা-প্রকার রসের কথা, রসিকতাপূর্ণ ভঙ্গিতে বলিয়া হাসির তরঙ্গ ছুটাইয়া দিয়া

তিনি উদরের বোঝাকেও এরূপভাবে হালকা করিয়া দিতেন যে পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইত।

'কত লোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, কত লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে রজনীকান্তের সহিত যেরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তেমন আর কাহারো সহিত হয় নাই। শুধু আমি কেন, অনেক লোকের মুখেই এইরূপ শুনিয়াছি; অনেকেই বলেন, 'রজনীবাবু আমাকে যেমন ভালোবাসেন, তেমন আর কাহাকেও নয়।' যদি রজনীকান্তকে না চিনিতাম, তাহা হইলে আমিও ঐ কথা বলিতে পারিতাম। রজনীকান্ত এ জগতের লোক নন, তাঁহার হৃদয় অপার্থিব ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহার গানে যে ভাবের অভিব্যক্তি, তাঁহার ব্যক্তিত্বেও সেই ভাবেরই প্রকাশ পাইত। এমন হৃদয়-ভরা সরলতা ও প্রেম আমি দেখি নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমি আমার জীবনের আনন্দস্রোতের প্রধানতম নির্ঝরিণীটিকে হারাইয়াছি।'

রজনীকান্তকে রোগশয্যায় দেখিয়া, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'যে রজনীকান্তকে লইয়া আমরা কত রজনী আনন্দসাগরে ভাসিয়াছি, যাঁহার প্রতিভা মূর্তিমতী শ্রীর ন্যায় উৎসবক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার রচিত ব্যঙ্গ- ও তত্ত্ববহুল গীতি রৌদ্র-মিশ্র বৃষ্টির ন্যায় বন্ধুসমাজে অজস্র কৌতুক ও রসধারা বিতরণ করিয়াছে, আজ সেই ভক্ত ও সুগায়ক কবি উৎকট রোগে বাক্‌হীন। বসন্তের কোকিলকে রুদ্ধকণ্ঠ দেখিলে কাহার প্রাণ ব্যথিত না হয়?

অসহ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তকে রোজনামচায় লিখিতে দেখিয়াছি, 'তোমাদের কাছে আমার acting করা সাজে না। সবই তো করছি— হাসি, ঠাট্টা, কবিতা-লেখা, লোকের সঙ্গে আলাপ—সর্বোপরি পুত্রের বিবাহ দিলাম। করছি নি কি? আমি দমে যাই নি। কাশিতে যখন অনবরত রক্তের স্রোত বইতে লাগল, তখন স্ত্রী কাঁদতে লাগল। আমি তো কোনও আর্তনাদ করি নি। যে এনেছে, তাঁর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।' রজনীকান্ত অমায়িক, অক্রোধ, অভিমানশূন্য; যিনি জীবনে কখনো কাহারো প্রতি অযথা বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নাই, কোনও সহচরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেই জোরকলমে লিখিতে দেখি, 'একটা কথা বলি, অকারণ লোকের সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ কোরো না। তাতে নিজের ক্ষতি আছে।' পূর্বে লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত রাখালমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি হাসপাতালে রজনীকান্তের কটেজের পার্শ্বে থাকিতেন। রজনীকান্তের হাসপাতাল-বাস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'রজনীবাবু সাংঘাতিক রোগে উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তথাপি তিনি তাঁহার সহজ প্রফুল্লতায কখনো বঞ্চিত হন নাই। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, আমার হাসপাতাল-বাস সুখেব ছিল। তাঁহাব স্বর্গারোহণেব পর হইতে আমার হাসপাতাল বাস প্রকৃতই হাসপাতাল-বাস হইযাছিল।'

একদিন গুরুগোবিন্দ সিংহেব জীবনীলেখক সুহৃদবব শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযকে সঙ্গে লইযা হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে গিযাছিলাম। দেখিযাছিলাম, তখনও রজনীকান্তেব হাস্যবাসের উৎসেব বেগ একটুও মন্দীভূত হয় নাই, তখনও তিনি কথায কথায হাসিব ঢেউ তুলতে পাবেন। সেই কথাই বলিতেছি। আমাদের দুই জনকে দেখিযা রজনীকান্ত লিখিলেন, 'খুব ব্যথা করছে, তবু তোমাদের দেখে উঠে বসেছি। আব বসন্তবাবু, যদি বাংলা ভাষা এমন কবে অপাত্রে অপব্যবহার কবেন, তবে তো শীঘ্র ভাষাব দৈন্য হবে।' ইতিপূর্বে বসন্তবাবু বজনীকান্তকে একখানি পত্রে লিখিযাছিলেন, 'আপনাকে দেখিযা হিংসা হয বলিযাছিলাম, তাহা কেবল কথাব কথা নহে—বাস্তবিকই হৃদয়ের কথা। যিনি আপনার দুঃখবাশিকে পদে দলিযা ভগবানেব প্রতি একান্ত নির্ভব হইতে পারেন, আব তাঁহার কৃপায কতব্যকে সদাই আঁকডাইযা থাকেন, তিনি কি বাস্তবিকই হিংসাব পাত্র নহেন? আমি আপনাব তোষামোদ কবিতেছি না। আপনাকে দেখিযা ও আপনাব কথা ভাবিযা আমাব হৃদয কযেকবার অত্যন্ত উদ্বেল হইয়া উঠিযাছিল, আপনাকে আলিঙ্গন করিবাব ইচ্ছাও বলবতী হইয়াছিল।'

তাহার পর এই পত্রেব ভাষা সম্বন্ধে রজনীকান্ত পুনরায লিখিলেন, 'ওঁর সব ভাষা, আর আমাদেব সব ডোবা নাকি?' এই সমযে রজনীকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র খাটের ডাণ্ডা ধরিয়া ছত্রির উপব উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি দেখিয়া তাড়াতাডি বলিয়া উঠিলাম, 'পডে যাবে যে।' রজনীকান্ত উত্তরে লিখিলেন, 'আমি যে-বার বি.এ. পাশ করে বাড়ী যাই, সে-বারও গাছে চডে আম পেডেছি, কাজেই সুতঃ পিতৃগুণং ধত্তে।' পরে তিনি বসন্তবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন, 'উনি আমাকে বাংলা ভাষা ঝেড়ে গালাগালি দিয়েছেন। আর ভাষার কিছু বাকি রাখেন নি। আমাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন—সে বড়ো সুবিধে হবে না, কারণ বুকে কেবল একখানা হাড! হিংসার কিছু নাই বসন্তবাবু। আমি

অনেক সময় অনন্যোপায় হয়ে কবিতা লিখি। এতে হিংসা হবে কেন? যে কষ্ট পাচ্ছি, আশীর্বাদ করুন যেন শীঘ্র যাই।' সবশেষে আমাকে লিখিলেন, 'যখন আসবে বসন্তবাবুকে সঙ্গে করে এনো। কি আশ্চর্য! আমি জানতাম যে, "গুরু-গোবিন্দ সিংহ"-এর রচয়িতা পুরুষ মানুষ, এত লাজুক দেখে আমার মনে সন্দেহ হয়েছে। আমিও পুরুষ, উনিও পুরুষ আমাকে দেখতে আসবেন, তাতে লজ্জা কি?' আমরা দুইজনে হাসিতে হাসিতে সেদিন কবির নিকট বিদায় লইলাম।

রজনীকান্ত স্বয়ং লিখিয়াছেন, 'সংগীত আমার জীবনের ব্রত ছিল'। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের কথা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। তবে তাঁহার সংগীতশক্তিসম্বন্ধে দুই চারিজন মনস্বীর উক্তি উদ্ধৃত করিব। রাজশাহি অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক ৺চন্দ্রকিশোর সেন লিখিয়াছেন: 'একবার রজনীকান্তের সহিত আমরা ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ষ্টীমারে উঠিয়াই রজনীকান্ত হার্মোনিয়াম বাহির করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া আরোহী সকলেই রজনীকান্ত ষ্টীমারের যে-ধারে ছিলেন, সেই ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে ষ্টীমার সেই দিকে হেলিয়া পড়িল। সারেঙ তাহা লক্ষ্য করিয়া আরোহীদিগকে একপার্শ্বে দাঁড়াইতে নিষেধ করিবার জন্য জনৈক খালাসিকে পাঠাইল। সে আসিয়া গানের স্বরে এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, নিজের কর্তব্য ভুলিয়া সেও দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। তখন সারেঙ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিল। কিন্তু সেও আসিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইয়া যাওয়ার পর, সারেঙ এই কথা সকলকে বলিয়া আমাদের আরও আনন্দবর্ধন করিল।'

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও এই বিষয়ে লিখিয়াছেন: 'রাজশাহি হইতে দামুকদিয়া যাইবার ষ্টীমার গ্রীষ্মকালে প্রায়ই চড়ায় ঠেকিয়া সমস্ত রাত্রি পথে বন্ধ হইয়া থাকিত। যেদিন রজনীকান্ত ষ্টীমারে যাত্রী থাকিতেন, সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহার ছোট হার্মোনিয়ামটি লইয়া গান আরম্ভ করিতেন, সে দিন সমস্ত সহযাত্রীরা কষ্ট অসুবিধা ক্ষুধা ও সময় নষ্ট হওয়ার ক্ষোভ ভুলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিত ও সুখে রাত্রি কাটাইয়া দিত।'

বরিশাল হইতে অশ্বিনীবাবু লিখিয়াছিলেন, 'রজনীবাবু বরিশালে যে দুই একদিন ছিলেন, তাহার মধ্যেই সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব সংগীত ও প্রাণের আবেগ আমাদিগের প্রাণে যে ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অনির্বচনীয়। আজও তাঁহার মধুর সংগীত গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আর রাজশাহি হইতে কালীপ্রসন্ন আচার্য মহাশয় ব্যাধিগ্রস্ত রজনীকান্তকে লিখিয়াছিলেন : 'May God restore you to us, the sweetest Nightingale of Bengal !'

রজনীকান্তের গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাহাও আমরা ইতিপূর্বে অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনের একটি দিনের ঘটনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, 'পূজার ছুটির পর একবার তিনি বাড়ি হইতে রাজশাহিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন ; আমিও ছুটির শেষে রাজশাহিতে যাইতেছিলাম। দামুক্‌দিয়া ঘাট হইতে প্রত্যুষে স্টীমার ছাড়িয়া অপরাহ্ণকালে রাজশাহি পৌঁছিত। আই. জি. এস্‌ এন্‌. কোম্পানির স্টীমার। আমি চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া দামুক্‌দিয়া গিয়া স্টীমারে চাপিতাম , কিন্তু সে বার সোজা গোরুর গাড়িতে পদ্মাতীরবর্তী আলাইপুর স্টীমার-স্টেশনে গিয়া স্টীমার ধরি। স্টীমারে উঠিয়া দেখি, স্টীমারেব ডেকেব উপর একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া রজনীকান্ত আড্ডা জমাইয়া লইয়াছেন, তাহার গল্প আরম্ভ হইয়াছে। বহু যাত্রী তাঁহার চারিপাশে বসিয়া মুখব্যাদান করিয়া গল্প গিলিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। এমনকি স্টীমারের সারেঙ, সুখানি, ডাক্তার পর্যন্ত তাঁহাকে কাতার দিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জাহাজ পদ্মার প্রতিকূল স্রোতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহা আলাইপুর ছাড়াইয়া চারঘাট, সরদহ প্রভৃতি স্টীমার স্টেশনগুলি অতিক্রম করিল। কত মাল নামিল, উঠিল, কত বিদেশের যাত্রী জাহাজে উঠিল, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল, কিন্তু রজনীকান্তের গল্প শেষ হইল না। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় স্টীমার রাজশাহির ঘাটে নঙ্গর করিল—তখনও গল্প শেষ হয় নাই। সারেঙ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার কিচ্ছা বড়ো সরেস, এ রকম কিচ্ছা আর কখনও শুনি নাই, বড়োই আপশোস যে, শেষ পর্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। যদি জানিতাম, উহা শেষ করিতে দেরি হইবে, তাহা হইলে আমি জাহাজ খুব ঢিমে চালাইতাম।'

রজনীকান্তের চুটকি গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল। তিনি কথায় কথায় চুটকি গল্প বলিয়া বন্ধুবান্ধবের চিত্তবিনোদন করিতেন। আমরা তাহার দুইচারিটি নমুনা দিতেছি।

(১)

রজনীকান্ত লিখিয়াছেন, "রাম ভাদুড়ি মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'বিয়েতে গেলে, দিলে কি ? খেলে কি ? পেলে কি ?' আমি উত্তর করিলাম, 'দিলাম দৌড়, খেলাম আছাড়, পেলাম ব্যথা'।

(২)

প্রশ্ন : বিয়ের সময় তোমার বয়স কত ছিল ?

উত্তর : ১৭ বৎসর।

প্রশ্ন : তোমার স্ত্রীর বয়স তখন কত ছিল ?

উ : বছর বারো।

প্র : এখন তোমাব বয়স কত ?

উ : আজ্ঞে ৩০।৩২ বৎসব।

প্র : এখন তোমাব স্ত্রীর বয়স ?

উ : আজ্ঞে, সে তো প্রায় ৪৬।৪৭ বছরের হবে।

প্র : সে কি বে? তোব বউ তোব চেয়ে হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠল কেমন করে?

উ : আজ্ঞে, ঐ কথাটাই কোনও ভদ্রলোককে আজ পর্যন্ত বোঝাতে পারলেম না ! স্ত্রীলোকের বাড যে একটু বেশি !

(৩)

ডিম প্রায় ২০টে এনে রাজশাহির বাসার উপরে এক কুলুঙ্গিতে রেখে দিয়েছিলাম। আমি একদিন ডিম চাইলাম। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় বেখেছ ?" আমি বললাম, "উঁচুতে আছে, পেড়ে আন"।

(৪)

রামহরি বলিল, 'পণ্ডিতমশাই, আমার এক ছেলের নাম জগৎপতি, এক ছেলের নাম লক্ষ্মীপতি, একজনের নাম শচীপতি, একজনের নাম ধরাপতি। আর এক ছেলে হয়েছে, তার নাম মেলাতে পারিনে।' পণ্ডিতমশাই উত্তর করিলেন, 'কেন, এ ছেলের নাম রাখ—ভগ্নীপতি !'

(৫)

এক সময়ে রজনীকান্ত তাঁহার কোনও বন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তাঁহার সেই বন্ধু-পত্নীর প্রবল জ্বর হয়। তাঁহার বন্ধুটি তাঁহার কাছে আসিয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, 'জ্বর একশো-তিন হইয়াছে'। রজনীকান্ত হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'পূর্বেও এক সতীন ছিল, এখনো ১০৩'।

(৬)

এক বৃদ্ধ বড়োলোক কোনমতে থিয়েটারে যাবেন না। অনেক কষ্টে তাঁকে

নিয়ে গেলাম। তিনি উর্দু খুব ভালোবাসেন। বক্সে গিয়ে বসলেন, আমাকেও টিকিট দিলেন, পাশে বসলাম। তিনি থিয়েটার কি, জন্মে জানেন না। একখানা প্রোগ্রাম দিয়ে গেল। চশমা দিয়ে দেখেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। প্রথমেই জয়পুরের রাজার প্রবেশ। তার কথা শুনেই বৃদ্ধ আমাকে বললেন 'হাঁরে, জয়পুরের রাজা এলো, কথা কয় বাংলা, এ কেমন নাটক!' তারপর স্ত্রীলোকেরা রঙ্গমঞ্চে যখন ঢুকল, তখন বললেন, 'হাঁরে, ওবা কি মেয়েমানুষ?' আমি বললাম, 'হাঁ'। তিনি বললেন, 'আর ও নাটক তো রোজই বাড়িতে অ্যাক্ট করি। মাগিগুলো মাগির কথা কয়, পুরুষগুলো পুরুষেব কথা কয়। ছিঃ ছিঃ! তুই এখুনি চল! আমি আর একদণ্ড বাত জাগবো না'— বলে বৃদ্ধ সটান রওনা দিলেন। কি করি, সঙ্গে সঙ্গে মনঃক্ষুন্ন হয়ে আমিও চলে এলাম।

তাস ও দাবাখেলায় রজনীকান্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি একজন পাকা খেলোয়াড় ছিলেন। বোগশয্যায় শুইয়া থাকিয়াও তাঁহাকে দাবা খেলিতে দেখিয়াছি। কিন্তু কখনো শুনি নাই যে, খেলিতে খেলিতে মাথা গরম করিয়া তিনি কখন চেঁচামেচি করিয়া উঠিয়াছেন বা 'কাদের সাপ কোন্ বাপকে কামড়াইয়াছে' জিজ্ঞাসা করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। দাবাখেলা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'বড়ো কঠিন খেলা, তবে খেলতে খেলতে, দেখতে দেখতে, অনেকটা বোঝা যায় যে, এই যে করতে যাচ্চি— এতে এই হবে। তা সকলে বোঝে না, ভালো করতে গিয়ে মন্দ হয়। কত মন্দ করতে গিয়ে ভালো হয়। Attack করতে গেলাম মাতোয়ারা হয়ে— নিজের পরণে কাপড় নেই; এমন কত হয়। বড়ো exciting খেলা, তা আমরা খেলি না, তাতে খেলার মজা থাকে না। আমি এমন splendid problems জানি যে, দেখলে interest পাবে। আমি পঞ্চরঙ নবরঙ জানি। সে কিছু নয়— মাতই চূড়ান্ত খেলা।'

রজনীকান্ত মুখে মুখে গান বাঁধিতে পারিতেন, কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, তাহার পরিচয়ও পূর্বে দিয়াছি। তাঁহার কৃত দুইটি মাত্র হেঁয়ালি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

অতি মিষ্ট ফল আমি
পাকলে পরে খাবে,
আমার নামের উলটো করলে,
মজা দেখতে পাবে।

সাকারে হই ঊর্ধ্বগামী,
নিরাকারে নীচে নামি,
থাকি রমণীর অঙ্গে,
সাকারে বা নিরাকারে
কাটি দিন নানা রঙ্গে।

রজনীকান্তের দাম্পত্যজীবন বড়ো সুখের ছিল— বড়ো মধুময় ছিল। অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার পত্নীকে মনোমত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন। স্ত্রীকে মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইবার প্রকরণ-পদ্ধতিও তাঁহার বিচিত্র। একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

রজনীকান্তের স্ত্রী বিবাহের পর ২।৩ বৎসর রজনীকান্তের মাতাকে "মা বা ঠাকরুন" বলিয়া ডাকিতেন না, 'আপনি', 'আসুন' 'বসুন' বলিয়া কথাবার্তা কহিতেন। সেই জন্য কবিজননী প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'আমার একটি পুত্রবধূ, সেও আমাকে মা বলে ডাকে না'। কথাটা ক্রমে রজনীকান্তের কানে গেল, তিনি পত্নীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। কড়া হুকুম চালাইলে হয়তো হিতে বিপরীত হইবে, এই ভাবিয়া রজনীকান্ত স্ত্রীকে সেদিন আর কোনও কথা বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিলেন, একটা মতলব আঁটিলেন। কয়েকমাস পরে একবার রজনীকান্ত সপরিবার নৌকা করিয়া ভাঙাবাড়ি হইতে রাজশাহি যাইতেছিলেন। হঠাৎ তিনি নদীগর্ভে পড়িয়া গেলেন, দাড়ি-মাঝিরা সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবু জলে ডুবে গেল'— সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন মাঝি বাবুকে বাঁচাইবার জন্য জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। রজনীকান্তের স্ত্রী উন্মাদিনীর মতো শাশুড়ীর পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, 'মা! কি সর্বনাশ হল মা! মা! কি হবে মা?' সন্তরণপটু রজনীকান্ত নৌকার নিকটে ছিলেন, দুই একটা ডুব দিয়াই তিনি নৌকার উপর উঠিলেন এবং স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কেমন, আর তো 'মা' বলতে মুখে আটকাবে না? এবার থেকে মাকে 'মা' বলে ডাকবে তো?' তারপর তাহার মতলবের কথা, পূর্ব হইতে মাঝিদের সহিত তাঁহার পরামর্শের কথা— একে একে সকল কথা মাকে ও পত্নীকে বলিলেন। মা বুঝিলেন, তিনি রত্নগর্ভা, পত্নী লজ্জায় জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ শিক্ষাপদ্ধতি বিচিত্র নহে কি?

অতি সামান্য ঘটনায় রজনীকান্ত রসের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তুচ্ছ ব্যাপারে

যে-কোনও লোককে লইয়া বসিকতা করিতেন। একদিনের একটি ঘটনা বলিব।

রজনীকান্তেব রাজশাহিব বাটীর বৈঠকখানায় একখানি আয়না, চিরুনি ও বুরুশ প্রায়ই পড়িয়া থাকিত। একদিন রজনীকান্তের একজন প্রাচীন মুসলমান মক্কেল মকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার ঘবে আসিলেন। বজনীকান্ত নিবিষ্টচিত্তে বৃদ্ধ মুসলমানের কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ আয়নাখানি হাতে কবিয়া মুখ দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে বুরুশখানি তুলিয়া লইয়া দাড়ি আঁচড়াইতে শুরু কবিলেন। রজনীকান্ত একবার মুখ তুলিযা বৃদ্ধের দিকে চাহিলেন এবং মৃদু হাস্য করিযা পরক্ষণেই আবার দলিলপত্র পড়িতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মুসলমান তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে, বজনীকান্ত গম্ভীর ভাবে উত্তব করিলেন, 'আপনি যে বুরুশ দিয়ে দাড়ি আঁচড়াচ্ছেন, ওটা কোন্ 'জানোয়ারেব রুমায়' তৈয়াবি জানেন কি ? যার নাম শুনলে আপনারা কানে আঙ্গুল দেন—!' বৃদ্ধ মুসলমান তৎক্ষণাৎ বুরুশখানি দূরে নিক্ষেপ কবিযা 'তোবা তোবা' শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে পাকা দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিলেন। রজনীকান্ত নির্বিকার চিত্তে, গম্ভীরভাবে পুনবায় কাগজপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন—যেন কোনও কিছুই ঘটে নাই।

আব দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। রজনীকান্ত কলাবিদ্, বজনীকান্ত রসবিদ্, রজনীকান্ত রসিক ছিলেন। রসিকেব কাছে ভিতব-বাহির তো একই বস্তু—উভয় উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া দুইয়ে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া আছে। এই বিশ্বসৃষ্টি, এই অনন্ত জগৎ অনন্ত কাল হইতে আপনা-আপনি স্ফুরিত হইয়া বিকশিত হইয়া সেই সকল সৌন্দর্যের আধার, সকল রসের পুঞ্জীভূত কেন্দ্রের প্রতি পাগল হইয়া ছুটিতেছে, তবু আজও সেই রসেব নাগরের নাগাল পায় নাই। প্রকৃত কবি—যথার্থ রসিকও সেইরূপ আপন-ভোলা হইয়া বিশ্বের অনন্ত প্রবাহের সহিত নিজের জীবনেব ধারা মিলাইয়া দিয়া, এই জগৎ যে মিথ্যা নহে—সে যে সেই প্রেমময়ের, সেই রসময়েব আনন্দবাজার—ইহা অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করেন এবং ইহারই ভাব ভাষার মধ্য দিয়া, কবিতার মধ্য দিয়া, গানের ভিতর দিয়া, সুরের ভিতর দিয়া জগদ্বাসীর প্রাণে ঢালিয়া দেন। রজনীকান্ত এই ভাবেব রসিক ছিলেন। তিনি প্রতি অণুরেণু ধূলিকণা হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুতে সেই রসময়ের রসসৃষ্টির চরম পরিণতি উপভোগ করিতেন, এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টাকে রসময় বলিয়া প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতেন ; তাই রজনীকান্ত প্রকৃত রসিক হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার রসপ্লাবনের মুখে অমঙ্গল ভাসিয়া যাইত, অকল্যাণও দূরে সরিয়া পড়িত। তিনি সকলকেই সেই রসময়ের রূপান্তর মনে করিয়া প্রাণের সহিত কোল দিতে পারিতেন, হৃদয় ভরিয়া ভালোবাসিতে পারিতেন। সেই জন্য তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, সকলের আপনার লোক। এই ভাবের ভাবুক, এই রসের রসিক জগতে দুর্লভ। তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

বড় বড় জন রসিক কহয়ে,
রসিক কেহ তো নয়।
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিতে গুটিক হয়॥

বুঝিলাম রজনীকান্তের প্রাণ ছিল, তিনি প্রাণের মানুষ। সেই প্রাণের টানে তিনি পরকে আপন করিতেন। আর সর্বোপরি ছিল তাঁহার বিনয়। যথার্থই বৈষ্ণব বিনয়—সেই তৃণ অপেক্ষা নীচ জ্ঞান, সেই ফুলের চাইতে কোমল প্রাণ। 'বড়ো হবি তো ছোট হ' কথাটার প্রকৃত মর্ম তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার চরিত্রে এই ভাবটিই অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে তিনি যেন—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥

তাই তাঁহাকে হারাইয়া বাঙালি বলিতেছে, 'অমন মানুষ আর হবে না'। এই অভাবটাই বাঙালি বেশি করিয়া অনুভব করিতেছে। তাঁহার মতো কবি আগেও ছিলেন, পরেও হয়তো হইবেন , অমন প্রাণের মানুষও আগে দেখা যাইত, কিন্তু বাঙালির পোড়া অদৃষ্টে আধুনিক সমাজে এখন একান্ত দুর্লভ। তাই আজ বাঙালি রজনীকান্তের তিরোভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—অমন প্রাণের মানুষ, মনের মানুষ, অমন প্রাণমাতানো মনভোলানো মানুষ, অমন অহংকারশূন্য অভিমানশূন্য মানুষ, অমন সরল সহৃদয় মানুষ, অমন রসের সাগর, প্রাণের পাগল আর হইবে না।

৬

সাধক রজনীকান্ত

যে দেশের পল্লী-নগর, হাট-মাঠ, পথ-ঘাট সাধনার ইতিহাসে সাধকের কাহিনী ও গানে ভরা, যে দেশের মাটি শত সাধকের পদরেণুস্পর্শে পবিত্র—সাধনার সেই পুণ্যপীঠে ভগবৎকৃপালব্ধ কবি গুরুপ্রসাদেব পুত্র রজনীকান্তের জন্ম। আর তাঁহারই জন্মের পূর্ব হইতে গুরুপ্রসাদ বহু সাধকসংস্পর্শে বৈষ্ণবসাধনায় মগ্ন ও 'পদচিন্তা-মণিমালা'-রচনায় রত। এই পবিত্র সময়েই রজনীকান্ত ভূমিষ্ঠ হন। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতাব ভগবদ্ভক্তি, অচলা নিষ্ঠা, জীবে দয়া, নামে রুচি প্রভৃতি গুণরাজি পুত্রের জীবনকে শৈশব হইতে ভক্তিব পথে পবিচালিত করিয়াছিল। পিতার এই সমস্ত সদ্গুণ উত্তরকালে একে একে পুত্রে বর্তিয়াছিল। এইরূপেই রজনীকান্তেব সাধনার ভিত্তি গডিয়া উঠিয়াছিল, আব এই ভিত্তির উপর সাধনার মন্দিব নির্মাণ করিয়াই রজনীকান্ত শেষ জীবনে সাধকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

গুরুপ্রসাদ বৈষ্ণবসাধক ছিলেন; বৈষ্ণবসাধনার—কেবল বৈষ্ণবসাধনারই বা বলি কেন, সকল ধর্ম-সাধনার যাহা মূল সূত্র, সেই সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সাধনায় মনঃসংযোগ করেন এবং তাহাতে সিদ্ধ হন। তিনি ভগবৎকৃপা-বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রাণে প্রাণে জানিতেন, শ্রীভগবান কৃপাময় আর সেই কৃপা-ময়ের কৃপা না হইলে মানুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। পিতার ন্যায় রজনীকান্তও সে-তত্ত্বটি বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি তাহাই সার জানিয়া আকুল-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন 'হে নাথ, মামুদ্ধর। ওহে কলুষহরণ, আমার কলুষ হরণ কর। ওহে নিখিলশরণ, আমার শরণাগতি স্বীকার কর। ওহে দীনদয়াল, আমায় দয়া কর। প্রভো, তুমি করুণা কর। তোমার করুণা ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি নাই।' কিন্তু তিনি শুধু দীনদয়ালের করুণা ভিক্ষা চাহিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কারণ তিনি স্থির জানিতেন, 'তুমি মোরে ভালোবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস'। আর চাই কি? শ্রীভগবান্ আমাকে ভালোবাসেন, আর তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আমার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন, আমাকে কৃপা করেন, এ যে একটা মস্তবড়ো আশা ও আশ্বাসের কথা। মনের এই যে অকপট ও অটল বিশ্বাস—ইহা রজনীকান্ত তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ইহারই জোরে তিনি একদিন জোর গলায় গাহিয়াছিলেন, 'কেন বঞ্চিত হব চরণে?' আমি যখন

আশায় আশায় বুক বাঁধিযা বসিয়া আছি, তখন হে আমার বাঞ্ছিত, জীবনে না পাইলেও মরণে তোমাকে পাইবই।' প্রকৃতপক্ষে ঘটিযাছিলও তাই। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিযা জীবন-মরণেব সন্ধিস্থলে রজনীকান্ত শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন। তাহাব সারা জীবনের শত বাধাপ্রাপ্ত সাধনা এইখানে, এই সন্ধিস্থলে পৌছিয়া পূর্ণ ও সিদ্ধ হইয়াছিল।

কথাটা স্পষ্ট কবিযা, একটু বিস্তারিতভাবে বলিতেছি। ভগবৎকৃপাবিশ্বাসী রজনীকান্ত হৃদযেব পরতে পরতে শ্রীভগবানের কৃপা, তাহার অযাচিত করুণা উপলব্ধি করিয়া তাহারই চবণ মকবন্দ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাই তিনি কবিতার ভিতর দিয়া নিজের মনের ভাবকুসুমগুলিকে ভক্তিচন্দনে চর্চিত করিয়া তাহারই শ্রীচবণের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছিলেন। কিন্তু কে যেন বিরোধী হইযা, এই ভক্তিসাধনার পথ হইতে রজনীকান্তকে 'কণ্টকবনে' টানিয়া লইয়া গিযা তাঁহাব 'পাথেয়' কাড়িযা লইতেছিল, কে যেন 'দীর্ঘ প্রবাস-যামিনীর' ঘোর অন্ধকাবে তাহাকে ডুবাইতেছিল, কে যেন 'মাযামোহে'র শিকলে তাঁহার হাত-পা বাঁধিযা সংসারের বেড়াজালে তাহাকে বন্দী করিতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীভগবানেব চরণ-সরোজ হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছিলেন। সাধনার পথে অগ্রসব হইযা, সেই 'অমৃতবারিধি' শ্রীহরিব অগাধ প্রেমসিন্ধুনীরে ঝাঁপ দিবার জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইযা উঠিতেছিল, কিন্তু 'দারা-সুত-সুখ-সম্মিলনে' মিশিয়া তাঁহার এ ব্যাকুলতা নিষ্ফল হইতেছিল। অবস্থা যখন এইরূপ, সাধনার পথে যখন পদে পদে শত শত বাধা উপস্থিত হইযা বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল, তখন রজনীকান্ত নিবাশ ও কাতর হইযা শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন করিলেন—

বড়ো আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে
একবিন্দু বারি দিব চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্বল ধারা
করুণা-কল্লোলে তারে ডাক একবার॥

তিনি বুঝিলেন, ভগবানেব করুণা ভিন্ন তাঁহার এ সাধনা সিদ্ধ হইবার নয়। তাহার করুণার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে না পারিলে, তাঁহারই করুণাধারায অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত মলিনতা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে, এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। অকপট ভক্ত তাই আপনাকে সেই করুণাময়ের চরণে উৎসর্গ করিলেন, কায়মনপ্রাণে তাঁহারই করুণার ভিখারি হইয়া সকল প্রকার ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশাবিসর্জনে কৃতসংকল্প হইলেন।

গলদেশে অস্ত্রোপচারের পূর্বে রজনীকান্ত শ্রীভগবানের দর্শন পাইতেন, কিন্তু সে ক্ষণিকদর্শন। তাঁহার রচনার ভিতরে এই দর্শনের পরিচয় ও বিবৃতি পাই—

কোন্ শুভ গ্রহালোকে, কি মঙ্গলযোগে
চকিতে যেন গো পাই দরশন।
সেই ক্ষুদ্র এক পল, কৃতার্থ সফল
রোমাঞ্চিত তনু, ঝরে দু নয়ন॥

এই যে চকিতের জন্য তাহাকে পাওয়া, তার পর তাঁহাকে হারাইয়া ফেলা—এই যুগপৎ ঘটনায় তাহার মনে যে ভাবের উদয় হইত, তাহার রচিত নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙক্তি পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

আঁখি মুদি আমার নিখিল উজল
আঁখি মেলি আমার আঁধার সকল,
কোন পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই
তুমি জান গো সাধক শরণ।

তব যাত্রা সনে যদি পায় লোপ
ধরণীর মায়া, নাহি রয় ক্ষোভ,
সবাই ফিরে আসে, ভাঙা হৃদি পাশে
কেবল হারাইয়া যায় সাধনার ধন।

সেই হারানিধিকে ফিরিয়া পাইবার আকুল আবেগ রজনীকান্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার বিরহ রজনীকান্ত আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সেই সাধনার ধনকে ধরিবার জন্য, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য, অন্তরের অন্তরে তাঁহার চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য কাতরকণ্ঠে কান্ত তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলেন—

ওহে প্রেমসিন্ধু, জগদ্‌বন্ধু
আমি কি জগৎ ছাড়া হে,
এই গভীর আঁধারে অকূল পাথারে
একবার দেহ সাড়া হে।
(কেন সাড়া দেবে না?)
(কাতরে পাপী ডাকে যদি, কেন সাড়া দেবে না?)

কবি বিদ্যাপতি একদিন যে কথা বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, সেই—

তুহুঁ জগন্নাথ জগমে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুই ছার।

এ যেন তাহারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু এখানে তাহা আরও সুন্দর, আরও মর্ম্মস্পর্শী। তুমি যে জগন্নাথ, জগতের পতি— আর আমি যে তোমারই এই জগতের মাঝখানে রহিয়াছি, তখন কেন আমার ডাকে, আমার আকুল আহ্বানে, হে জগন্নাথ, তুমি সাড়া দেবে না? হাসপাতালের রোজনামচার মধ্যেও এই সুরের ধ্বনি দেখিতে পাই, 'সে জগৎ ভালোবাসে, আমাকে ভালোবাসে না? তাকে ভুলে-ছিলাম, তা সে ছেলেকে ছাড়বে কেন?'

সংসারতাপে তাপিত চিত্তকে শ্রীভগবানের করুণাচন্দনের প্রলেপে শীতল করিবার জন্য রজনীকান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই চিরশরণের শরণ লইবার জন্য তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছিলেন—

রবে, তোমাতে হযে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলকস্পন্দনে।

এই নির্ম্মল ও কুণ্ঠাহীন আত্মনিবেদন তাঁহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল, তাই আবেগে তাহার লেখনীমুখে বাহির হইয়াছিল—

প্রভাতে যখন পাখি নীড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহারসংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর মাঝে,
দুর্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে;
কি তীব্র উৎকণ্ঠা লযে, আশার আশ্বাসে বাঁচে।
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেমনি করে মাকে চা'ব
সুখ দুঃখ ভুলে যাব, হায় রে, সে দিন কোথা আছে!
হয়ে অন্ধ, হয়ে বধির, মা মা বলে হব অধীর,
দু-নযনে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙালের সাজে।

এই ব্যাকুলতার ধারা রজনীকান্তের প্রাণ হইতে স্বতঃই প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, এইভাবে ডাকিতে না পারিলে, মাকে ঠিক ধরিতে পারা যাইবে না।

হয়ে অন্ধ, হয়ে বধির, মা মা বলে হব অধীর,
দু-নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙালের সাজে।

অন্ধ ও বধির হইয়া, মা মা বলিয়া মাকে ডাকিয়া অধীর হইতে হইবে, আর দীন-হীন কাঙালের সাজে কাঁদিযা কাঁদিয়া তাঁহাকে ডাকিযা ডাকিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। যেটি আমাদের দেশের সনাতন সুর, যে ভাবধারা চারিশত বৎসব পূর্বে একদিন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যেব প্রেমতরঙ্গে বান ডাকাইযাছিল, সেই সুরটি রজনীকান্তেব হৃদযের তারে তারে ঝংকৃত হইযা উঠিল, সেই যে—

নযনং গলদশ্রুধাবযা বদনং গদ্গদরুদ্ধযা গিবা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

'হে ঠাকুর, কবে তোমার নাম কবিতে করিতে নযনধারায আমার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইযা যাইবে, গদ্গদধ্বনি উত্থিত হইযা বাক্যরুদ্ধ হইবে, আব পুলক-রোমাঞ্চে সমস্ত দেহ ভরিযা উঠিবে?' এই তো সাধকের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা। এই ভাবে ভাবিত হইয়া সাধনা কবিতে না পাবিলে তো সিদ্ধ হওয়া যায না, তাঁহাব দর্শন পাওযা যায না।

সত্যসত্যই সহজে তাঁহাব দেখা মিলে না। যে আপনার জন, তাহাকেও সে সহজে দেখা দেয না—কেন না সে বড়ো 'নিজজন-নিঠুব', আপনাব জনকে সে বড়ো কাঁদায়। শ্রীমতী বাধিকাব সে ভিন্ন অন্য গতি ছিল না, কিন্তু শ্রীমতীকে সে কতই না কাঁদাইয়াছে। সে ছাড়া অন্য কাহাকেও পাণ্ডবেরা জানিত না, শযনে-জাগরণে, বিপদে-সম্পদে তাঁরই নাম তাদেব জপমালা ছিল, আর তাবাও তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল, কিন্তু সেই পাণ্ডবদেব সে কতই না কষ্ট দিযাছে। সে জানে, যে আপনার জন— তাহাকে খুব কাঁদাইতে হয—কষ্ট দিতে হয, তবে তাহাব ভক্তি ঐকান্তিকী হইবে, অহেতুকী হইবে; আমার প্রতি তাব মতি অচলা থাকিবে। নতুবা পাঁচ বছবের দুধের ছেলেকে বনে বনে ঘুরাইয়া, কত কাঁদাইয়া, পদ্মপলাশ-লোচনদর্শনলালসায় ব্যাকুল কবিয়া শেষে সে দেখা দিবে কেন? না কাঁদিলে, হৃদয় একান্ত ব্যাকুল না হইলে, তাঁহাকে তো পাওয়া যায় না, তাই সে কাঁদায়। তাঁকে পাবার জন্য মানবের মনে সেই তো করুণাবশে ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দেয়। বহু সুকৃতি ও জন্মান্তরীণ সাধনার ফলে রজনীকান্তের মনে এই একান্ত ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল। তাই হাসপাতালে রোগশয্যা গ্রহণের পূর্বে, স্বাস্থ্যসুখসম্পদের মাঝখানে বসিয়া একদিন তিনি কাতরকণ্ঠে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন—

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে;

(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি
(অমনি) দুঃখ দিয়ে দাও শিক্ষে।
মত্ত হয়ে সদা পুত্র-পরিবারে,
ধনরত্ন-মণিমাণিক্যে,
(আমি) ধুয়ে মুছে ফেলি তোমাব নামগন্ধ
মজে তাব চাকচিক্যে।
নিলাজ হৃদয ভেঙে সব লও,
দুঃখ দিযে দাও দীক্ষে;
(আমাব) বাধাগুলো নিযে অভযচরণ,
(আব) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে।

রজনীকান্তেব দযাল শ্রীহরি তাহার এ প্রার্থনা মঞ্জুব কবিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য-সুখসম্পদ হবণ কবিযা কলকণ্ঠ বজনীকান্তকে রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া দিলেন—তাঁহাকে সকল রকমে কাঙাল কবিযা তাঁহার স্কন্ধে ভিক্ষাব ঝুলি তুলিয়া দিলেন। বাক্য-হাবা কবিব নীবব আত্মদান গ্রহণ কবিবাব জন্য ভক্তের ভগবান ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহলৌকিক সুখদুঃখেব প্রকৃত অনুভূতি বজনীকান্তেব অন্তরের অন্তরে পবিস্ফুট কবাইয়া দিবাব জন্য অন্তর্যামী ঠাকুর দুঃখযন্ত্রণাব, অভাব-অনটনের শত চাপে কান্তকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাময়েব ইচ্ছা হইল, রজনী-কান্তের হৃদয ভবিযা সেই সুব উঠুক, সেই—

আমি, সংসারে মন দিয়েছিনু
তুমি, আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি, সুখ বলে দুঃখ চেয়েছিনু
তুমি, দুঃখ বলে সুখ দিয়েছ।

তাই রজনীকান্ত যখন সকল বকমে নিরুপায় হইলেন, সকল রকমে কাঙাল হইলেন, যখন স্থিব বুঝিলেন, পার্থিব যশ, অর্থ, মান, সম্পদ এই শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ইহাদেরই মায়ায় আমি অহমিকা-কূপে মগ্ন হইয়া পড়িতেছি, তখনই দেহাত্মিকা মতিকে ভগবদাত্মিকা করিবাব জন্য গাহিয়া উঠিলেন—

এই, দেহটা যে আমি সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর।

তিনি বুঝিলেন, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইলে তাঁহাতে একান্ত নির্ভর করিতে হইবে, একমাত্র সেই অনন্যশরণের চরণেই শরণ লইতে হইবে, তাঁহারই ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিশ্বরূপ-দর্শনমুগ্ধ অর্জুনের ন্যায় তাঁহারই উদ্দেশ্যে বলিতে হইবে—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

বিশ্বের পূজিত দেব ঈশ্বর যে তুমি
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতেছি আমি,
পিতা পুত্রে, সখা মিত্রে, বান্ধবে বান্ধব
ক্ষমা করে যথা আর সহ্য করে সব,
সেইরূপ ক্ষমা কর আমার যে দোষ
প্রিয় ভাবি সহ্য কর, না করিয়ো রোষ।

ঠিক এই ভাবের কথাই তখন রজনীকান্তের লেখনীমুখে বাহির হইয়াছিল,—

হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ
কর তোমাগত প্রাণ।

'আমার এই অস্থির চঞ্চল প্রাণকে দোহাই ঠাকুর, তোমাগত করিয়া দাও' এই উঁচু তারে সুর বাঁধিয়াই রজনীকান্ত কুরুসভামধ্যবর্তিনী নির্যাতিতা ও বিপন্না দ্রৌপদীর ন্যায় সেই নিখিলশরণের চরণে চিরশরণ লইলেন। তিনি বলিলেন, 'রাখ ভালো, মার ভালো, চরণে শরণাগত'। ঐতিহাসিকপ্রবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কেও তিনি অন্তিম সময়ে ঠিক এই কথাই জানাইয়াছিলেন—

একান্ত নির্ভর আমি
করেছি দয়ালে,
রাখে সেই, মারে সেই
যা থাকে কপালে।

এইখানে পৌঁছিয়া রজনীকান্তের সাধনা সিদ্ধ হইল—এইখানেই, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে—রজনীকান্ত সেই সাধকশরণের দর্শন পাইলেন। তিনি স্থির জানিতেন—শুধু জানা নয়, প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন—

ও তার কাঙাল-সখা নাম
কাঙালবেশে দেয় দেখা
আর পুরায় মনস্কাম।

তাই কাঙাল হইযা সেই কাঙালসখাকে পাইলেন—কিন্তু যে মূর্তিতে তিনি দেখা দিলেন, সে বড়ো কঠোব মূর্তি—সে তাঁহাব শাসনেব রূপ। তাঁহার দয়ালের—তাঁহাব সেই কাঙালসখাব সেই ভযাবহ মূর্তি দেখিযা বজনীকান্ত ভয় পাইলেন না, তিনি শ্রীভগবানের চবণযুগল ধবিযা পডিযা বহিলেন।

একখানি পত্রে তিনি ববিশালেব অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশযকে এই দর্শনের পবিচযকথা এই ভাবে বিবৃত কবিযাছিলেন, 'আমাকে বড়ো মারছে। কি বলে, আব মারে। তা মেরে ধবে যা-হয কবুক আমি আব কাঁদি না। উঃ আঃ কিছুই কবি না। কতদিনই বা মাববে? মাবতে মাবতে হাত ব্যথা হযে যাবে। আমি কিছু বলব না। যা-হয তাই হোক। যা-হয তাই হোক। দেখি না, কোথায় নিযে যায। আমি তো আব ধুলোতে নামবোই না। ঘাড ধবে যদি না পাঠায়—তখন কাঁদব। এ কান্না শুনতে হবেই। আমাব শবীরে আব কিছু রাখল না। তা কি হবে? এটা তো ফাঁকা বই তো নয? তবে আর কি হবে? আমার মাথায় একটা আর বুকে একটা পা দিযেই থাকে, আমি দেখতে পাই। পা-ও দেয়, মারেও। তবে এক সময বেশিক্ষণ নয, ছেড়ে দেয়। তখন অন্য অন্য কাজ করি, কিন্তু পা দিয়েই থাকে—নামায না।'

কি সুন্দর অনুভূতি! কি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি! কোন্ সাধনায়—জন্ম-জন্মান্তরের কোন্ সুকৃতিবলে বজনীকান্ত এই অনুভূতির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমবা বলিতে পারি না।

রজনীকান্তেব এই পত্র সম্বন্ধে ভক্ত অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছিলেন—"নিজের বিষয় কি কথাই লিখিয়াছেন। এমন মানুষই তিনি ছিলেন—'আমার মাথায় একটা আর বুকে একটা পা দিয়েই থাকে, আমি দেখতে পাই। পা-ও দেয়, মারেও।' এমন কথা অমন লোক বই কেউ কি লিখতে পারে?"

বাস্তবিক এই ভয়াবহ মূর্তি দেখাইয়াই ভগবান যেন রজনীকান্তকে 'তদেব'—সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধাবী চতুর্ভুজমূর্তি দেখাইয়া বলিলেন—

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥

ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ হেরিয়া আমার,
ব্যথিত বিমুগ্ধ যেন, হইও না আর,
ভয়শূন্য প্রীতমনে দেখ পুনরায়,
গদাচক্রধারী সেই কিরীটি আমায়।

আর শ্রীভগবানের এই মধুর, এই ভক্তজনহৃদয়রঞ্জন মূর্তি দেখিয়াই রজনীকান্ত বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'এ কি বিকাশ। এ কি মূর্তি প্রেমের। সখা, প্রাণবন্ধু, প্রাণের বেদনা কি বুঝেছ ?'

হাসপাতালে নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তের এই ভগবদ্ভক্তি ও ঐকান্তিক ঈশ্বরবিশ্বাস দেখিয়া বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। একবাক্যে সকলের কণ্ঠ হইতে এই কথাই কেবল বাহির হইতেছিল, 'সাধনার এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া আমরা ধন্য হইলাম'। হাসপাতালে রজনীকান্তের এই অপূর্ব সাধনার পরিচয় পাইয়া লোকমান্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় রজনীকান্তকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা এইখানে তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছি, 'ভগবান আপনাকে লইয়া যে লীলা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া অবাক হইতেছি। লীলাময়ের লীলা আপনি এ রোগ-কষ্টের অবস্থায় যেরূপ বুঝিতেছেন, এরূপ বুঝিবার লোক তো পাই না। আপনি ধন্য—এরূপ কঠোর যাতনার মধ্যে আনন্দনির্ঝরের মধুরতা অনুভব করিতেছেন। দেবগণ আপনাকে আশীর্বাদ করিতেছেন বলিয়াই আপনি এমন ভাগ্যধর। আপনাকে যে দর্শন করিয়াছি ও স্পর্শ করিয়াছি, ইহা মনে করিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইতেছি। কষ্ট আর যাতনা কতটুকু ? আনন্দের তো ওর নাই। আনন্দময় যে আপনাকে যাতনার মধ্যে তাহার মাধুরী দেখাইয়া কৃতার্থ করিতেছেন, ইহারই চিন্তনে আশ্বস্ত হইতেছি। যাঁহার চরণে আপনার মধুময় প্রাণ বিকাইয়াছেন, তিনি আপনার চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে মধুবর্ষণ করিতেছেন। চিরদিন আপনি অমিয়সাগরে ডুবিয়া থাকুন, আর বঙ্গদেশবাসিগণ আপনার প্রাণনিষ্ঠ্যূত দুই-এক বিন্দু পাইয়া আপনি যেরূপ আনন্দসম্ভোগ করিতেছেন, তেমনি করিতে থাকুন। সমস্ত দেশ তদ্দ্বারা সিক্ত, পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হউক।'

হাসপাতালে রজনীকান্ত যখন রোগশয্যায় শয়িত তখন পথে-ঘাটে, সভায়-

মজলিসে, সংবাপত্রে ও সাময়িকপত্রে, লোকের মুখে প্রায়ই রজনীকান্তের কথা উঠিত। হাসপাতালে আসিবার আগে তাঁহার নাম এত শোনা যায় নাই, তাঁহার কথা এরূপভাবে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে নাই। কেন, তাহার একটি সুন্দর উত্তব আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিযাছিলেন—'অনেকে বলেন, বজনীকান্তের নাম পূর্বে তো এত শোনা যায নাই, হঠাৎ তাঁহার এত নাম হইল কেন? যাঁহাবা রোগশয্যায় কবিকে একবার দেখিযাছেন, তাঁহারাই কেবল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবেন। যে কারণে বাজবাজেশ্বব সাধু ভক্তেব চবণে মাথাব মুকুট রাখিযা সম্মান করেন, সেই কাবণেই বজনীকান্তের আজ এত সম্মান। ভগবানকে অন্তবে ধারণ করিয়াই ভক্ত জগতে পূজিত, সম্মানিত।'

বাস্তবিকই হাসপাতালে বোগশয্যায় বজনীকান্ত ভগবানকে অন্তরে ধারণ করিয়া সাধাবণেব কাছে সম্মানিত—পূজিত হইযাছিলেন। তাঁহাব এই সাধনাব ভাব, ভক্তিব ভাব দেখিযাই কবীন্দ্র ববীন্দ্রনাথ হইতে আবম্ভ কবিযা বহু লোকে বলিযাছিলেন, 'আপনাকে দেখে পূজা কবতে ইচ্ছা যাচ্ছে'।

মানুষেব আধিব্যাধি, ক্ষুধাতৃষ্ণা, অভাব-অনটন, জ্বালাযন্ত্রণা এই সমস্ত উপসর্গের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ কবিতে হইলে যে-মহৌষধি সেবন করিতে হয়, সেই মহৌষধি পান কবিযা বজনীকান্ত ইহাদেব কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। 'এই ক্ষুধা-পিপাসা তোমাব চরণে দিলাম' বলিয়া যেদিন তিনি শ্রীভগবানেব চবণে তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা অর্পণ কবিযাছিলেন, সেইদিন হইতে তিনি ভগবৎপ্রেমসুধারূপ মহৌষধি পানেব অধিকাবী হইয়া আত্মাকে ক্লেশমুক্ত করিয়াছিলেন। আত্মাব এই যে মুক্তাবস্থা—ইহা বজনীকান্ত লাভ করিয়াছিলেন এবং এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে সাধকের আত্মা যে দেহ ও তাহার সংশ্লিষ্ট কষ্টাদি হইতে একেবাবে নির্মুক্ত হইয়া যায আমাদের সাধক রজনীকান্ত তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়াই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আত্মাব এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষেব আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'

পুণ্যচরিত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, 'বুঝিলাম কবি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অমৃতে পৌঁছিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন! আমি যতবারই সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, ততবারই তাঁহার আত্ম-

সংযম ও বিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।··· কবি যে দিন তাঁহার 'দয়ার বিচার' গান করাইয়া শুনাইলেন, সেদিনের কথা এ জীবনে ভুলিব না।' তারপর রজনীকান্তের সাধনার কথা বলিতে গিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, 'এক কথায় বলিতে হইলে, রজনীকান্ত সাধক ছিলেন বলিলেই যথেষ্ট হইল! কবিতাপুষ্প চয়ন করিয়া রজনীকান্ত আবেগের ধূপধুনাতে আমোদিত করিয়া, আজ কয়েক বৎসর হইল, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে সাধনা-উৎস প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শুধু কবির স্বীয় হৃদয়ের পবিত্র নিলয়টি অধিকতব পবিত্র কবিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহা বঙ্গবাসীর অন্তস্তলে প্রবেশ কবিয়া সরল সাধনাব একটি যুগ আনযন কবিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে, কেন না পাঠক হয়তো এতাদৃশ প্রশংসাবাদকে কোনরূপ অপকৃষ্ট আখ্যায় আখ্যাত করিতে পারেন। রজনীকান্ত ধর্মপ্রচারক নহেন, অথচ নব্যবঙ্গে সরল সাধনার যুগ আনয়ন করিয়াছেন, শুনিলে স্বতঃই মনে সংশয়-সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু কথাটার মীমাংসা করিতে হইলে, রজনীকান্ত কোন্ শ্রেণীব সাধক, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইবে। বঙ্গে এমন কোনও সন্তান নাই, যিনি সংগীতজ্ঞ সাধু রামপ্রসাদকে সাধক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন, বরং 'সাধক রামপ্রসাদ'—ইহাই বাংলার প্রতি গৃহে রামপ্রসাদেব আখ্যা। তাঁহার সাধনার উপকরণ সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহা আর-কিছুই নহে—গভীব আবেগপূর্ণ সংগীতই তাঁহার ফুলবিল্বপত্র, প্রেমাশ্রু তাঁহাব গঙ্গোদক, তন্ময়তাই তাঁহার 'আনন্দম্'। কবি রজনীকান্তও এই শ্রেণীর সাধক! যাঁহারা এই সাধু ও সজ্জন কবিবরকে দেখিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার জীবনের সুখদুঃখ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার আর্থিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ববিধ অবস্থা জ্ঞাত, যাঁহারা এই বিনীত, উদার, ধর্মপ্রাণ কবিপ্রবরের দয়াদাক্ষিণ্য-সরলতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত, তাঁহারা একবাক্যে সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, রজনীকান্ত সাধক ছিলেন। সংসারে থাকিয়া ধনরত্নস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া, কি প্রকারে শিক্ষা-জ্ঞান-সমাজসংস্কারে জীবন ঢালিয়া দেওয়া যায়—রজনীকান্ত তাহার উদাহরণ'।

যে অপূর্ব সম্পদের অধিকারী হইয়া রজনীকান্ত জনসাধারণ কর্তৃক এরূপভাবে সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছিলেন, সেই সম্পদের পরিচয় আমরা তাঁহার হাসপাতালের রচনা ও রোজনামচার মধ্যে পাই। সেইগুলি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার সাধনার ধারা বেশ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। গভীর ও

অটল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর তিনি সাধনার মন্দির নির্মাণ করিয়া, তাহাতে সেই সাধনের ধনকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তার পর হৃদয়ের শুভ্র, নির্মল ভক্তি-শতদলে হৃদয়দেবতার পূজা করিয়া সিদ্ধ সাধক রজনীকান্ত তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহার হাসপাতালের রচনা— তাঁহাব অন্তিম সময়ের মর্মকথার ভিতরেই আমরা এই সাধনার পূর্ণ পরিচয় পাই—তাঁহার সাধনার প্রত্যেক স্তর, ছন্দ, ভঙ্গি ও ধাবার গতি লক্ষ্য করি।

যখন জীবনের সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য আশা অর্থ— সকলই একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে, চারিদিক হইতে বিপদ ও নিরাশার ঘনীভূত অন্ধকার অল্পে অল্পে রজনীকান্তকে গ্রাস করিতেছে, জীবনেব সেই সংকটময় নিদারুণ সময়ে রজনীকান্তের হৃদয়বীণার তাবে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহা একেবাবে খাঁটি ও সরল, কৃত্রিমতার লেশমাত্র তাহার মধ্যে ছিল না। সকল হারাইয়া, কাঙাল হইয়া, দিবাবসানে জীবনেব গোধুলিবেলায় খেয়াঘাটে বসিয়া রজনীকান্ত যে মর্মকথা তাঁহার মরমের দেবতার পায়ে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরেব অন্তরতম প্রদেশ হইতেই বাহিব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনও কপটতা বা অতিশয়োক্তি ছিল না, স্থান কাল পাত্র ও অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে তাহা যে থাকিতেই পারে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অগণিত বিপদ ও অসহনীয় যন্ত্রণার মাঝখানে বসিয়া রজনীকান্ত সেই বিপদবারণ হরির মঙ্গলময় মূর্তি, তাঁহার দয়াল রূপ দেখিয়াছিলেন, করুণাময়ের করুণার সহস্রধারা দেখিয়া উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'আমি আবার মার দয়া সহস্রধারায় দেখছি, তোরা দেখ। মা জগদম্বা, মা জগজ্জননী বলে একবার সমস্বরে ডাক রে।'

প্রথমেই রজনীকান্ত দেখিলেন, তাঁহার এই যে দুরারোগ্য কষ্টদায়ক ব্যাধি, এই যে তীব্র যন্ত্রণা, এই যে পীড়ন ও বেত্রাঘাত— এ কেবল তাঁহাকে 'আগুনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খাদ উড়িয়ে দিয়ে খাঁটি করে কোলে নেবে বলে; নইলে ময়লা নিয়ে তো তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।' তখন তিনি বুঝিলেন— 'এ তো মার নয়, এ তো কষ্ট নয়—এ প্রেম, আর দয়া। মতি ভগবদভিমুখী করবার জন্য এ দারুণ রোগ, আর দারুণ ব্যথা, আর কষ্ট।' এইভাবে দেহাত্মিকা মতিকে সংযত করিয়া রজনীকান্ত সাধনায় বসিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন এবং অকপটে স্বীকারও করিয়াছিলেন, 'আমি, ধর্মের শিরে নিজেরে বসায়ে করেছি সর্বনাশ।' কেবল কি তাই?

তোর অগোচর পাপ নাই মন
যুক্তি করে তা করেছি দুজন
মনে কর দেখি ? আমাদের মাঝে
কেন মিছে ঢাকাঢাকি রে ?

হাসপাতালের রোজনামচার মধ্যেও তাঁহাকে অনুতাপ করিতে দেখি, 'দেখ প্রকাশ্যে না হোক, মনে বড়ো জ্ঞান আর বিদ্যার গৌরব করতাম, তাই আমার ঘাড় ধরে মাথাটাকে মাটির সঙ্গে নিচু করে দিয়েছে, দয়াল আমার।' অনুতপ্ত রজনীকান্ত দেখিলেন, বাক্যজ পাতক হরণ করিবার জন্য শ্রীভগবান তাহার কণ্ঠনালী রুদ্ধ করিয়া দিয়া তথায় তীব্র বেদনা ঢালিয়া দিয়াছেন। আর এই-ভাবেই 'পাপবিঘাতক' শ্রীহরি রজনীকান্তের কায়জ ও মনোজ পাতকও হরণপূর্বক তাঁহাকে, 'নির্মল করিয়া "আয়" বলে লবে শীতল কোলে ডাকি রে।' যখন তিনি এই পীড়নের ও নিদারুণ ব্যথার মধ্যে সেই প্রেমময়ের প্রেমের সন্ধান পাইলেন, যখন রজনীকান্ত বুঝিলেন, 'আমাকে প্রেম দিয়ে বুঝিয়েছে যে, এ মার নয়, এ কষ্ট নয়, এ আশীর্বাদ।' তখন তিনি দৈহিক কষ্টকে জয় করিয়া আত্মাকে দেহমুক্ত করিবার সাধনায় মনঃসংযোগ করিলেন। রজনীকান্ত বেশ জানিতেন, তাঁহার যে কষ্ট—তাহা শারীরিক, আত্মা তাঁহার কষ্টমুক্ত, 'এই দেহাত্মিকা বুদ্ধি হয়েই যত কষ্ট। নইলে শরীরের পীড়ায় কেন কষ্ট হবে ? শরীরটা তো খাঁচা, ভেঙে গেলে পাখিটার কষ্ট কি ?' তাই তিনি আত্মাকে দেহমুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশে জানাইলেন, 'আত্মাকে দেহমুক্ত কর দয়াল, আর দেহ চাহি না। দেহ আমাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। আমার আত্মাকে তোমার পদতলে নিয়ে যাও।' এইভাবে প্রার্থনা জানাইয়া, আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া রজনীকান্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা পাইলেন, তিনি লিখিলেন, 'রাত এলেই বেশ নীরব নিস্তব্ধ হয়, তখন মার খাই বেশি, আর প্রেমের পরীক্ষায় পড়ে কত সান্ত্বনা পাই, কষ্ট হয় না, বেশ থাকি।'

দৈহিক কষ্টকে এইভাবে জয় করিয়া সাধক রজনীকান্ত স্থিরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় তিনি বলিলেন, 'মন স্থির করবো না তো কি ? হিন্দুর ছেলে গীতার শ্লোক মনে আছে তো ?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

জীর্ণবাস ছাড়ি যথা মানবনিচয়
নববস্ত্র পরিধান করে, ধনঞ্জয়,
সেইরূপ জীর্ণদেহ করি পরিহার
নব কলেবর আত্মা ধরে পুনর্বার।

অমন তো কতবার মরেছি, মরতে মরতে অভ্যাস হয়ে গেছে।' নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যুজয়ী সাধকের ন্যায় তিনি লিখিলেন, 'আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করছি, আমার ব্যারাম যে অসাধ্য। বেদবাক্য বলছি না, তবে যা খুব সম্ভব, তা-ই মানুষ বলে আমিও তাই বলছি। আর তৈরি হয়ে থাকা ভালো। খুব ঝড় বয়ে যাচ্ছে, নৌকা ডুবে যাওয়ারই তো বেশি সম্ভাবনা, সেই ভেবেই লোকে হরিনাম করে। বাঁচব না মনে হলেই আমার এখন বেশি উপকার। কারণ, সুস্থ থাকলে কেউ বড়ো দয়ালের নাম করে না।' কি সুন্দর কথা। এ যেন ভক্তকবি তুলসী-দাসের সেই সনাতন বাণীরই অভিব্যক্তি। সেই, 'দুখ পাওয়ে তো হরি ভজে সুখে না ভজে কোই।' এইভাবে ভগবৎ-বিচারের উপর নির্ভর করিয়া রজনীকান্ত 'যা ভগবান্ করান, আমি তাতেই গা ঢেলে বসে আছি। আর বিচার করি নে, যা হয় হোক। এক মৃত্যু, তার জন্য ভগবানের পায়ে পড়ে আছি'—বলিয়া তাঁহার হৃদিস্থিত হৃষীকেশের চরণতলে পড়িয়া রহিলেন।

গীতার সেই মহতী বাণী, যে-বাণী একদিন বাণীপতির শ্রীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রেমধারায় সমগ্র জগৎকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, সেই 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—'যাহারা যেভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি'—রজনীকান্ত প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি জানিতেন, সম্যক ও যথাবিধ একাগ্র সাধনায় যে ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো ভক্তের ঠাকুর, যে তাঁহাকে যেভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন; এ কথা সত্য না হইলে যেন তাঁহার করুণাময়ত্বে, তাঁহার ভক্তবৎসলতায় কলঙ্ক হয়।' বড়ো উঁচু কথা। আর এই উঁচু কথা কয়টিকে জপমালা করিয়াই তাঁহার দর্শনলালসায় রজনীকান্ত ব্যাকুল হইলেন। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা—পরলোকগত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জননী রজনীকান্তকে হাস-

পাতালে দেখিতে আসিলে রজনীকান্ত বলিলেন, 'মা, আশীর্বাদ করুন, যেন মতি ভগবন্মুখিনী হয়। তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অচলা হয়, আব সংসারে আমার কে আছে?' শয্যাপার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুদিগকে কাতরে অনুরোধ কবিতে লাগিলেন, 'আমাকে ভগবৎপ্রসঙ্গ শোনাও। আমাকে কাঁদাও। আমাব পাষাণ হৃদয় ফাটাও। প্রাণ পবিষ্কাব করে দাও। খাদ উড়াও।' এই কাতবোক্তি, এই দৈন্য প্রকাশ, এই আকুল আবেগ সাধনার বিঘ্নসংকুল পথকে সরল কবিয়া দিতে লাগিল। পূর্বকৃত ভুলভ্রান্তিব কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত-অনুতপ্ত বজনীকান্ত বলিতে লাগিলেন, 'আমি যেন ঠিক দযালেব খেয়াঘাটে পৌছি। এই পথ তোমরা আমায বলে দিও। আব যেন আমার ঘাট ভুল না হয।'

এইভাবে সাধনা কবিতে করিতে রজনীকান্তের কি অবস্থা হইল, তাহা একবাব তাঁহাব ভাষায় পাঠ করুন, "আমি যখন 'ভগবান দয়াল, আমার দয়াল রে' লিখি, তখন ভাবে আমাব চোখ জলে ভবে উঠে।" সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের কোণে লুকানো সেই অতি পুবাতন ছবিখানি, সেই—

অনলে-অনিলে, চিবনভোনীলে,
ভূধব সলিলে, গহনে,
বিটপি-লতায, জলদেব গায,
শশী-তারকায, তপনে।

শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশদর্শনের চিত্র আবও উজ্জ্বল হইয়া প্রত্যক্ষেব মতো তাঁহার হৃদয়পটে চিত্রিত হইয়া উঠিল। প্রতি কার্যে তিনি ভগবানের প্রেবণা বুঝিতে লাগিলেন, 'মানুষ আমার জন্য এত করছে। তাঁবই মানুষ, সুতরাং তারই প্রেরণায়।' কি গভীর অনুভূতি ও বিশ্বাস, আর এই অনুভূতি ও বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়াই বজনীকান্ত লিখিলেন, 'আমি তাঁর প্রেম প্রত্যক্ষের মতো অনুভব কচ্ছি'। ভগবানেব প্রত্যক্ষ প্রেমেব পবিচয় পাইয়া রজনীকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, 'সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার মন্দ হলেও তো পুত্র, আমাকে কি সে ফেলতে পারে?' মনের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন রজনীকান্ত তাঁহার দয়ালকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! তুমি আমাকে কোলে নাও। তুমি দয়া করে কোলে নাও।...আমার প্রাণের হরি রে! হরি রে কোলে তুলে নাও হরি রে, আমি নিতান্ত তোমার চরণে শরণাগত হয়েছি, আর ফেল না।... তুমি ছাড়া আমার আর কেহই নাই।

আমাকে যে ক্ষমা করে কোলে তুলে নেবে সেও তুমি।' সকল প্রকারে সকল দিক দিয়া দেখিয়া তাঁহার এই যে ধারণা ও শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ—এই যে তাঁহার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা, সাধনার উচ্চস্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে এগুলি আসে না। এইগুলিই সাধনামগ্ন রজনীকান্তকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরও রজনীকান্তের পরীক্ষার অন্ত নাই। তাঁহাকে লইয়া লীলা করিবার ইচ্ছা তখনও সেই লীলাময়ের পূর্ণ হয় নাই। তাই তিনি তখনও রজনীকান্তকে ভয় দেখাইতেছেন, পীড়ন করিতেছেন—কণ্ঠহারা রজনীকান্তেব শেষ প্রার্থনা শুনিবাব আশায় লীলাময় ঠাকুর কতই না খেলা খেলিতেছেন! সাধক রজনীকান্ত বুঝিলেন, কেবল ভার দিলে, আত্মসমর্পণ কবিলে চলিবে না, তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইলে, নামীকে ধরিতে হইলে তাঁহার সেই অভয় নামের শবণ লইতে হইবে। সাধনার যজ্ঞ পূর্ণ কবিবার জন্য, আসন্নমৃত্যুকবলিত রজনীকান্ত বলিতে লাগিলেন, 'খালি হবি বল্। বল্ হরি বল্, বল্ হরি বল্, খালি হবি বল্, আর কিছু নাই, শুধু হরি বল্, আর চাই নে কিছু, শুধু হরি বল্, হরি বল্। এই বসনা জড়ায়ে আসে, বল্ হরি বল্।' সর্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি নিজে আসিয়া এইবার রজনীকান্তের সাধনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রাণারামকে দর্শন করিয়া রজনীকান্তের অভিমানবিক্ষুব্ধ হৃদয় বলিয়া উঠিল, 'হে দয়াল প্রাণবন্ধু, হৃদয়নিধি, এতকাল পবে কি আমার কথা মনে পড়েছে করুণাসাগর!'

সাধক রজনীকান্তের সাধনা সিদ্ধ হইল। ভগবদ্দর্শনতৃপ্ত রজনীকান্ত লিগিলেন, 'আমাকে ভগবান দয়া করেছেন'। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী তখন সর্বদাই রজনীকান্তের কাছে বসিয়া থাকিয়া রজনীকান্তকে দিয়া লিখাইতেন, 'মা এসে বসে আছে'।

কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ভিতর রজনীকান্ত সাধনার অতি সুন্দর ধারা দেখাইলেন; প্রাণান্তকর নিদারুণ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি সেই ভূমার পদে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং সেই ভূমানন্দকেই সম্বল করিয়া আনন্দময়ী মায়ের সদানন্দালয়ে চলিয়া গেলেন।

এই কঠোর সাধনার ও সিদ্ধির প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া আমাদের মনের মধ্যে কান্ত যে-ছবি আঁকিয়া দিয়া গেলেন, ভক্তিপূত হৃদয়ে বাঙালি তাহা চিরদিন স্মরণ করিবে, আর কবি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে থাকিবে—

হে রজনীকান্ত! তুচ্ছ করি সর্বব্যথা
কি ধন লাগিয়া তুমি পুলকিতপ্রাণ,
রুদ্ধকণ্ঠ, বাক্যহারা— করিলে প্রয়াণ
মহাকাল-পারাবারে! ভক্তের বিভব
ও সে দুঃখমৃণালের কমলসৌরভ।

পরিশিষ্ট

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের রাশিচক্র

জনহিতব্রতী সাহিত্যবন্ধু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুতে পরিষদের কর্মক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে এসেছিল তখন তাঁরই আদর্শের অনুবর্তী হয়ে, অনুরূপ অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা নিয়ে পরিষদের জন্য, বঙ্গসাহিত্যের জন্য, উদীয়মান সাহিত্যিকদের জন্য এবং অপ্রকাশিত পুঁথিপত্র প্রকাশের জন্য দৃঢ় চিত্তে শ্রমদান করতে যে তেজস্বী সাহিত্যিক যুবক এগিয়ে এসেছিলেন তিনিই নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। আচার্য দীনেশ সেন তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

'কে হবে স্বর্যের রথে অরুণ সারথি
কে চালাবে পরিষৎ ব্যোমকেশ বিনে?**
নত শিরে দৃঢ় কণ্ঠে কে এল যুবক,—
"আমি আছি" বলি হ'ল, স্বেচ্ছায় সেবক।'

তার পরিচয় তিনি 'অক্লান্তকর্মা'— 'পরের বেগার খাটেন নিত্য যন্ত্রবৎ'—

'নিত্য বাণীপীঠে দেয় জীবনের ডালি
হোক না অঙ্গেতে ধূলি বস্ত্রে শত কালি।'

তার পরিচয় তিনি পরম ভাগবত, বিদগ্ধ দার্শনিক, ভাবঘন ভক্ত এবং বাগ্মী বক্তা ঃ—

'কৃষ্ণ-কথা কার মুখে হয় মনোরম
অশ্রু আনে চক্ষু হতে? কার বক্তৃতায়
কঠিন গলিয়া যায়? শতদল সম
কার বক্ষে প্রেম খেলে বৈষ্ণব সভায়?'

তার কবিতা ও কবির প্রতি অনুরাগের পরিচয় ঃ—

'"রজনী"র কাব্য পড়ি কে হ'ল পাগল
ঘুরিল সমস্ত বঙ্গ জীবনী লিখিতে
"বাউলের গানে" কার অন্তর সরল
বিগলিত হ'ল—তাই লাগিল খুঁজিতে
তাহাদের ইতিহাস ছেঁড়া পুঁথি হতে
অক্লান্ত পথিক এ যে সাহিত্যের পথে।'

তাঁর বেশবাস বসন-ভূষণ, সংসার-সংস্থানের পরিচয় :—

‘পুঁথিপত্র সদা সঙ্গে অন্য কথা নাই
বাণীর প্রসঙ্গ ছাড়া, সদা সেই ধ্যান।
কোন কবি কি লিখেছে ভাবিতেছে তাই
ভুলে গেছে গৃহে নাই অন্নের সংস্থান।
রুগ্ন শিশু দিয়ে স্ত্রীকে চলেছে সত্বরে
কোথা সাহিত্যের সভা সুদূর সহরে।’

—দীনেশচন্দ্র সেন

কবিরাজ শ্যামাদাস শিরোমণি মহোদয় লিখেছেন :—

‘গত ১৩৩৮ সালের ১৪ই ভাদ্র যেদিন পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় সুধী কর্তৃপক্ষ এবং সাহিত্যসেবক সমবেত হইয়া তাঁহাকে “হরপ্রসাদ সংবর্ধন-লেখমালা”র ১ম খণ্ড উপহার দেন, সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন—“আমরা তো এখন ক্রমশঃই কাজের বার হইয়া পড়িতেছি, এখন পরিষদের ভবিষ্যৎ কি হইবে? আমাদের পরিষৎ কে ‘ভালবাসা’ সে ‘অবসর মত’। কিন্তু এখানে এমন একজন উপস্থিত আছেন যিনি পরিষৎকে ‘নিশিদিন’ ভালবাসেন, পরিষদের চিন্তা যাঁহার মগজে সর্বদাই সজাগ রহিয়াছে—তিনি শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।”’ সেই সভাতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন :—‘চারিটি স্তম্ভের উপর পরিষৎ দাঁড়িয়েছিল, দুটী ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু এখনও দুটী বর্তমান—একটি মনস্বী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরটী শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।’

পরিষদের পরবর্তী অপর একটী স্তম্ভ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :—‘অতিঅল্প বয়সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় আসিয়া যখন আমি অন্নচিন্তা চমৎকারে মগ্ন, তখন তিনি প্রথম আমাকে আবিষ্কার করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে জনমজুরের কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই স্নেহে সাহিত্যিক মহলে দশজনের সহিত পরিচিত হই এবং যখন আমার রচনা অন্য কোন সাহিত্যপত্রে স্থান পাইত কি না সন্দেহ, তখন তিনি তাহার “জাহ্নবী” পত্রিকায় আমার প্রথম রচনা সাদরে মুদ্রিত করেন। তাই আজও ভাবি সে সময় তিনি যদি আমাকে সাহিত্যের দিকে টানিয়া না আনিতেন তাহা হইলে আমার জীবনের গতি হয়তো সঙ্কীর্ণ চাকুরীর খাতেই আবদ্ধ থাকিত।’

ব্রজেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের সাহিত্যসংকলন—সাহিত্যিক গবেষণা—

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করলে চমৎকৃত হতে হয় যে তার জীবনেরও পথিকৃৎ ছিলেন নলিনীরঞ্জন।

অনেকেই বলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী সাহিত্য-পরিষদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন:—'তিনি (নলিনীরঞ্জন) যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছেন একথা আমি বলিতে পারি। * * পরিষদের কাজ করিতে করিতে তাহার চাকুরী গেল, তাঁহাকে বিশেষ অর্থকষ্টে পড়িতে হইল। ** পরিষদের জন্য অর্থ, তৈলচিত্র ও নানা দ্রব্য তিনি একা যাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন তাহা আর কেহ করিতে পারিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।'

পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং স্বতন্ত্র মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে বিশেষ ভাবে ব্রতী না হলেও "কান্ত কবি" ও "রামেন্দ্রসুন্দরের" জীবনচরিত-রচয়িতা ও বাউল গানের সঙ্কলয়িতা ও ব্যাখ্যাতা রূপে তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই বিধৃত হয়ে থাকবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ তাঁর "অসাধারণ মনীষায় ও বাগ্মিতায়" মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রথম কালীঘাটে, পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর বহু অধিবেশনে ও হরিসভায় তাঁর মুখে বৈষ্ণব ভাবোদ্দীপক বহু মধুর ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া"— "হৃষ্ট বিস্মিত ও মুগ্ধ" হয়ে "মুক্ত কণ্ঠে" তাঁর প্রশংসা করেছেন।

তিনি ১৩৩৪ সালে নিজের চাকুরীতে জলাঞ্জলি দিয়ে মেদিনীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

আমাদের দেশে সাহিত্যপ্রীতি দুর্লভ,—সাহিত্যিক-প্রীতি আরও দুর্লভ এবং এই দুইগুণের একত্র সমাবেশ দুর্লভ হতেও দুর্লভতর। নলিনীরঞ্জনের মধ্যে এই দুই গুণই যুগপৎ সমানভাবে বর্তমান ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, উভয় প্রতিষ্ঠানই নলিনীরঞ্জনের নিঃস্বার্থ সেবায় পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি তাঁর জীবন ও যথাসবস্ব পণ করে এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সেবা করে গেছেন।

তিনি শুধু সাহিত্যসেবী ছিলেন না,—সাহিত্যসেবীর সেবকও ছিলেন। সাহিত্যিকদের আপদে-বিপদে দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্য সর্বদাই ছুটে যেতেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। এই অক্লান্ত নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারাই তিনি সাহিত্যিকদের হৃদয়-মন জয় করে তাদের স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছিলেন।

সাহিত্যচার্য জলধর সেন বলেছেন 'সে আমার প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য ও আমার ভাই। তাকে আমি সাহিত্যে নামিয়েছি। সে আমার শিষ্য, তার কাছে আজ আমি পরাজিত; শিষ্যের কাছে গুরুর পরাজয়, এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? আমার এ আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করবার নয়।'

মানুষ হিসেবেও নলিনীরঞ্জন অতি সরল, সজ্জন ও অমায়িক-চরিত্র ছিলেন। সকলেই তাকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। জীবনযুদ্ধের ঝড়ঝাপটা, মেঘকুয়াসা কাটিয়ে যে তিনি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন— সে শুধু তাঁর অনন্য-সাধাবণ চরিত্রমাধুর্য ও অসাধারণ অধ্যবসায়েব গুণে। তাঁর আদর্শ প্রত্যেক বাঙালীর, প্রত্যেক বঙ্গসাহিত্যসেবীর অনুকরণীয়।

তাঁকে রসরাজ অমৃতলাল বসু বলেছেন তাঁর সরস সকৌতুক ছন্দে :—

'শিষ্টতা-বিশিষ্ট মিষ্টতা-মণ্ডিত
তুমিহে নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত।'

আরও একজন রসবাজ এবং পণ্ডিত বাংলার শবৎপণ্ডিত বা দা' ঠাকুর গান বেঁধে বলেছেন,— তাঁর পঞ্চাশত্তম বর্ষের সংবর্ধনায় :—

'দেখে অবাক হলেম দাদা
"আয়বন-চেস্ট" শ্রেষ্ঠ জিনিস
থাকতে পূজে পুঁথির গাদা। **
সাহিত্যসেবীর তরে, মলে পরে সভা করে
বড় জোর দুঃখপ্রকাশ মামুলী নকল কাঁদা।
বাণী মা'র কুটীর থেকে
নলিনী ভাইকে ডেকে
বানালে "আবু হোসেন"— মুছিয়ে ধুলাকাদা।'

তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর বাগ্মিতা সম্বন্ধে আচার্য দীনেশচন্দ্রের মন্তব্য আরও কিছু উদ্ধৃত করছি :—

'আজি প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল যে দিন সভামণ্ডপে ইহার বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত একটী আবেগময়ী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, সেদিন আমার মনের উপর দিয়া যেন বৈকুণ্ঠের একটা হাওয়া বহিয়া গিয়াছিল,—আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। সে দিনের মধুময়ী স্মৃতি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।' এ মন্তব্য পক্ষপাত-প্রভাবিত কোনো সমালোচকের মন্তব্য নয়,— ইহা প্রকৃতই সরলচিত্ত সাহিত্যরসিকের রসাস্বাদন-পরিতৃপ্তির স্বীকৃতিস্বরূপ

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্‌গার। 'প্রাণ দিয়ে দুঃখী ও আর্তের সেবা করতে এমন পরহিতব্রত নিঃস্বার্থ কর্মী, পরদুঃখে সহানুভূতিপূর্ণ এমন একনিষ্ঠ সহৃদয় লোক জগতে দুর্লভ।' পুনশ্চ :—'নিজের শত দুঃখকষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ব্যথিতের কাছে বসিয়া তাহার হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবার চেষ্টা নলিনীরঞ্জন যেরূপ করিয়া থাকেন, তাহাতে ইহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

'তাঁর প্রতিভার উপমাও অনবদ্য,—হিমালয় পর্বতের মত উচ্চ প্রতিভা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু নলিনীর প্রতিভা গঙ্গাপ্রবাহের মত, উহা গৃহস্থের কুটিরে, ধনীর প্রাসাদে, সর্বত্রই স্নেহ, প্রেম এবং সেবা বহিয়া লইয়া যাইতেছে।'

তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপূর্তির অভিনন্দনোৎসবে আচার্য দীনেশচন্দ্র সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন,—

'এই অনুষ্ঠানের সার্বজনীনতা দেখিয়া মনে হয় বাঙ্গালী জাতির সহৃদয়তা হইতে নলিনীরঞ্জন বঞ্চিত হন নাই। আজি এই সভাস্থলে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে সাহিত্যসেবীদিগের যে সমাগম হইয়াছে তাহা এক অপূর্ব দৃশ্য। ইহা দেখিয়া ইহাই বুঝা যায় যে তিনি বাঙালীর হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছেন এবং তিনি বাঙালী মাত্রেরই কত আদরের।'

এই অপূর্ব দৃশ্যে বিস্ময় প্রকাশ করে হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন,—'এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে দরিদ্র সাহিত্যসেবীর আদরের সম্ভাবনা কোথায়?' তথাপি যে সম্ভাবনা সত্যে পরিণত হয়েছিল তা তার গুণবত্তার স্বীকৃতির নিদর্শন তাতে সন্দেহ নাই।

নলিনীরঞ্জন সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সম্মেলন এবং সাহিত্যব্রতিগণের জন্য দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে "খাতাবগলে কাবুলিওয়ালা" আখ্যা লাভ করেছিলেন।

তাঁর সাহিত্যিক-প্রীতি ও দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের প্রতি সহানুভূতি ছিল অসাধারণ। সে হিসাবে তিনি সাহিত্যস্রষ্টার চেয়েও সমধিক পরিমাণে সাহিত্যিক-স্রষ্টা ছিলেন।

"কথ্‌নী কো ঘর বহুৎ মিলে করণীকে ঘর দূর"। ভালো কথা বলবার লোকের অভাব নাই কিন্তু সেই ভালো আদর্শকে কাজে রূপ দিবার লোক জগতে বিরল,—"আপনি আচরি ধর্ম জগতে শিখায়" এমন আচারপরায়ণ আচার্য বড়ই অপ্রতুল,—নলিনীরঞ্জন এইরূপ আদর্শনিষ্ঠ আচরণপরায়ণ আচার্য

ছিলেন। তিনি বিপন্ন সাহিত্যসেবীর সন্ধানে এবং তাদের বিপৎ-ত্রাণার্থে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন এবং তাদের উপকার করবার জন্য যোগ্য ব্যক্তির দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করে ফিরেছেন।

কান্ত কবির ভাষায়— "ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে। মরমে মরে গেল মুকুলে ঝরে গেল, প্রাণ ভরা আশা সমাধি পাশে।" এমন অপরিণত অবিকশিত প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের মুকুলে ঝরে পড়ার বেদনায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। তাই প্রিয়নাথ দাস বলেছেন—'যাহার মধ্যে সাহিত্যের এতটুকু প্রতিভা আছে তাহারই সন্ধান করিয়াছ, হাতে ধরিয়া তাহাকে বাণীপীঠ তলে লইয়া গিয়া তাহার সুপ্ত প্রতিভাকে উৎসাহদানে জাগ্রত করিয়া জাহ্নবীর পূত শীকরবিন্দুদানে ধন্য করিয়াছ।'

কান্তকবির জন্য শ্রদ্ধানত-চিত্তে আহারনিদ্রা ভুলে গিয়ে তাঁকে দিবারাত্রি শুশ্রূষা করেই ক্ষান্ত হন নাই, বহু পরিশ্রমে তাঁর জীবনীর মালমশলা সংগ্রহ করে তাঁর চরিতকথা দেশবাসীদের শুনিয়েছেন। অতীত বঙ্গভঙ্গ-যুগের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের" জনপ্রিয় কবিকে ভাবীযুগের বাঙালীর কাছেও চিরস্মরণীয় করবার জন্য অসীম প্রয়াস করেছেন।

তাই নলিনীকান্ত সরকার বলেছেন—

'করলে ধনী সাহিত্যেরে ঋণী সাহিত্যিকে
সে ঋণ শোধার পুণ্যে সফল করি এ দিনটীকে।'

বলেছেন—

'তোমায় জানি খাঁটি সাধক একান্ত আত্মীয়
জ্যেষ্ঠ পূজনীয় আমার শ্রেষ্ঠ বরণীয়।'

ব্রজমোহন দাস বলেছেন—'আবর্জনার স্তূপ থেকে আমার সন্ধান নিয়ে একেবারে··· মূক মুখে ভাষা ফুটিয়ে দিলে ··অবজ্ঞাত যারা তারা তোমার বুকে আশ্রয় পায়—অভয় পায়—দরদ পায়। তোমাকে দেখেছি গোবিন্দ দাসের নিঃস্ব পুত্রকে নিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়াতে, মৃত সাহিত্যিকের বিপন্ন পরিবারের সাহায্যে ঝুলি-কাঁধে ফিরতে, রুগ্নের পাশে রাতের পর রাত অনিদ্রায় অনাহারে কাটাতে··· হায় মানুষ! আজ তারাই তোমায় চেনে না—যাদের তুমি বড় করেছো তারাই—তাদের জন্যই আজ তোমার অন্তরে-বাহিরে হাহাকার।' তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে—'বেদনায় বন্ধু তুমি, সাধনায় গুরু তুমি, অযাচিত করুণা তোমার'—বলে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছেন তিনি।

অনুরূপা দেবী লিখেছেন,—'·· সে সময়ে আমি অনুপমা দেবী, এই ছদ্মনামে ···উপন্যাস দিতেছিলাম। কয়েক স্থলে লেখা পাঠাইবার সঙ্গে ডাকটিকিট দিয়াও উত্তর পাই নাই, এদবস্থাতে "জাহ্নবী"র সহকারী সম্পাদকরূপে সহসা ইনি যখন আমার লেখা গল্প বা কবিতা চাহিয়া পাঠাইলেন তখন বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ হইযাছিলাম।'

উত্তরবঙ্গ থেকে রংপুর সাহিত্য পরিষৎ, পূর্ববঙ্গ থেকে চট্টল সাহিত্য-পরিষৎ, মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান তাই এই বাণীর পূজারীকে শ্রদ্ধা সম্মান পূজা এবং প্রীতি পাঠিয়েছেন।

হরপ্রসাদ, কামাখ্যানাথ, দুর্গাচরণ, পঞ্চানন, হরিদাস, প্রমথনাথ, ফণিভূষণ, কমলকৃষ্ণ, যোগেন্দ্রনাথ প্রমুখ তৎকালীন বা পরবর্তী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাঁকে আশীর্বাদসহ অভিনন্দন দান করেছেন, তাকে 'সাহিত্যবন্ধু' এই উপনাম বা উপাধিমণ্ডিত করেছেন। "বরেণ্যকীর্তি", "সাহিত্য-সংসদুপচার-বিধানদক্ষ", "সাহিত্যসেবৈকনিষ্ঠ" এই পণ্ডিত মহোদয়কে বহু সংবর্ধিত করে বলেছেন—

'নাভীপ্সিতং তব যশো ন ধনং ন সৌখ্যং
কাব্যোন্নতিস্তবপরং নিতরামভীষ্টা'···
'সাহিত্যবন্ধুরিতি সংসদি কোবিদানাম্,
আশীবচোভিরুপনাম তবোৎসৃজামঃ'॥
'ঔদার্যমার্যমনুজোচিতমার্জবঞ্চ
সাহিত্যসেবনমনন্যসমানমেব' ··
'কাব্যামৃতেন ভবতা সমুপাহৃতেন
তৃপ্যতি কাব্যরসলালসমানসা যে'॥

তাঁর পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে—(৭ ফাল্গুন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে) রামমোহন লাইব্রেরী হলে সার্বজনীন সংবর্ধনা-সঙ্ঘের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কবি গিরিজাকুমার বসু ও সম্পাদক বিনয়কুমার সরকার তাকে যে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দন করেন, তাতে বলেন—

'তুমি বৈষ্ণব, সেবা তোমার ধর্ম, তুমি সাহিত্যের সেবা করিযাছ, সাহিত্যিকের সেবা করিয়াছ, সাহিত্য-সঙ্ঘেরও সেবা করিয়াছ, গরিষ্ঠ তুমি সেবার ধর্মে, মহীয়ান্ তুমি সেবার মাহাত্ম্যে ** সুলভের তুমি সাধনা কর নাই; যাহা সহজ সুগম সুসাধ্য, তোমার তপস্যা তাহারও নহে—যাহা আরামের বিলাসের অনায়াসের তাহারও প্রার্থনা তুমি কর নাই। তুমি দুষ্করের ব্রত গ্রহণ করিয়াছ।

দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কটসঙ্কুল তোমার পথ। কিন্তু তোমার লক্ষ্য স্থির, সাধনা তোমার অসীম, গতি তোমার অব্যাহত।...পরার্থে তুমি আপনার স্বার্থ নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াছ,...দারিদ্র্য তোমায় পরাজিত করিতে পারে নাই, আঘাত তোমায় আহত করিতে পারে নাই। তুমি বীর, তুমি ধন্য, তোমার সারল্য অসাধারণ, তোমার বন্ধুবাৎসল্য অপূর্ব, আর সাধারণ এবং অসাধারণ সকলকেই আকর্ষণ করে তোমার চরিত্রমাধুর্য...কত বিখ্যাত ও অজ্ঞাত সাহিত্যিকের নিরুদ্ধ প্রবাহ তোমার জাহ্নবী-স্রোতোধারা-স্পর্শে উন্মুক্ত হইয়াছে।...তুমি শত্রু-মিত্র সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিয়াছ...হে নিঃস্বার্থ কর্মী, আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করি...হে সহাস্যবদন নলিনীরঞ্জন আমরা তোমায় অভিবাদন করি।' এই মানপত্রে যে বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা যে অতিরঞ্জিত নয়, অতিশয় সুপ্রযুক্ত তা পূর্বেই সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত মন্তব্য থেকে দেখিয়েছি।

কবি গোলাম মোস্তফা ঠিকই বলেছেন—

'বঙ্গবাসীর যে তাজমহল আকাশে তুলেছে শির।
যার খুসি হোক মিনার তাহার দীপ্ত জয়শ্রীর॥
তুমি হও সেই সৌধমূলের স্তম্ভভিত্তি-প্রায়।
নীরব সাধক! সেই হবে তব গৌরব এ ধরায়॥'

তিনি সাহিত্যের সৌধচূড়া বা মিনার হবার দাবি রাখেন না, কিন্তু তার ভিত্তি-গঠনের গৌরব তাঁর অবশ্য প্রাপ্য এবং অনস্বীকার্য।

ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ আশা প্রকাশ করেছেন—'সম-সময়ের পাঠক অপেক্ষাও পরবর্তীকালের পাঠকগণ তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া অধিকতর উপকৃত হইবেন এবং একদিন বাঙ্গালা তাঁহাকে "বসওয়েল" বলিয়া অভিনন্দিত করিবে।'

অমূল্য বিদ্যাভূষণ বলেছেন—'তিনি সাহিত্য-পরিষদের কি করিয়াছেন তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু তিনি পরিষদের কি না করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া অবাক হই।...পরিষদের উদ্যোগে যতবার সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছে তাহার বারো আনায় নলিনীবাবুর কৃতিত্ব। এমন আপনভোলা দশের কাজে পাগল লোক দুনিয়ায় বড় বিরল।...মালদহ সাহিত্য-সম্মেলনে...আমি সভাপতি হই ...সেই অধিবেশনের শেষ দিনে গম্ভীরার গানের শেষে তিন চার হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় তিনি বাঙ্গলার পল্লীসাহিত্য ও গ্রাম্য-

গীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন তাহা কেবল অপূর্ব নহে অনন্যসাধারণ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুইরকম শ্রোতাই মুক্তকণ্ঠে সেদিন নলিনীবাবুর জয়ধ্বনি করিয়াছিল।

'আমি এক সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলাম। সম্মিলনীর বাড়ী হইবার কথা উঠিল। চল্লিশ হাজার টাকা তো চাই ই। নলিনীবাবু শুনিয়াই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বিরাট সভা হইল, অনেক লোক আসিল, নলিনী বাবু বক্তৃতা করিয়া লোককে অর্থসাহায্যে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তারপর নিজের হাতের সোনার আংটি খুলিয়া সম্মিলনীর গৃহনির্মাণ-ভাণ্ডারে দান করিলেন। এই প্রথম দান লইয়াই কার্যে অগ্রসর হইয়া সম্মিলনী আজ প্রকাণ্ড মন্দির, হল প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছেন। এই সম্মিলনীর বিভিন্ন অধিবেশনে কলিকাতায় এবং সুদূর মফস্বলে বহুস্থানে নলিনীবাবু বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীমন মহাপ্রভু সম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার কথা ভাবিলে এখনও আনন্দে অভিভূত হইয়া যাই। অনেক বড় বড় সভায় একা তাঁহাকে মাত্র সম্বল করিয়া আমি কত দিন-রাত যে পরমানন্দে কাটাইয়াছি তাহার তুলনা হয় না।... তাহার কথা ভাবিলে সময় সময় রাগও হয়। নিজের কত ক্ষতি করিয়াছেন, কিন্তু তবু দশের কাজ ভোলেন নাই। লোকটার বুদ্ধি খুব তাজা। আক্কেল কিছু কম। মেজাজ স্বভাবত নরম, কিন্তু অন্যায় দেখিলে গরম হইয়া উঠে। মনে কোন ঘোরপ্যাচ নাই - সরল নির্মল।

'নলিনীবাবু সাহিত্যিক অর্থাৎ সাহিত্যসেবী। এ তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় নয়। তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বাউল সম্প্রদায়ের বহু অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ-পূর্বক মনীষী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার "কান্তকবি রজনীকান্ত" বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অতুল সম্পদ। জীবনচরিতকে কিরূপে সবল ও প্রাণস্পর্শী করিতে হয় এই বইখানি তাহার নিদর্শন। · পাণিনি বলিয়াছেন—"সাহিত্যং অধীতে ইতি সাহিত্যিকঃ, সাহিত্যং অধীতে ইতি সাহিত্যিকঃ।' সুতরাং নলিনীবাবু ডবল সাহিত্যিক। তাঁহার জয়-জয়কার হউক। জয়ে—ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হউক।'

বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন—'বিপদে-সম্পদে এই ত্রিশ বর্ষকাল আপনার সাহায্যলাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। নানা প্রতিকূল সংগ্রামে বিপক্ষগণের দর্পচূর্ণ করিয়া আপনি যেভাবে আনন্দগৌরব রক্ষায় উদ্যুক্ত হইয়াছেন, আপনার সেই অকৃত্রিম সহযোগিতা আমি ইহজীবনে কখনও ভুলিব না।

তাই বহু বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও, আপনাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে আজ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

'আপনি অনন্যকর্মা হইয়া যেসকল প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, তন্মধ্যে সাহিত্য-পরিষদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতেছি। আপনি সাহিত্য-পরিষদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার প্রিয়তম সুহৃদ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী ব্যতীত আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু আজ যখন সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান আপনাকে সম্মানিত করিতেছেন তখন পরিষদ আপনার ন্যায্য অভিনন্দনে কেন যে বিমুখ হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না।'

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু বলেছেন—'রামেন্দ্রসুন্দর দুটি কথা বলে আমার সঙ্গে নলিনীরঞ্জনের পরিচয় করাইয়া দেন। একটি হইতেছে "ব্যোমকেশ মুস্তফীর পর সাহিত্য-পরিষদের এরূপ অকৃত্রিম বন্ধু আর নাই।" অপরটি "and to know him is to love him" ১৩২৭ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর পরলোকগমন করেন···তাঁহার বহু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন থাকা সত্ত্বেও, একমাত্র নলিনীরঞ্জনই রামেন্দ্রস্মৃতি-রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পরলোকগমনের ছয়মাসের মধ্যেই প্রায় ত্রিশ জন মনীষী ও লেখকের দ্বারা রামেন্দ্র-পরিচয় লেখাইয়া লইয়া এবং নিজে রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ সন্দর্ভ লিখিয়া "আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর" নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিলেন · রামেন্দ্রসুন্দরের সুন্দর চরিত্রের বিশ্লেষণমূলক এই অনবদ্য সুন্দর গ্রন্থখানি তৎকালে কিভাবে সাধারণ্যে আদৃত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন।'

কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন—

'যেদিন চেনেনি কেহ, রবাহূত যাত্রীদের ভিড়ে
দুয়ারে দাঁড়ায়েছিনু, তুমি মোরে বাণীর মন্দিরে
করেছিলে আমন্ত্রণ, সেই কথা করিয়া স্মরণ
আজি তোমা পঞ্চাশোর্ধে বাণীপীঠে করিনু বরণ।'

নলিনীরঞ্জনের প্রতিভা-আবিষ্কারের প্রতিভার যে এটি একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার আর সন্দেহ কি?

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন:—'ব্যোমকেশ দাদার মৃত্যুর পরে পরিষদে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে

তুমি (নলিনীরঞ্জন) যে ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলে তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাহার প্রতি তোমার অবিচলিত শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার রোগশয্যার প্রলাপ তুমি সম্পাদন-পূর্বক প্রকাশ করিয়াছিলে। ইহাতে তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের কথঞ্চিৎ অর্থসাহায্য হইয়াছিল এবং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার যৎসামান্য পরিচয়ও দেশের নিকট প্রস্ফুট হইয়াছিল।' * * * শাস্ত্রী মহাশয় তোমার সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন—"He is a wonderful man for original research He would run any risk, suffer any hardship, travel any distance for original information to the point If there is any gentleman who can fill the place left vacant by the death of our esteemed friend Babu Byomkesh Mustafi, it is Babu Nalinirranjan Pandit."

ডক্টর দেবপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন :—'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্য তিনি চিরজীবন যে পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন পরিষদ-ভক্ত কোন ব্যক্তিই তাহা কোনদিন বিস্মৃত হইবেন না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই পরিষদই এই জয়ন্তী বা সংবর্ধনায় কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন না। অথচ পরিষদের বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই সংবর্ধনা-সমিতির সভাপতি, এক কথায় ইহার প্রধান উদ্যোগী ও প্রাণস্বরূপ।

'বাংলার অধুনালুপ্ত সাহিত্য-সম্মেলন নলিনীবাবুর নিকট কি পরিমাণে ঋণী তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। হুগলী, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, নৈহাটী ও রাধানগর প্রভৃতি গ্রামসমূহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলি তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ব্যতীত কখনও সফলতা লাভ করিতে পারিত না।

'তারপর তিনি সুবক্তা ও ভগবদভক্ত। বাধানগরে শ্রীশ্রীঅভিরাম-জিউর শ্রীপাট-বাটীতে তাহার মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলামূলক যে ভাবময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করি তাহা আমার হৃদয়ে চিরদিনই ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

'জীবনে বহুবার নলিনীবাবুর কৃপা লাভ করিয়াছি, তাঁহার মধুর স্বভাব ও বিনয়নম্রভাব আমাকে বরাবর মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। আচার্য অক্ষয়চন্দ্র, মনীষী হরপ্রসাদ তাঁহার কথা বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ধন্য তাঁহার আকর্ষণী শক্তি, ধন্য তাঁহার লোক মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা।'

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছেন :—'ইংরেজী ১৯০০ খ্রীঃ (বঙ্গাব্দ ১৩০৬-৭) কিম্বা তাহার কিছু পূর্বে বাগবাজারে

একটী বিপুল জনসংঘের মাঝখানে একটী ১৬।১৭ বৎসরের যুবক বক্তৃতা করিতেছিল বক্তৃতার বিষয় ছিল প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকাহিনী। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি "অমৃতং বালভাষিতম্," কিন্তু সেদিন এই কিশোর যুবকের মুখের কথাগুলি আমার কাছে অমৃত অপেক্ষাও মধুর লাগিল। তাহার বলিবার ভঙ্গী, ভাবাবেগ, এবং কণ্ঠস্বরের মাধুর্য আমাকে একেবারে সম্মোহিত করিল। এই যুবক আমার ও আপনাদের পরমপ্রিয় নলিনীরঞ্জন।

'এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দেখিতে পাই সে পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট যাইতেছে। তিনি তখন "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" ও "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক। নলিনীকে তিনি খুব ভালবাসেন, বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে নলিনী তাহার নিকট যাতায়াত করে। আমার মনে পূর্ব হইতেই কেমন একটা খটকা জন্মিয়াছিল—এই ১৬।১৭ বৎসরের ছেলে এমন সুন্দর বক্তৃতা করিতে শিখিল কিরূপে? পরিচয়-প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম তাহার বাড়ী নবদ্বীপে। মাত্র এইটুকু জানিয়াই আমার মনের খটকা বিদূরিত হইল। তাহার পর নলিনীর সহিত সাহিত্য সম্মেলন ব্যপদেশে কত দূর-দূরান্তরে গিয়াছি, সকল স্থানেই নলিনী আমাকে দিয়া কবিতা লিখাইয়া লইয়া সেই কবিতা সম্মেলনে সাগ্রহে পাঠ করিয়াছে। এইরূপেই আমার বহু কবিতার জন্ম হইয়াছে, নলিনীর সাহচর্যে ও তাহারই প্ররোচনায়। এজন্য আমি তাহার কাছে ঋণী। নলিনী নহিলে আমার কবিতাগুলি রচিত হইত কিনা সন্দেহ।

' পূর্বে তাহার বক্তৃতা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এখন তাহার সাহিত্যসেবা দেখিয়া (১৩১১ সালে "জাহ্নবী" সম্পাদনার প্রসঙ্গে) অধিকতর মুগ্ধ হইলাম। দেখলাম নলিনী একাধারে সুবক্তা ও সুলেখক। ফুলের মত কোমল তাহার হৃদয়,—সদাই হাসিমুখ, পরের সেবা করিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে, যাহার সহিত সে দুদণ্ড কথা কহে সেই-ই নলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অক্ষয়বাবুর মত তীক্ষ্ণধী সমালোচক ও গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তিকেও নলিনী কেমন করিয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। অক্ষয়বাবু নলিনী বলিতে অজ্ঞান।'

নলিনীরঞ্জন তাঁর সংবর্ধনায় আমাকে স্মরণ করেন এবং আমাকে তাঁর 'প্রতিভা' পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দানের অধিকার দিয়ে ধন্য করেছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবশাস্ত্র-পাঠের শিক্ষক যিনি আমারও আচার্য ছিলেন তিনিই, যিনি মরজগতে অষ্টোত্তরশত বর্ষ ধরে আলোকস্তম্ভ রূপে বৈষ্ণব সাহিত্যের, বৈষ্ণব

পদাবলীর ও বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের আনন্দময় অমৃতরসরশ্মি বিকীর্ণ করে দিয়েছেন। আমি পূজ্যপাদ পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদযের কথা বলছি। কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটেনি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৩২।৩৩ সালে, আমি তখন ১৬নং অক্রুর দত্ত লেনে থাকি। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মন্দিরের চাবি," (১৯৩১ খৃঃ) প্রকাশ মাত্রেই নিষিদ্ধ হয়েছে— দ্বিতীয় "সাঁঝের প্রদীপ" নামক কাব্যগ্রন্থটি অল্পদিন মাত্র প্রকাশ হয়েছে এবং কতকগুলি কবিতা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন তার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিদান করে আমার সঙ্গে স্বয়ং এসে আলাপ করলেন। আমি অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে সেই অগ্রজপ্রতিম অতিথিকে বন্দনা করি —

'হে পথিক! তুমি পথের বন্ধু কণ্টকে ব্যথা পাইলে কেহ
আপন দশনে তুলেছ যতনে পরশ বুলাযে করেছ স্নেহ।
তুমি বৈষ্ণব আত্মবন্ধু সেবাই তোমার প্রাণের ব্রত
তারি লাগি তত আঁখি ছলছল বেদনা-আহত যেজন যত।
আমারি ভাগ্যে এসেছ বন্ধু, গৃহের ভাগ্যে পাযের ধূলি
আমার দুখানি করের ভাগ্যে মাথার উপরে লইনু তুলি। ইত্যাদি

কবিতাটী তাঁর জযন্তী-গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। তখন কে জানিত যে তাঁহার "কান্তকবি" গ্রন্থের ভূমিকা লেখার ভার আমার উপরে ন্যস্ত হবে। আমি জানিতাম যে কান্তকবির শতবার্ষিক স্মরণোৎসবের সময় ঠিক হয যে ঐ গ্রন্থের নূতন সংস্করণের ভূমিকা লিখবেন আমাদের অনুজপ্রতিম বন্ধু ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায। কিন্তু তাঁর আকস্মিক তিরোধানে বাধ্য হযে— "আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি" কবিগুরুর এই বাণী স্মরণ করে আমাকেই সেই গুরু-দাযিত্ব গ্রহণ করতে হল।

আমার সেই দায়িত্বের ভার লাঘব করার জন্য আমাদের অগ্রজপ্রতিম কবি, শ্রীনরেন্দ্রদেবের প্রেমাঞ্জলি থেকে কযেক পংক্তি উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি, কারণ সেগুলি যেন নলিনীরঞ্জনের লেখনী-লিখিত চরিত্রচিত্রের মত :—

'অমিতকর্মী তুমি শুধু যাও, নীরবে সাধিযা সবার কাজ,
তোমার নিপুণ হাতের চিহ্ন সকল ক্ষেত্রে পড়েছে আজ।
গীতি, সাহিত্যসমাজ, ধর্ম—সকল কর্মে তোমার ঠাঁই,
তোমার যত্নে গড়িয়া উঠেছে কত পাঠাগার, সংখ্যা নাই।

তোমার বুকের রক্তে বেঁধেছে কত না প্রথম অনুষ্ঠান
তোমারই প্রগাঢ় অনুরাগে কত মৃত-মন্দির পেয়েছে প্রাণ।
তোমারই অসীম স্নেহরসে কত বাণীর কুঞ্জ মুঞ্জরিত
তোমারই যত্নে কবিমনীষীর অতীত কীর্তি সঞ্জীবিত।
তোমার গুণের সমাদর করি সাধিছে যারা এ যোগ্য কাজ,—
তব সম্মানে এ অনুষ্ঠানে সম্মান হেরি তাদেরি আজ।'

পি ১০৩ লেকটাউন
কলিকাতা ৫৫

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী :

জন্ম : ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪ (বঙ্গাব্দ ১২৯০)।

মৃত্যু : ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ইং (১৩৪৭—৫৬ বৎসর বয়সে)।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক : ১৩২৩, ১৩২৯, ১৩৩১-৩৪, ১৩৪৩।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত "হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা" ১ম খণ্ডে হর প্রসাদের জীবনপঞ্জী লিখিয়াছেন।

সম্পাদক : "জাহ্নবী" : ১৩১১-১৩১৬।

সহযোগী সম্পাদক : "যমুনা" ১৩১৭। ফণীন্দ্রনাথ পাল অন্যতব সম্পাদক।

গ্রন্থকার : ১ কান্তকবি রজনীকান্ত—১৩২৮

২. শিক্ষাসংস্কারে রামেন্দ্রসুন্দর।

বিশেষ প্রবন্ধ : বাংলাব বাউল-সম্প্রদায (গৃহস্থ পত্রিকা, কার্তিক ১৩২০)।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয সাহিত্য-পরিষৎ "বাউল-সম্প্রদাযেব জ্ঞাতব্য বিষয" সংগ্রহের জন্য "কৃষ্ণবিনোদিনী স্বর্ণপদক" পুবস্কার ঘোষণা কবেন। ১৩১৭ ও ১৩১৮, এই সালে ঐ বিষযে উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওযা যায নাই। ১৩১৯ সালে মহা-মহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ. সি. আই. ই. শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয-লিখিত প্রবন্ধটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিযা ঘোষণা করেন এবং বলেন—

"Well written The writer has worked much and has collected much valuable information, I have no hesitation to recomend the prize, whatever the amount be, to him."

অতঃপর নলিনীবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেব উনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশনে "কৃষ্ণবিনোদিনী স্বর্ণপদক" প্রাপ্ত হন।

প্রকাশক : বঙ্গীয় নাট্যশালা (সমালোচনা)

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, এই ছদ্মনামে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী এই গ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন।

সম্পাদনা : রোগশয্যার প্রলাপ, ১৩৩০ সাল।

রোগাতুর শর্মা, এই ছদ্মনামে ব্যোমকেশ মুস্তফী ইহা লেখেন। ১৩২৩, "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত।

শরতের ফুল (পূজাবার্ষিকী) ১৩৩৪।

"গৃহস্থ" পত্রিকা কিছুদিন পরিচালনা করেন।

ভূমিকায় উল্লিখিত—গ্রন্থের ও প্রবন্ধের নির্দেশিকা :

১. বাউল-সম্প্রদায়— প্রবন্ধ : "গৃহস্থ" পত্রিকা, কার্তিক ১৩২০।

২. নলিনী-সাহিত্য—নলিনী জয়শ্রী : লেখকের পঞ্চাশত্তম বর্ষের জয়ন্তী-গ্রন্থ।

৩. ভারতবর্ষ—মাঘ ১৩৪৭, পৃঃ ২৫৮।

৪. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-স্মরণে—প্রবন্ধ : যুগান্তর (সাময়িকী) ১৭।৯।১৯৬১ ইং, লেখিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী।

৫. বাণীর জাগ্রত-পূজারী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—লেখক শ্রীমদন চক্রবর্তী। সচিত্র অভিযাত্রী (প্রথম বর্ষ, চৈত্র-সংখ্যা ১৩৬৩)